বিদ্রোহিণী নিবেদিতা

ডঃ দীপক চন্দ্র

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :

সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

মুদ্রক :

স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মাননীয়
শ্রীতপন সিকদার
কেন্দ্রীয় যোগাযোগ রাষ্ট্রমন্ত্রী
সুহৃদবরেষু

লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস

শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম
ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীকৃষ্ণ এলেন দ্বারকায়
বিষণ্ণ শ্রীকৃষ্ণ
যদি রাধা না হ'তো
কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন
লঙ্কেশ রাবণ
জননী কৈকেয়ী
রামের অজ্ঞাতবাস
কাশ্যপেয়
মহাবিশ্বে মধুকৈটভ
তোমারই নাম কর্ণ
পিতামহ ভীষ্ম
রাজা রাম
এবং অশ্বত্থামা
সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী
কৃষ্ণস্তু ভগবান,
উর্বশী জননী
আশ্রমকন্যা শকুন্তলা
মহাভারতের শকুনি
আমি তোমাদেরই সীতা
দ্রৌপদী চিরন্তনী
কৃষ্ণ অর্জুন সংবাদ
দ্বৈপায়নে দুর্যোধন
মন বৃন্দাবন
সম্রাজ্ঞী কুন্তী
উপেক্ষিতা শূর্পনখা
শ্রীকৃষ্ণ সুন্দরম্
বিভীষণ
অচেনা ভরত
নিবেদিত মার্গারেট
নিবেদিত নিবেদিতা
ভারততীর্থে নিবেদিতা

গল্পের বই

গল্পের দুপুর
অমৃতকুম্ভ
যোজনগন্ধা সত্যবতী
পৌরাণিক প্রেমকথা
কাকতালীয়
কুন্তীর তর্জনী

সমালোচনা

বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা
সুধা সাগরতীরে
মনোজ বসু : জীবন ও সাহিত্য

সম্পাদনা

হরিবংশ
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণ
মনোজ বসুর রচনাবলী (৪ খণ্ড)
মনোজ বসুর কবিতা

দৃষ্টিকোণ

মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলের ঘটনাবহুল জীবন নিয়ে চার খণ্ডে যে মহাকাব্যিক উপন্যাস রচনার প্রতিশ্রুতি ছিল তা যথাযথ দায়িত্বের সঙ্গে পালন করলাম। বর্তমান খণ্ডটি এই পর্বের চতুর্থ খণ্ড। এই পর্বের সময়কাল ১৮৯৯-এর ২০ জুন থেকে ১৯০২ এর ২০ জুলাই পর্যন্ত। অর্থাৎ ইংলন্ডে পাড়ি দেওয়ার দিন থেকে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার দিন পর্যন্ত মোট তিন বছরের ঘটনা এই পর্বে স্থান পেয়েছে। বলা বাহুল্য এটা নিবেদিতার কোনো জীবনীগ্রন্থ নয়। বলা যেতে পারে নিবেদিতার জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে গড়ে তোলা একটি গল্পগ্রন্থ। প্রতিপাদ্য গল্পকে ফোটাতে হলে জীবনের যে যে ঘটনা দরকার কেবল তাকেই অনুসরণ করেছি। কারণ লেখক একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে নিবেদিতার জীবনের ছবি আঁকছেন। তাঁর মনের ক্যানভাসে নিবেদিতার যে মূর্তিটি রয়েছে তাকে শিল্পিত করে তোলার জন্য কিছু বাছাই ঘটনা সন্নিবেশিত করেছেন। নইলে, তা একটি বিবৃতিসর্বস্ব জীবনীগ্রন্থ হত। উপন্যাস হত না। উপন্যাসের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে কল্পনার রঙ ধরাতে হয়েছে ইতিহাসের নিবেদিতার গায়ে। তাই এই গ্রন্থের রক্তমাংসের নিবেদিতা কতখানি ইতিহাসের নিবেদিতা আর কতখানি লেখকের তৈরি প্রতিমা তা নিয়ে পাঠক-পাঠিকাদের মনে দ্বন্দ্ব হতে পারে। কিন্তু লেখক সত্যের অপলাপ করেনি কোথাও।

নিবেদিতার জীবন কত বিচিত্র ঘটনায়, অনুভূতিতে, ব্যথা-আনন্দে, ব্যর্থতা-সার্থকতায়, জয়-পরাজয়ে পরিপূর্ণ। কত মানুষের মিছিল তার জীবনে। কত কর্মের আহ্বান, কত নতুন দায়িত্ব এবং অভিনব সংগ্রামে তা বর্ণময়। শত চেষ্টা করেও তার সবটা উপন্যাসের পরিধিতে ধরতে পারিনি। পাছে উপন্যাসে জীবনের রঙ ফিকে হয়ে যায়, তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে স্থবিরতা প্রাপ্ত হয় তাই সাবধানে অনেক প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছি। কারণ, তাতে উপন্যাস লক্ষ্যচ্যুত হত। এই ধরনের উপন্যাস রচনার পূর্বপরিকল্পিত যে ছকই থাকুক না কেন, লিখতে লিখতে সে ছক আর থাকে না। থাকবে কী করে, লেখার সময় কাহিনী নিজের পথে নিজের মত চলে। ঘটনা ও তথ্যের গ্রহণ বর্জন এবং বাছাই সেভাবেই হয়। নজরটা প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর স্থির থাকে। তাকে ঘিরে ওঠে কাহিনী। কাহিনীতে অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে চারপাশের মানুষ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনা। আমার মূল বিষয় নিবেদিতা ও বিবেকানন্দের সুগভীর প্রেম।

প্রথম খণ্ড থেকে তাঁদের সুগভীর প্রেমের প্রসঙ্গটি উপন্যাসের আধারে চিত্রিত করেছি। ব্যক্তিপ্রেমের রূপান্তরের এক-একটি মোহনা এক এক পর্বরূপে কল্পিত হয়েছে। চারখণ্ডে নিবেদিতার মানসিক রূপান্তর ও উত্তরণের সেই দিগন্তকে উন্মোচন করল। ভালোবাসা হল মূল সুর। আগেও বলেছি, আবার বলছি স্বামীজি এবং নিবেদিতা উভয়ে উভয়কে

গভীরভাবে ভালোবেসেছিল। বন্য নদী, পাহাড়, প্রস্তরকে যেমন আকাশ ভালোবাসে তাঁদের ভালোবাসা অনেকটা সেরকম। তবু দীর্ঘকালব্যাপী অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে নিবেদিতা স্বামীজি প্রদর্শিত পথে আত্মোৎসর্গে সমর্থ হয়েছিল। এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে কোথাও কিছু লেখা নেই। উপাদানের অভাব সর্বত্র এত বেশি যে সংযোগসূত্র গড়ে তোলা দূরূহ হয়ে পড়ে। তবু চিঠিপত্রের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যে সব অনুভূতি, ক্ষোভে, দুঃখে, অভিযোগে অথবা গভীর বিস্ময়ে আগে বা পরে ব্যক্তি হয়েছিল কাহিনী নির্মাণে, চরিত্রের অন্তর্জীবন উন্মোচনসূত্রে তাকে একটি সম্পূর্ণ মানুষ করে গড়ার চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য।

নিবেদিতা ও বিবেকানন্দই আমার প্রতিপাদ্য বিষয়। বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের আলো পড়ে নিবেদিতা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। দুই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঘটনার মধ্যে প্রধানত অবস্থান করেছি। এর বাইরে যেতে গেলে এত বেশি ঘটনা ও মানুষ এসে পড়ে যে তাতে উপন্যাসটি লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পরে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সঙ্গে নিবেদিতা সম্পর্ক সূত্র ছিন্ন করার পর আর এক পা-ও এগোয়নি। কারণ এরপর দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল নিবেদিতা তাতে অবগাহন করেছিলেন। ঐ আবর্তের মধ্যে ইতিহাসই প্রধান হয়ে ওঠেছে। তার মধ্যে ব্যক্তি নিবেদিতাকে তেমন নিবিড় করে পাব না। স্বাধীনতার কর্মযজ্ঞে নিবেদিতা একজন দেশব্রতী সৈনিক। তার মধ্যে তখন শুধু দেশ ও দেশের মানুষ বেঁচে আছে। ইতিহাসের সেই গতিপথে নিবেদিতাকে অন্বেষণ করার দায় ঔপন্যাসিকের নয়, ঐতিহাসিকের।

গ্রন্থ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর একটা কথা বার বার স্মরণ করেছি। "ভারতবর্ষকে আমি ভালোবেসেছি বিবেকানন্দ পড়ে। আর বিবেকানন্দকে আমি চিনেছি নিবেদিতার লেখায়"। বিবেকানন্দের দেশপ্রেমের আগুনকে নিবেদিতা বহন করে নিয়ে গেছিলেন ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। আমি তার আঁচটুকু উপন্যাসের মধ্যে রেখেছি। তাতে ভারতবর্ষকে চেনানোর কাজটা এবং নিবেদিতার মাধ্যমে স্বামীজিকে চিনতে পারার কাজটা সহজেই সম্পন্ন হয়। সেই সঙ্গে স্বামীজির বাণী ও ভাব প্রচারের ব্যাপারে নিবেদিতা যে দুটি ভূমিকা পালন করেছেন তা একটি মহাদেবের অন্যটি ভগীরথের। স্বামীজির আদর্শ ও বাণীর প্রবল বেগকে তিনি মহাদেবের মত যেমন ধারণ করেছেন তেমনি তার দুর্মদ স্রোতধারাকে ভগীরথের মত বহন করে বেড়িয়েছেন গোটা ভারতভূমির কোটি কোটি সন্তানের পুনরুজ্জীবনের জন্য। নিবেদিতার সমগ্র চেতনায় ভারতবর্ষ ও বিবেকানন্দ যে মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ তাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য। এর পরে যে নিবেদিতাকে পাই তিনি বিপ্লবের ও বিদ্রোহের।

। শিবম্, সত্যম্, সুন্দরম্।

দীপক চন্দ্র

কলকাতা-৭০০ ০৩০

।। এক ।।

২০ জুন ১৮৯৯। খিদিরপুর ডক থেকে গোলকুণ্ডা জাহাজ সন্ধ্যার আগেই ছাড়ল। বঙ্গোপসাগর দিয়ে মাদ্রাজ ও কলম্বো উপকূল স্পর্শ করে ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর পাড়ি দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের নিঃসীম বিস্তার অতিক্রম করে মিশর, ব্যাবিলন, ইস্রেলাইটিস, আলেকজান্দ্রিয়ার মত সভ্যতার প্রাচীন নগর এবং আরো কত দেশের কত বাঁক, রোদ ঝলমল, ছায়া-নিবিড় এলাকা পেরিয়ে গোলকুণ্ডা হয়ে ৩১ জুলাই ১৮৯৯-তে লন্ডনের টিলাবেরি ডকে পৌঁছল। জাহাজে স্বামীজির ছ'সপ্তাহ সান্নিধ্য ও সাহচর্য নিবেদিতার প্রতিটি মুহূর্তকে এক দুরন্ত ভালোলাগায় ভরিয়ে রাখল। কত দেশের কত ইতিহাস—উত্থান-পতনের কাহিনী, সভ্যতা-সংস্কৃতির গল্প, দেশাচার, কিংবদন্তির মধ্যে শ্রদ্ধামিশ্রিত উত্তেজনার এমন একটা কুসুমগন্ধী সুখ ও তৃপ্তি ছড়াতে লাগল যা পরম প্রার্থনার মত মনটাকে দীন করে দিল। সুন্দর অনুভূতির মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতে থাকতে দিনগুলো যে কোথা দিয়ে কিভাবে কেটে যেত জাহাজে ভেবে পেত না নিবেদিতা। টিলাবেরি ডকে পৌঁছনোর পর মনে হল, স্বপ্ন থেকে বাস্তবে প্রত্যাবর্তন করেছে। তথাপি মন আলো করা এক প্রসন্নতায় শরীরটা ঝরঝরে লাগছিল।

জাহাজঘাটে অবতরণের সময় এক আশ্চর্যক্ষণ সৃষ্টি হল। বিস্ফারিত দুই চোখে বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে দেখছিলেন। ওর পরিতৃপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, পৃথিবীতে খুব কম মানুষই মনের গভীরে যেতে চায়। ডুবুরী হয়ে জলের নিচে নেমে মুক্ত খোঁজে দু'চারজন। আমার গুরু রামকৃষ্ণ ছিলেন সেই ধরনের এক আশ্চর্য প্রেমময় মানুষ। প্রেম দিয়ে গোটা পৃথিবীটাকে তিনি জয় করে নিলেন। তোমার ভেতরে তেমনি একজন প্রেমময়ী জননী ও ভগিনী লুকোনো আছে।

লজ্জা পেয়ে নিবেদিতা একটু হাসল। কিন্তু তার সমস্ত চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বলল, আপনি একটু বেশি বেশি করে বলেন। আমার মত একজন সাধারণ মেয়ের মধ্যে আপনি কী যে দেখেছেন আপনিই জানেন।

জাহাজের সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি নামতে নামতে বিবেকানন্দ বললেন, আমার সমস্ত আমিত্বকে আমি কি দেখতে পাই? পাই না। আমার সমস্ত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তা এত

গভীর করে মিশে আছে যে তাকে আলাদা করে চেনা যায় না। চেনানোর সেই মানুষটি হলেন পরমারাধ্য রামকৃষ্ণ। তাঁকে না পেলে নরেন্দ্রনাথ কোনোদিন স্বামী বিবেকানন্দ হত না। আমার জীবনে এরকম একটা অঘটন যখন ঠাকুরের সংস্পর্শে সত্যি ঘটে গেল তখন থেকে বুঝেছি সব কিছুই আগে থেকে নির্ধারিত থাকে। ঠিক সময়ে ঠিক ঘটনাটি ঘটবেই। এক অদৃশ্য হাত সব কিছু পরিচালনা করছে আমাদের, নইলে আমার মত ঈশ্বর অবিশ্বাসী, পরম নাস্তিক এমন করে পাল্টে গেল কার প্রভাবে? ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে মনে হলো, কারো কোনো জানাই অভ্রান্ত নয়। ঐ পরম অমৃতময় মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ ভগবানকে আমার চেয়ে অনেক গভীরভাবে জেনেছেন। মানুষ চেনার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। বাইরে তিনি ন্যালাখ্যাপা, কিন্তু ভেতরে পরমযোগী। এরকম মানুষের জীবন্ত সান্নিধ্য পাওয়া এবং তাঁর কৃপা করুণা লাভ করা পরম সৌভাগ্যের। নিজেকে আমি সেজন্য ভাগ্যবান ভাবি।

নিবেদিতা চটপট বলল, আমিও তাঁর স্নেহধন্য শিষ্যকে গুরুরূপে পেয়ে ধন্য হয়ে গেছি। আমার চোখে তিনিও কম আশ্চর্যকর নন। আমার সমস্ত সত্তাকে ঘিরে তিনি সর্বক্ষণ আছেন। তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচর্যলাভের একটি মুহূর্ত ও সুযোগ আমি নষ্ট হতে দিইনি। জীবনে পাছে অন্য কারো সঙ্গে কথা বললে তাঁকে পাওয়ার ব্যাঘাত ঘটে তাই সবাইকে এড়িয়ে চলতাম জাহাজে। দাস্ আই রিসিভড ওয়ান লঙ কনটিনিউয়াস ইম্প্রেশন অফ হিস্ মাইন্ড অ্যান্ড পারসনালিটি। আমাকে আপনার চেনার ভুল হয়নি বলেই মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল শুধুই নিবেদিতা আজ। নিবেদিতা, শুধুই একজন মহিলার নাম। মানব পরিচয় ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় তার নেই। সে কোনো জাতের নয়, ধর্মের নয়, বর্ণের নয়। তার কোনো পদবী নেই। এমন কি দীক্ষাদানের পরে তাকে প্রব্রাজিকা বলে গণ্য করা হল না। কালী, দুর্গা, উমার মতই একটা নাম হয়ে থাকল নিবেদিতা। কথাগুলো বলার সময় অন্তরের আক্ষেপের সঙ্গে এক গভীর দুঃখবোধ মিশে গেল।

স্বামীজি তার ব্যথাটাকে চাপা দেওয়ার জন্য অন্য কথা বললেন, ভাবতে খুব আশ্চর্য লাগছে দেড় বছর আগে এই ডক থেকে তুমি ভারত রওনা হয়েছিলে। তখন তোমার নাম ছিল মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। দেড় বছর পরে সেই মানুষ অন্য জাহাজে ফিরল অন্য নামে, নতুন মানুষ হয়ে। এর মত আশ্চর্য কিছু নেই। মহামানবের সাগরতীরে মানবপূজার একজন ঋত্বিক তুমি! মাত্র ক'টা দিন; কিন্তু কী ব্যাপক রূপান্তর বলতো?

চলতে চলতে এক দারুণ মুগ্ধ চমকে চমকে উঠল নিবেদিতা। আত্মপ্রশংসা শুনতে কার না ভালো লাগে। নিবেদিতারও খুশিতে ভরে যায় মন। কী আছে ওঁর গলার স্বরে কে জানে? কেন যে গভীর গোপন কথাগুলো এমন বিপজ্জনকভাবে ভালো লেগে যায়

নিবেদিতা জানে না। ভালো লেগে গেলে মনটা এলোমেলো হয়ে যায়। কোনো সংযম থাকে না। নিজেকে শুনিয়েই যেন বলল, প্রিয় মানুষের কাছ ছাড়া কোনো রূপান্তর সুখের হয় না। প্রিয় মানুষের ইচ্ছের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা তো এক বিশেষ আনন্দ। একজন মানুষ নিজেকে বদলায় গভীর প্রেমে। ত্যাগের জোরেই প্রিয় মানুষটির কাছে সে অনেক বড় হয়ে ওঠে।

মার্গারেট জননী মিসেস মেরি ইসাবেল নোবল জেটিতে দাঁড়িয়ে মার্গারেটের দিকে আকুল নয়নে তাকিয়েছিলেন। চোখের পলক পড়ছিল না। পাদ্রীর মত গেরুয়া রঙের আলখাল্লা পোশাকে নিবেদিতাকে চিনতে তাঁর সত্যিই কষ্ট হল। মার্গারেটের ভগিনী মে মিসেস নোবলকে চিনিয়ে না দিলে ভিড়ের মধ্যে আপন কন্যাকে হয়তো খুঁজেই পেতেন না। মার্গারেটের বিপুল রূপান্তর কিছুক্ষণের জন্য তাঁকে বোবা করে দিল। সেইমুহূর্তে তাঁর মধ্যে কোনো আবেগ-উচ্ছ্বাস ছিল না। একটা প্রচণ্ড আনন্দ ও বিস্ময়ের যুগপৎ মিশ্র প্রতিক্রিয়া তাঁকে হতভম্ব করল। হঠাৎই মনে হল তিনি মার্গারেটকে নয়, স্বামী স্যামুয়েলকে দেখছেন। মেয়ের সঙ্গে বাপের রেখায় রেখায় মিল। অনেককাল পরে হারিয়ে যাওয়া স্বামীর মুখখানি তাঁর গভীর করে মনে পড়ল। সুদূর অতীত থেকে স্যামুয়েলের কণ্ঠস্বর যেন বন্দরের ফুরফুরে বাতাসে সওয়ার হয়ে তাঁর কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, ইসাবেল, এমেয়ে ইংলন্ডে থাকার মেয়ে নয়। ভারতবর্ষ একদিন তাকে ডেকে নেবে। সেদিন ওকে বাধা দিও না। মায়ায় মমতায় বেঁধে রেখ না। বিধাতার ভুলে ও মেয়ে ভারতে না জন্মে ইংলন্ডে জন্মেছে।

জাহাজ থেকে নেমে নিবেদিতা মায়ের পাশে দাঁড়াল। আশ্চর্য, ইসাবেলের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কিছুক্ষণের জন্য বোধহয় মিসেস নোবল নিজের ভিতর ছিল না। তন্ময়তা ভাঙল নিবেদিতার আলিঙ্গনে ও তার উষ্ণ চুম্বনে। অমনি সারা গায়ের ভেতর একটা প্রবল সিরসিরানি ভাব হলো। দেড় বছর পরে মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে স্তব্ধ হয়ে রইল ইসাবেল। নিজের অজান্তে চোখের কোণ দিয়ে জলের ধারা নামল। তাতেই মন আলো করা প্রসন্নতায় ঠোঁট দুটো কথা বলার জন্য ব্যগ্র হল। থরথর করে কেঁপে উঠল। কথা বলার সময় গলার কাছে কী একটা দলা পাকিয়ে উঠল।

মিসেস নোবল মুখ ফুটে কিছু বলার আগে স্বামীজিকে দেখিয়ে নিবেদিতা বলল, ম্যামি, এই আমার রাজা। আমার গুরু স্বামী বিবেকানন্দ।

মিসেস নোবল সহাস্যে তাঁর দিকে তাকিয়ে করমর্দন করল। বললেন, আমার গৃহে আপনি অপরিচিত নন। কেবল আমাদের আলাপ হয়নি। আপনি আমার পরমাত্মীয়ের মত। আজ, আপনার সঙ্গে মিলিত হতে পেরে কী ভালোই না লাগছে।

মিসেস নোবলের কথাগুলো স্বামীজির হৃদয়কে দ্রব করে দিল। বললেন, দীর্ঘ অদর্শনের পরে মা মেয়ের মিলনের মধ্যে যে কতসব অসামান্য আনন্দ লুকোনো আছে

তা তো দু'চোখ ভরে দেখলাম। আমার দেশের কবিদের লেখনীতে এই মিলন অসামান্য কাব্যরূপ লাভ করেছে।

নিবেদিতা মায়ের কাছ সরে গিয়ে ছোটভাই রিচমন্ডের গা ঘেষে দাঁড়াল। গালে তার চুম্বন এঁকে দিয়ে একগাল হেসে আদর করল। বলল, রাজা এই আমার নটি ব্রাদার রিচমন্ড। ভীষণ ভালো। কী করে যে এদের কথা ভুলে ভারতে ছিলাম ভাবতে অবাক লাগছে।

একমাত্র ভগিনী মে'কে আদর করে গাল টিপে ধরল। দুর্বোধ্য আবেগে তার নিজের ঠোঁট জোড়াই সুচলো হল। ওর চিবুকটাকে একটু নাড়া দিয়ে বলল, এ হল মে। আমার ভগ্নী, বন্ধু, সহকর্মী। ভারত যাত্রার সময় ওর ওপরেই স্কুলের সব দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছি। বড় স্বার্থপরের মত ওর কচি কাঁধের ওপর সংসারের সব দায়িত্ব সঁপে দিয়ে নিজের সুখের দিকে, ভালোলাগার দিকে দৌড়ে গেছি। মে বড় ভালো মেয়ে। একদিনও সেজন্য অভিযুক্ত করেনি আমাকে।

এবেনজার কুককে দেখিয়ে বলল, রাজা আমার শিল্পী বন্ধু এবং বিশ্বস্ত সহকর্মী ও পরিবারের বন্ধু। ওঁর ঋণ কোনোদিন পরিশোধ হবে না।

মাত্র কয়েকমুহূর্তের মধ্যে পরিচয় পর্ব সমাপ্ত করে নিবেদিতা বলল, স্বামীজি ইংলন্ডে নতুন আসেননি। এদেশের বহু মানুষের তিনি পরিচিত। তাঁর বাণী এখনও অনেকের কানে মন্ত্রধ্বনির মত অনুরণিত হয়। উনি হলেন শাশ্বত ভারতের প্রাণপুরুষ। আর ওঁর সঙ্গে মুণ্ডিতমস্তক ঐ সন্ন্যাসী হলেন পরমশ্রদ্ধেয় তুরীয়ানন্দ। ওঁকে ঘিরে যাঁরা আছেন তাঁরা হলেন লন্ডনে বসবাসকারী গুণগ্রাহী এবং অনুরাগী ভক্তবৃন্দ।

মিসেস নোবলের ভীষণ ভালো লাগল। বুকের মধ্যে খুশির হিল্লোল। কথা বলার সময় মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর। বললেন, এখানে দেরি করে লাভ কী, বরং ঘরে ফেরা যাক। আমাদের উইম্বলডনের ২১ হাই স্ট্রিটে আপনার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। ওখানেই আমরা যাব। বন্দরের বাইরে আপনার জন্য একটা ফিটন গাড়ি অপেক্ষা করছে।

স্বামীজি আগ্রহের সঙ্গে মিসেস নোবলের কথাগুলো শুনলেন। মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। এক গভীর তীব্র ভালোলাগার মধ্যে চকিতে স্নেহময়ী জননীর দুঃখজর্জর মুখখানি মনে পড়ল। মিসেস নোবলের মুখের সঙ্গে সে মুখ এক সরলরেখায় লীন হয়ে গেল। বললেন, খুব আনন্দ হচ্ছে আমার। ভীষণ সুখী মনে হচ্ছে নিজেকে। ভাবছি, কী পাইনি এ জীবন থেকে। ধনরত্নে ভরে গেছে আমার পাওয়ার ঘর। কোথাও আমার শূন্যতা নেই, শূন্যতা শুধু আমার চারপাশের জগতে। সেখান থেকে আমি চিরদিনের জন্য ছুটি নিয়েছি। এখন মা আমার সব। আমার ইহলোক, পরলোক। আমার আত্মা-পরমাত্মা। মা ছাড়া আমি আর কিছু চাই না।

মিসেস নোবল ওঁর কথার মর্মার্থ কী বুঝলেন তিনিই জানেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে আর দশজন সুখী গৃহস্থের ভাবনা-চিন্তায়, কাজকর্মে, স্বভাবে এবং জীবনধর্মের কোনো মিল থাকে না। তাঁরা এক অন্য পৃথিবীর মানুষ। তাঁদের সংস্পর্শে এসে আমরাই ধন্য হয়ে যাই।

হুডখোলা ফিটনগাড়িতে একদিকে মিসেস নোবল এবং নিবেদিতা, অন্যদিকে বিবেকানন্দ ও তুরীয়ানন্দ মুখোমুখি বসল। মাথার ওপর উজ্জ্বল নীল আকাশ এবং চারপাশে স্পর্ধিত ভঙ্গিতে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাম গাছের বনবীথির দিকে নির্নিমেষ চোখে চেয়ে রইলেন বিবেকানন্দ। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর স্বামীজি সারাপথ একাই কথা বলে গেলেন।

পরিপাটি করে স্বামীজির জন্য ঘরটি সাজানোই ছিল। মে হাত ধরে তাঁকে ঘরে এনে সোফায় বসাল। বলল, আপনি এখানেই থাকবেন। এটাই আপনার লন্ডনের ঠিকানা। শরীর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এক পাও নড়তে দিচ্ছি না। আপনার দেখাশোনার সব ভার আমার। সেবা যত্ন করে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তবেই আপনাকে ছুটি দেব।

একে একে নোবল পরিবারের সবাই ঘরটিতে এসে বসল। স্বামীজি সহাস্যে সকলের সঙ্গে প্রীতিবিনিময় করে বললেন, মেরি-মা তোমাদের বাড়িখানা ভালোবাসায় মোড়া। ভালোবাসার জাল ছিঁড়ে বেরোনো খুব শক্ত। আমার সাধ্য কি তোমার নজরদারি ফাঁকি দিয়ে চলে যাব। তবু একদিন সময় হবে শেষ। সেদিন আর ধরে রাখতে পারবে না কেউ।

স্বামীজির কথা শুনে এক অনির্বচনীয় আনন্দ হল সকলের। উপভোগ করার মতই কথা! মুখে চোখে তাঁর রঙ লাগল। মে পুলকিত গলায় বলল, আপনি কথার যাদুকর। কথা দিয়েই আকাশে মেঘ জড়ো করে অলকানন্দা নামাতে পারেন। দিদি বলে, আমার গুরু কথা দিয়েই অন্তরে সুধাসিন্ধু বইয়ে দিতে পারে।

স্বামীজির অধরে স্মিত হাসি। বললেন, ও সব কিছু নয়। আসলে যে অনুভূতির জন্য যে ভাষা দরকার তা যদি ঠিক ঠিক ব্যবহার হয় তাহলে তা থেকে ভাষার দ্যুতি বেরোয়। একে বলে মনের ঘরে ভাবের চুরি। এ চুরিতে কারো ক্ষতি হয় না। মনের দীপটা উজ্জ্বলতর হয় শুধু। মনের ভিতর ছিটকে ওঠে তার রঙ। বিদ্যুৎ চমকের মত হঠাৎই হৃদয়ে বাঁধা পড়ে।

মে বলল, আপনার অনেক কথা দিদির চিঠিতে জেনেছি। স্বপ্নের মত মনে হত। এখন চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হল। স্বপ্নটা যে সত্যি এবং বাস্তব, এমন করে আগে কোনোদিন জানা হয়নি।

নিবেদিতা ঘরে ঢুকতেই মে বলল : তোমার রাজাকে আমরা কোনো কষ্ট দেব না। তুমি স্বচ্ছন্দে যেতে পার। ওঁর দেখভাল করার সব দায়িত্ব এখন আমার। দয়া করে এর মধ্যে নাক গলিয়ো না।

নিবেদিতা মুচকি হেসে বলল : আমার বয়ে গেছে। তবে ছ'সপ্তাহ জাহাজে যা ধকল গেছে তাতে ওঁর বিশ্রামের দরকার। চক্ষুলজ্জায় হয়তো বলতে পারছেন না—আমাদেরই উচিত নয় ওঁকে বেশি বকানো।

তোর কিছু না বললেও হবে। বাথরুমে জল আছে, স্নান করে তুই ফ্রেশ হয়ে নে। স্বামীজির ব্যাপারে তোর কোনো কথা না বলাই ভালো। আমি আর মা মিলে যা করার করব।

নিবেদিতা ফিক্ করে হেসে ফেলল। বলল, ঠিক আছে বাবা। তবু আমার তো কিছু কর্তব্য থাকে। সেটা করতে না পারলে মনটা তৃপ্তি পায় না। নিজেকে বড় দোষী মনে হয়। তাই মানা করলেও অভ্যাসটা বদলাবে না। কাজের ফাঁকে দৌড়ে আসবই। না এসে পারব না রে। ওঁর মত আমিও এবাড়ির একজন অতিথি। অতিথি ছাড়া কী? ক'দিনই বা থাকব? সময় ফুরোলে নিজের গন্তব্যের দিকে ধেয়ে যাব।

মে ধমক দিয়ে বলল, হঠাৎ হঠাৎ করে তোর এই ভাবপ্রবণ হওয়া এখনও গেল না।

আবেগ সামলে নিয়ে নিবেদিতা বলল : কাল থেকে ছোটাছুটি শুরু হবে। স্বামীজির সঙ্গে তাঁর বন্ধু, কর্মী ও অনুরাগীদের একটা যোগসূত্র গড়ে তোলার কাজে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকব। ওঁর আগমনের উদ্দেশ্যকে সফল করার ছক্‌টা নিয়ে যেমন আমাকে এখানে ওখানে যেতে হবে তেমনি আমারও আত্মীয়, বান্ধবদের সঙ্গেও একটু দেখা-সাক্ষাৎ করতে হবে। বলতে গেলে, এসব নিয়েই দিন কেটে যাবে। অসুস্থ মানুষটার দেখাশোনার ভার নিজের হাতে নিয়ে তুই যে আমার কী উপকার করলি তা কোনোকালে ভুলতে পারব না।

ওদের কথাবার্তার মধ্যে মিসেস নোবল এসে বললেন, স্বামীজি, স্নান করে আসুন। আপনার ব্রেকফাস্ট রেডি।

স্বামীজি বাধ্য ছেলের মত উঠে পড়লেন। স্নানঘরে যেতে যেতে বললেন, আমি সত্যিই ভীষণ ক্লান্ত। নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। আপনাদের আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ আতিথেয়তা ও সমাদর পেয়ে সব কষ্ট লাঘব হয়ে গেছে। ভীষণ সুস্থ বোধ করছি। আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই। এত আদর, ভালোবাসা ছেড়ে যখন অন্যত্র যেতে হবে তখন সত্যিই কষ্ট হবে।

মুখ ব্যাজার করে মে রাগ দেখিয়ে বলল, আসা থেকে শুধু যাওয়ার কথা বলছেন,

কেন? আমরা কী বেঁধে রেখেছি। চিরকাল আমরাই বা আপনাকে ধরে রাখতে যাব কেন? মানুষের স্নেহ মমতা ভালোবাসা কোনোদিন পেরেছে কাউকে ধরে রাখতে? প্রিয়জনেরা প্রাণপণে চায় আঁকড়ে ধরতে। কিন্তু চাইলেই কী পারে তারা? শুধু বলে রাখা যেতে দিতে ইচ্ছা নাহি। থাক ও কথা। এখন তো যাচ্ছেন না। আমাদের মধ্যে প্রীতি বিনিময় হোক, যোগসূত্র গড়ে উঠুক —তারপর যা ইচ্ছে করবেন।

কথাগুলোর ভেতর এমন একটা রুক্ষতা ছিল যে মেরি নোবল বেশ একটু বিপন্নবোধ করলেন। পাছে, স্বামীজি মনে কষ্ট পান সেজন্য গোটা ব্যাপারটা লঘু করার জন্য মে'কে একটু ধমকালেন। বললেন, মে'র কথায় কিছু মনে করবেন না। আসলে, সবাইকে ও আঁকড়ে ধরতে চায়। কোনো কারণে তা বিপন্ন হলে ওর মনটা খারাপ হয়ে যায়। তখন ওর ভাষাটা একটু রুক্ষ বলে ভ্রম হয়। এ জন্যই লোকে ওকে ভুল বোঝে।

স্বামীজি মৃদু হেসে বললেন, আপনি মিছে মিছে সংকোচ বোধ করছেন। ও তো খারাপ কিছু বলেনি। এতদিন ধরে আমিও এতদিন ধরে এরকম কিছু চাইছিলাম।

মিসেস নোবলের তবু সংকোচ গেল না। বিব্রতভাব প্রকাশ পেল তাঁর কণ্ঠস্বরে। বললেন, আসলে, নতুন হলেও আপনি এপরিবারের একজন হয়ে গেছেন। আপনার ওপর একটা দাবি জন্মেছে। আসলে, ওর বিয়ে পর্যন্ত আপনি থাকুন, এটাই ও চায়। বলতে পারেন এ হলো ওর একধরনের উচ্ছ্বাস।

স্বামীজি মে'র দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, অত কিন্তু কিন্তু করার কিছু নেই। আমার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে। বলেই স্নানঘরের দরজাটা সশব্দে বন্ধ করলেন স্নানের জন্য।

স্বামীজির অনুগামী এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে একটা যোগসূত্র গড়ে তোলার কাজে রোজ নিবেদিতাকে এত বেশি সময় দিতে হয় যে দিনান্তে স্বামীজির সঙ্গে সুখ দুঃখের গল্প করারও সময় হয় না। কথাবার্তা এবং দেখা-সাক্ষাৎ যা হয় তা প্রয়োজনের এবং কাজকর্ম সম্পর্কিত। ব্যক্তি নিবেদিতার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। অথচ, নিবেদিতা ভীষণভাবে চেয়েছিল লন্ডনে থাকাকালে তার দিনগুলো যেন স্বামীজির নিবিড় সাহচর্যে এবং সান্নিধ্যে সর্বক্ষণ ভবে থাকে। নিজের হাতে স্বামীজির পরিচর্যার সাধ তো ভারতে পূর্ণ হয়নি। লন্ডনে এক বাড়ির ছাদের নিচে বাস করার সময অন্তত সেই সুযোগটুকু পাবে। কিন্তু বিধাতা সে সাধ পূর্ণ হওয়ার কোনো সুযোগই দিল না। বরং স্বামীজির সঙ্গে তার একটা অন্তরাল গড়ে উঠল। তবে কি মা কালীর ইচ্ছে নয় রাজার পরিচর্যা করে? প্রশ্নটা তীরের মত বুকে গেঁথে রইল তার।

অথচ, লন্ডনে আসার পথে জাহাজে বসে কত স্বপ্নই দেখেছিল। ভারতের মাটিতে যাঁকে ভালো করে কোনোদিন কাছে পাওয়া হয়নি, সেবা-শুশ্রূষার সুযোগ পায়নি, লন্ডনে নিজের বাড়িতে তাঁকে পরিচর্যা করবে, একান্তে কাছে বসে তাঁর ইচ্ছে-অনিচ্ছে, তাঁর ভালোলাগা-মন্দলাগা, তাঁর আদর্শ ও সংকল্পগুলো গভীর করে জেনে নেবে। স্বামীজির মনের অতলে ডুবে গিয়ে তাঁর সত্তার গাঢ় অস্তিত্বকে আবিষ্কার করবে। কিন্তু নেপথ্যে কে যেন তার সময়গুলো হরণ করে নিল। রাতে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে স্বামীজি কেমন আছেন এই খোঁজটুকুই কেবল নিতে পারত। স্বামীজি চিরদিন তার কাছে অধরা রইল। খুব কাছে থেকেও রয়ে গেলেন তার নাগালের বাইরে। মনের ইচ্ছে বাস্তবের মাটিতে অঙ্কুরিত হওয়ার সময় পেল না। কিন্তু বাড়ির অন্যদের সঙ্গে তাঁর একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠল।

নিবেদিতার একমাত্র ভাই রিচমন্ডও ওর বয়সে বুঝে গেছে স্বামীজির সান্নিধ্য বড়ই লোভনীয়। তাই, তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেড়িয়ে আস্তে আস্তে হাঁটে। পার্কের বেঞ্চে বসে ভারতবর্ষের ঠাকুর দেবতা এবং মানুষের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শোনে। আর সে নিজের মনে চিন্তা করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। আশ্চর্য লাগে, নিজেকে প্রশ্ন করে, স্বামীজি স্বর্গের দেবতা, না মর্তের মানুষ! যে ঈশ্বরের গল্প স্বামীজি বলেন তার সঙ্গে রিচমন্ডের জানা ঈশ্বরের প্রকৃতি ও স্বভাবের কোনো মিল নেই। চারপাশের মানুষ তো নিষ্করুণ প্রভুর কথা বলে। স্বামীজির ভগবান কিন্তু তা নয়। তিনি প্রেমময়। সন্তানবৎসল পিতা-মাতার মত। ছেলেমানুষ রিচমন্ড মুগ্ধ হয়ে যায়। অকপট বিশ্বাসে ভক্তিশ্রদ্ধায় তার ভিতরটা জ্বলজ্বল করে। মনের বদ্ধ কপাটগুলো অজ্ঞাত রহস্যলোক থেকে কে যেন একটা একটা করে খুলে দেয়। অভিভূত গলায় রিচমন্ড বলল, স্বামীজি, দিদির পাল্লায় পড়ে বাড়িশুদ্ধ লোককে নিরামিষ খেতে হয়। দিদির শাসনে বাড়িতে আমিষ বন্ধ। গো-মাংসের নাম পর্যন্ত চলবে না। অথচ, আপনি বলেছেন, প্রাচীন কালে ভারতীয়রা গো-বৎসের মাংস নিজেরাও খেত এবং অতিথিদেরও দিত। তা হলে দিদি আপত্তি করে কেন? জানেন স্বামীজি, কতদিন বিফের কাবাব খাই না।

রিচমন্ডের কথা শুনে স্বামীজি হো হো করে হাসেন। অবাক হয়ে বলেন, মার্গট বুঝি বাড়িতে হিন্দুয়ানা চালু করেছে। পরোয়া নেই। রেস্তোরাঁয় বসিয়ে তোমাকে বিফের শিক কাবাব খাওয়াব। এখন খুশি তো।

মুক্ত মনের এই উদার সাধুটি মুহূর্তে বালকের হৃদয় জয় করে নিল। বলল, আপনার মধ্যে আমাদের ধর্মের প্রাণপুরুষ যীশুখৃস্টকে পেলাম। তাঁর মতই আপনি উদার মহান।

বৈকালিক ভ্রমণ থেকে ফিরে নিবেদিতার বাড়ির লোকজন, আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে রোজই চায়ের মজলিসে জমিয়ে গল্প করে বিবেকানন্দ। তিনি একাই বক্তা। সবাই তাঁর কাছে গল্প শুনতে চায়। ভারতবর্ষের ধর্ম, সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও ইতিহাসের অনেক

বিচিত্র বিচিত্র কাহিনী স্বামীজি শোনাতেন তাঁদের। তাঁর মৌলিক বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যায় সে সব কাহিনী জীবন্ত হয়ে. উঠত। সেই সঙ্গে দূর বা অদূর ভবিষ্যতে মানব সভ্যতা কোন লক্ষ্য ও অভিমুখে অগ্রসর হবে তারও অভ্রান্ত ইংগিত শুনে তারা স্তম্ভিত হত।

মুগ্ধ শ্রোতাদের কাছে অসংকোচে দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন, আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষ নিজের শক্তিতে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করবে। অনুকরণ করে কিংবা অন্যের ওপর নির্ভর করে কোনো জাত বা দেশ অনন্তকাল ধরে টিকে থাকে না। আত্মোপলব্ধির প্রেরণায়, ভাবের উৎকর্ষতায় ভারত তার আত্মগরিমা ফিরে পাবে। আমাদের বেদ বেদান্তের গভীরে নিহিত রয়েছে তার মর্মকথা, স্ট্রেনথ্ অ্যান্ড ফিয়ারলেসনেস্। এই শব্দযুগলের মধ্যে রয়েছে সব শক্তি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমার বক্তব্য অনুধাবন করতে হবে। কিন্তু যে শক্তির কথা বলছিলাম তা প্রত্যেকের মধ্যে সুপ্ত আছে। তাকে শুধু নিজের ভেতর জাগাতে হয়। মার্গটিকে দিয়ে সে পরীক্ষা করেছি। যদিও দুই গোলার্ধের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য অনেক তথাপি প্রথম দর্শনেই টের পেয়েছিলাম মার্গারেটের মধ্যে এক প্রচণ্ড শক্তি ও তেজ লুকোনো আছে। ইংলন্ডে থাকলে ঐ শক্তির স্ফূরণ হত কি না সন্দেহ। হলেও অন্যের নজর কেড়ে নিতে পারত না। ঘটনাচক্রে মার্গটের এক আত্মাপলব্ধি হল, যদি জগতকে কিছু শেখাতে হয় তা-হলে আত্মবিশ্বাসের জোরেই তা করা যায়। যার আত্মবিশ্বাস আছে বাইরের কোনো শক্তি হারাতে পারে না তাকে। মিসেস নোবল নিজের উদ্যোগে ভারতে তা করে দেখাল। আমাদের হিন্দুশাস্ত্র বলে, নিরাশ হয়ো না। তোমার স্বরূপ তোমার মধ্যে অব্যক্তভাবে আছে। একদিন পরিপূর্ণ তেজে নিজেকে সে উদঘাটিত করবে। ভারতের বেদান্ত মানুষকে এই সত্য শিখিয়েছে। বেদান্তে শয়তান নেই। তবে শয়তান সম্পর্কে সজাগ থাকার শিক্ষা দিয়েছে। একবার যদি নিজের প্রতি অবিশ্বাস জন্মে তাহলে ভূতের মত তা ঘাড়ে চেপে বসে। সাহসই সব। প্রাচীন ঋষিরা তাই বলেছেন, জান, নিজেকে জান। অর্থাৎ আত্মোপলব্ধির পথে নিজের আত্মবিকাশ সম্পন্ন কর।

শ্রোতারা অপলক চোখে স্বামীজিকে দেখতে লাগল। চোখে তাঁর চরম জ্ঞানের জ্যোতি, জিহ্বায় উপনিষদ, মুখমণ্ডলে বুদ্ধের শান্তি, যীশুখৃষ্টের প্রেম। শ্রোতাদের মন আলোড়িত হয়। তাদের বিশ্বাস জন্মাল এ ব্যক্তি ঈশ্বর প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট আধিকারিক পুরুষ। এমন মানুষের সান্নিধ্যলাভ পরম সৌভাগ্যের। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্রোতারা ফ্যাল ফ্যাল করে যখন তাকিয়ে থাকত তখন তাদের উদ্দেশ করে বললেন, আপনারা আমার কথা মন দিয়ে শুনছেন তো? একটু হাঁ-হু করলে বুঝতে পারি আপনারা শুনছেন। কী; আমার কথা ভালো লাগছে তো?

একজন শ্রোতা বলল, আপনার কথা বলার অনবদ্য ভঙ্গি, গলার স্বর, শব্দের সঙ্গে ভাবের প্রক্ষেপণ যেন নদীর স্রোতের মত চলকে চলকে চলে। কথা বললেই তার সুর

কেটে যাবে।

অন্যজন বলল, কথা তো নয় যেন ফুলঝুরি। চারদিকে রঙিন তারা ছিটকে ছিটকে পড়ছে। তার নীরব নিঃশব্দ সৌন্দর্য দেখার সময় আর কোনো হুঁশ থাকে না।

স্বামীজি হাসলেন। কথা বলার সময় পুনরায় চোখ দুটি বিস্ফারিত হল। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস এবং পুরাণের প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, কেন্দ্রস্থ পুরুষ শ্রীবুদ্ধ। কৈশোরে শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা ছিল আমার প্রেরণার উৎস। ঐ বয়সে সুর করে নিয়মিত গীতা পাঠ করতাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার শিরা-উপশিরায় এক অদ্ভুত স্পন্দন জাগত। কী দুর্বার শক্তি কী দুর্জয় বীর্যের প্রকাশ প্রতিটি শ্লোকের মধ্যে নিহিত।

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং তক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ।।

ওঠ জাগ, তরঙ্গক্ষুব্ধ কর্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়। বিগতস্বর হযে সংগ্রাম কর। আমি তোমাকে রক্ষা করব। সাফল্যের সৈকতভূমিতে উত্তীর্ণ করে দেব। ভয় নেই। ভারতবর্ষকে যদি বুঝতে চাও তা-হলে একথা মনে রাখতে হবে উই ইন্ডিয়ানস্ আর ম্যান-ওঅ্যার্‌শিপারস্ আফটার অল। অ্যাওর গড্ ইজ্ ম্যান। তাই তো ভারতীয়রা ঘরের ছেলের চক্ষে দেখে বিশ্বভূপের ছায়া। অসীম যিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা মানুষের সীমানায়। শ্রীকৃষ্ণ, মহামায়া কালী, উমা আমাদের ঘরের ছেলে মেযের সঙ্গে পরিবারের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। এখানেই তোমাদের সঙ্গে আমাদের ধর্মের বড় পার্থক্য। তোমাদের ঈশ্বর থাকে আকাশে আর আমাদের ঈশ্বর থাকে মাটিতে। আমাদের ঈশ্বর চাষ করছেন, পাথর ভাঙছেন, ধুলো পায়ে হাঁটছেন মেঠো পথ ধরে। তাই অতি সহজে আমি তোমাদের যীশুকে বুকে টেনে নিতে পারি, নিয়েছিও কিন্তু তোমরা আমার কৃষ্ণকে বুকে টেনে নিতে পার না। তোমাদের হৃদয়ে সেই প্রসার কোথায়?

শুনতে শুনতে ভাবাবিষ্ট হয়ে যায় শ্রোতারা। প্রত্যেকটি কথা তাদের বুকের ভেতর এমন এক অনুরণন তোলে যে শ্রোতারা প্রশ্ন করতে কিংবা কৌতূহল প্রকাশ করতে ভুলে যায়। ভিতরটা তাদের পরম প্রাপ্তির আহ্লাদে ভরে থাকত। মুগ্ধতার ভেতরেও যে অনেক আনন্দের চেয়ে গভীরতর এক অসীম মুক্তির আনন্দ লুকোনো আছে শ্রোতারা এই পরম সত্যকে স্বামীজির সান্নিধ্যে হৃদয়ঙ্গম করল।

অভিভূত গলায় মে বলল, স্বামীজি কত অসাধারণকে কত সহজ করে বিশ্লেষণ করেন। কোথাও কোনো অস্পষ্টতা নেই। ইচ্ছে করে অনন্তকাল ধরে আপনার কথা শুনি। এমন সুন্দর করে বোঝানোর শক্তি আপনি কোথা থেকে পেলেন?

আমাদের ধর্মের মাহাত্ম্য, আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের দেশের সাধকদের সাধনাই হয়তো আমাকে এই শক্তি দান করেছে। ভক্তি বিশ্বাসের ধারাটি ভারতবর্ষের ধর্মের

প্রাণোচ্ছল, নিরবচ্ছিন্ন স্রোতধারার মত বয়ে চলেছে এক খাত থেকে অন্য খাতে। সে প্রবাহিনী সকল পাত্রে পূর্ণ করা চলে, তা সে মাটিরই হোক আর স্বর্ণপাত্রেরই হোক। যে কোনো ধর্মের মানুষ চাইলে ঐ অমূল্য সম্পদ ঘরে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। অরুণ রাগে যেমন করে ফুলে পাপড়ি মেলে তেমনি করে হৃৎপদ্ম ফুটে ওঠে ভারতীয় ধর্মবোধে। এই ধর্মে কোনো সংকীর্ণতা নেই। এর সবটাই খোলা আকাশের মত উন্মুক্ত। তোমাদের ধর্ম রবিবারে, গির্জেয় সকালে দু'ঘণ্টা। আর আমার হিন্দুধর্ম প্রত্যহ, সর্বত্র, সর্বক্ষণ। নিখিল বিশ্বের অণুতে, রেণুতে, প্রতিটি নিশ্বাসে। প্রতি মুহূর্তের ভ্রমরগুঞ্জনে। তাই তো সারা পৃথিবী তো বটেই দ্যুলোক-ভূলোক-স্বর্গলোকে কী ঘটছে কখন তাও বুঝতে ও দেখতে আমি পাই। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ কী জয়।

স্বামীজির অসুস্থতার সংবাদ শুনে আমেরিকা থেকে মিসেস ফ্রাঙ্ক এবং কৃস্টিন নামে দুই শিষ্যা সংবাদ না দিয়ে উইম্বলডনে ২১ হাই স্ট্রিটে সশরীরে উপস্থিত হল। মে ওদের জন্য কাছাকাছি আলাদা বাড়ি ভাড়া করল। সেখান থেকে ওরা স্বামীজির দেখাশোনা করতে লাগল। স্বামীজিকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করতে চাইল। ফলে, স্বামীজির অগোচরে নোবল পরিবারে এক সংকট সৃষ্টি হল। আমেরিকান শিষ্যাদের সঙ্গে নিবেদিতা এবং তার পরিবারের মন কষাকষি ও রেষারেষির এক পাল্লা চলল। মুখে কেউ কিছু না বললেও স্বামীজি টের পান। সব বোঝেন। নিজেকে ওর সঙ্গে জড়ালেন না। বরং পরিহার করে সমস্যাকে নিজের পথে চলতে দিলেন।

অতিথিদের মনোভাব এবং হাবভাব দেখে নিবেদিতা খুব শান্তভাবেই বলল, মিস কৃস্টিন, স্বামীজি আমার গুরু, আমার পিতা। তাঁকে তোমার থেকে কম ভালোবাসি-না। তিনি আমার ইহলোক ও পরলোক। আমার সুখ, আমাব জীবন এবং মরণ। তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য এবং তাঁর কাজে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে বাঁদীর মত খাটব। এই কথাটা মনে রাখলে আমাদের মধ্যে আর কোনো সমস্যা হবে না।

কৃস্টিন আচমকা এ ধরনের কথার কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলল, তোমরা কী ভাবছ জানি না। এরকম কোনো সন্দেহ আমাদের মনে বাসা বাঁধেনি। আমাদের আচার-আচরণে যদি অনুরূপ কোনো বিভ্রান্তি হয়ে থাকে তাহলে ভাই ক্ষমা করে দাও। স্বামীজির ব্যাপারে তোমার মত আমরাও উদ্বিগ্ন। কিন্তু সেজন্য তোমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টাকে ছোট করে দেখছি এটা মোটেই ঠিক কথা নয়। ওরকম কথা স্বপ্নেও ভাবি না। স্বামীজির কাছে তোমার কত কথা শুনেছি।

নিবেদিতার বুকটা আনন্দে, আবেগে থরথর করে কেঁপে গেল। বলল, আমার কথা তোমাদের কাছে বলেন নাকি ?

কৃস্টিন বলল, বলেন মানে, তোমার কথাই হয় বেশি সময়।

আমার সম্পর্কে এত কী বলার থাকতে পারে? কোলকাতায় তো আমি ছিলাম ওঁর ভয় ও দুর্ভাবনার হেতু। নিজেও কষ্ট ভোগ করেছেন, আমাকেও যন্ত্রণা দিয়েছেন। ওঁর প্রত্যাখ্যান, উপেক্ষা, অপমান সয়ে আমার মত কোনো ভারতীয় মেয়েও থাকতে পারত না। তোমরাও না। উনি যত আমায় দুঃখ দিয়েছেন ততই আমার জেদ চেপে গিয়েছিল ওঁকে জয় করার। ঠাকুরকে বলতাম, স্বামীজির কঠিন পরীক্ষায় আমাকে হারিয়ে দিও না।

তোমার কোনো কথাই আমাদের অজানা নয়। ওঁর বিশ্বাস তোমার মত আর দু'জন শিষ্যা পেলে ভারতে একটা বড় ধরনের বিপ্লব ঘটে যেত।

নিবেদিতার ভীষণ অবাক লাগল। খুব জানতে ইচ্ছে করল তার সম্পর্কে আরো কী কী কথা হয়েছে? কিন্তু লজ্জায় বলতে পারল না। নিজের প্রশংসা অন্যের মুখ থেকে টেনে বের করা খুব লজ্জার। এরকম কিছু করা পছন্দ করে না সে। বিস্ময়ভরা উজ্জ্বল দুটি চোখ মেলে অনিমেষ তাকিয়েছিল কৃস্টিনের দিকে। নিবেদিতা ভাবছিল স্বামীজি মানুষ নয়, ঈশ্বরের অংশ। নিজেও তা জেনেছেন। তারপব থেকে ভীষণভাবে বদলে গেছেন। সব কিছুতে কেমন একটা অনাসক্তির ভাব। সুন্দর অনুযোগহীন অবস্থার মধ্যে মানুষ যখন বাস করে তখন বোধ হয় যা কিছু তার গর্বের, আত্মশ্লাঘার তার চেতনা লুপ্ত হয়ে যায়। থাকে শুধু ঈশ্বরের মুখোমুখি বসে তাঁর ধ্যানে বিভোর হয়ে থাকা। স্বামীজিও তেমনি তন্ময় হয়ে রয়েছেন নিজের ভেতর।

নিবেদিতাকে চুপ করে থাকতে দেখে কৃস্টিন বলল, কথাটা তুলে তুমি ভালো করলে। এখানে থাকলে স্বামীজি কতটা সুস্থ হয়ে উঠবেন সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। সুস্থ হওয়ার জন্য সেবা-শুশ্রূষা ছাড়াও চাই ভালো চিকিৎসা। সেটা বোধহয় এখানে সম্ভব নয়। ওঁর মঙ্গলের কথা ভেবেই আমেরিকায় চিকিৎসা করতে চাই। কিন্তু এই কথাটা স্বামীজিকে কিংবা তোমাদের কাউকে সংকোচে বলতে পারছি না। অথচ, ওঁকে নিতে এসেছি আমবা। কথাটা যখন বলা হয়ে গেল তখন তো আর আপত্তির কিছু নেই। এই ব্যবস্থায় তোমরাও খুশি হবে। মিসেস লেগেটের রিজনিম্যানের সুন্দর স্বাস্থ্যকর চোখজুড়োনো প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাসাদোপম গৃহে স্বামীজির থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে। ওখানে উনি ভালো থাকবেন।

নিবেদিতা নিস্পৃহ গলায় বলল, এতো ভালো কথা। মুখে যাই বলুক, মনের অভ্যন্তরে তার রাগের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। চট করে বাগটাকে লুকিয়ে গলার স্বর নামিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, তাড়াহুড়োর তো কিছু নেই। পরে কথা হবে। এখন আমার

বেরোনোর সময় হয়েছে। যাই। কথাগুলো বলেই সে চলে গেল।

কৃস্টিন জানলা দিয়ে দেখল নিবেদিতা গেট খুলে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় রাস্তার ধারে রডোডেনড্রনগুচ্ছের পাতা ধরে নাড়া দিল। গাছে ফুল ছিল না। কিন্তু পাতা ছিল অনেক। নিবেদিতার স্পর্শে গাছগুলি নাড়া খেল। মনে হল মাথা নেড়ে বিদায় দিল তাকে।

মিসেস নোবল পাশের ঘর থেকে ওদের সব কথাবার্তা শুনতে পেল। নিবেদিতা চলে যেতেই কক্ষে ঢুকলেন। দুরন্ত অভিমানে, অসহায় রাগে এবং প্রতিকারহীন একটা যন্ত্রণা বুকে চেপে বললেন, মিস্ কৃস্টিন তোমাদের কথা আমি শুনেছি। ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ তোমরা। ওঁকে ভালো করার জন্য সব চেয়ে বড় প্রয়োজন হল বিশ্রাম ও সেবাযত্ন। আমরা তা যথেষ্ট করেছি। চেষ্টার কার্পণ্য করিনি। হয়তো আরো প্রয়োজন, এর চেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য, বড় ঘর, মুক্ত পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যকর স্থান। সেটা বোধহয় আমাদের দেওয়া সম্ভব নয়। মায়া মোহে বেঁধে ওঁর জীবনের অনেকখানি সময় নষ্ট করেছি। তোমাদের কথা শুনে বুঝতে পারছি, ওঁর মঙ্গলের জন্যই এখানে আর একদণ্ড থাকা উচিত নয়।

ওদের কথাবার্তার মধ্যে বিবেকানন্দ এসে দাঁড়ালেন। পিছনে দাঁড়িয়ে সব শুনলেন। স্নেহ ভালোবাসা মমতা মাখানো কথার এক আশ্চর্য নিজস্ব আচ্ছন্নতা আছে। অনুরূপ এক আচ্ছন্নতায় কিছুক্ষণ আবিষ্ট হয়ে থাকার পর অভিভূত গলায় বললেন, তোমাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তোমরা আমাকে ঠাকুর করে রেখেছ। সত্যি কি আমি তাই? বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। এখানে তা যথেষ্টভাবে মিলছে। মে, কন্যার মত আমার ওপর নজরদারি করেছে, শাসন করেছে, জোর করেছে। হাজার রকম স্বাস্থ্যবিধি এবং নিষেধের ডোরে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। ওর এই পাহারাদারির কথা কোনোদিন ভুলবার নয়। মেরি নোবলের কাছে মায়ের স্নেহ পেয়েছি। তাঁর মধ্যে আমার অভাগিনী মায়ের হাতের কোমল স্পর্শ লাভ করেছি। ওঁর আদর-যত্ন যেন মরুভূমির মরূদ্যান। আমার ভেতরটা মায়ের মমতা পাওয়ার জন্য যে কত তৃষ্ণার্ত হয়েছিল মিসেস নোবলের সান্নিধ্যে না এলে জানা হতো না। মনে মনে এই হস্তস্পর্শটুকু চাওয়ার জন্য কাঙাল হয়েছিলাম।

স্বামীজির মনরাঙানো ভাষায় মে আপ্লুত হলো না। বরং সুতীব্র অভিমানে তার অন্তঃকরণ নির্দয় হলো। বলল, আপনার চলে যাওয়াই ভালো। যত তাড়াতাড়ি পারেন এখান থেকে চলে যান। আপনাকে ধরে রাখতে আমার বয়ে গেছে। যেখানে থাকুন ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন। কথাগুলো বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হলো। চোখভর্তি জল নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

এক গভীর বিষাদ থেকে মিসেস নোবল যেন সহসা জেগে উঠল। মে'কে ভর্ৎসনা

করে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল, অমন করে স্বামীজিকে চলে যাওয়ার কথা কেউ বলে? যথেষ্ট বয়স হয়েছে তোমার। দু'দিন বাদে অন্যের ঘরে বৌ হবে। কথাবার্তায় যথেষ্ট সংযত হওয়া দরকার। কখন কোন্ কথা যে কার কোথায় আমূল বিঁধে যায়, কেউ জানে না। তা-ছাড়া অমন রাগ করে চলে যাওয়ার মতও কিছু হয়নি।

যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল মে। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার মধ্যে কত কী প্রলয় ঘটে গেল তুমি কি বাইরে থেকে দেখতে পাও? তোমার ঐ সন্ন্যাসী জাদু জানে। ওঁর আকর্ষণ যে কী ভয়ংকর যত দিন যাচ্ছে টের পাচ্ছি। আমার ভিতরটা অশান্ত হয়ে উঠেছে। একদিকে আমার ঘর বাঁধার স্বপ্ন, বিয়ের দুর্বার ইচ্ছে এবং অন্যদিকে স্বামীজির প্রতি হৃদয় দুর্বলতার এক টানাপোড়েনে ছিন্নভিন্ন হচ্ছি। ঐ মানুষটাকে ভীষণভাবে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। ওঁর কাজে এ জীবনটা উৎসর্গ করতে পারলে সবচেয়ে খুশি হতাম আমি। কিন্তু আমার জন্য একজন প্রতীক্ষা করছে। তাকে আমি কথা দিয়েছি। তাকে হতাশ কিংবা নিরাশ করার অধিকার আমার নেই। আমি তা পারবও না। দিদির মনের জোর আমার নেই। প্রতিমুহূর্ত বুঝতে পারছি, স্বামীজির শক্তি যদি ঠেকিয়ে রাখতে না পারি তা হলে এ জীবনে আর সংসারী হতে পারব না। আমি যে ভীষণভাবে স্বামী, পুত্র-কন্যা, সংসার চাই মা। ওঁর ডাক শুনলে তো আমার হবে না। আমার অকপট স্বীকারোক্তি শোনার পর কোনো মানুষ নির্দয় হতে পারে না। স্বামীজিও না।

স্বামীজির অধরে অনির্বচনীয় হাসি স্ফুরিত হলো। বলল, আমার সোনা মেয়ে। মনে মনে নিজের সঙ্গে লড়াই করে যে সিদ্ধান্ত তুমি নিয়েছ তার চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা কিছু হয় না। নিজের মনের নির্দেশ মানার জন্য তোমার ওপর রাগ করতে পারি? জীবনের চেয়ে মহীয়ান আর কিছু নেই। আমি আশীর্বাদ করি, তুমি সুখী হও। ঈশ্বরে তোমার মতি অটুট থাকুক। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তোমার সহায় হোন।

স্বামীজির আমেরিকায় যাওয়ার দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেল। নিবেদিতার খুব ইচ্ছে ছিল স্বামীজির সঙ্গী হওয়ার। কিন্তু বাস্তব অবস্থা তার ইচ্ছে পূরণের অন্তরায় হলো। বিশেষ করে মের বিয়েটা না দিয়ে লন্ডন ত্যাগ করার উপায় ছিল না। বাধ্য হয়ে স্বামীজিকে সদানন্দ এবং কৃস্টিনের সঙ্গে আমেরিকায় পাঠানো হল।

যাবার দিন লন্ডনস্থ সন্ন্যাসী এবং শিষ্যরা যখন স্বামীজিকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন তখন নিবেদিতা সেখানে উপস্থিত ছিল। সবার শেষে স্বামীজির হাতে একগুচ্ছ গোলাপ দিল। স্বামীজির শান্ত স্নিগ্ধ দুটি চোখ তার ওপর স্থির হয়ে রইল যাতে চোখ উপচে সে দৃষ্টি বাইরে পড়ে একটুও নষ্ট না হয়। স্বামীজির বিশালায়তন দুই

চোখের দিকে ভক্ত পূজারীর মত চেয়ে রইল নিবেদিতা। মণিতে মণিতে এক গভীর ভাবাবেগের মিলন হলো। বন, নদী, প্রান্তর, পাহাড়ের সঙ্গে আকাশের চাঁদের যেমং মিলন হয় অনেকটা সেরকম মিলন। তার মধ্যে কোনো দাহ নেই। আছে সৌন্দর্যের আকর্ষণ। তথাপি নিবেদিতার সারা শরীরের মধ্যে একটা সিরসিরানি ভাব হলো। বিবেকানন্দের অধরে স্মিত হাসির আভা স্ফুরিত হলো। সে হাসিতে জীবনরহস্য বোঝার কৌতুক।

সেইমুহূর্তে বিচ্ছেদের মর্মন্তুদ হাসির সঙ্গে উদগত কান্নাকে গিলে গিলে বলল, আমার দেহটাই এখানে, মন পড়ে রইল আপনার জন্য। এখানকার কাজ মিটে গেলে যত তাড়াতাড়ি পারি আমেরিকায় রওনা হব।

জাহাজে ওঠার আগে কৃস্টিনকে আলিঙ্গন করল। বিদায় নেবার সময় ওর মনের অবস্থা অনুধাবন করে কৃস্টিন বলল, মুখে কিছু না বললেও তোমার মনের মানচিত্রটা আমি জানি। ক'দিন বাদে তো আসছ। সে ক'টা দিন আমাদের একটু ভরসা করে দেখ—মন্দ কিছু হবে না।

নিবেদিতা বলল, দুটো বছর কার্যত চোখছাড়া হননি। চোখের আড়াল হলে মনে হয় আমি একা। আমার কেউ নেই। কেন জানি না, ওঁকে ছাড়া নিজেকে অনাথ মনে হয়। কৃস্টিন এজন্য অনেকে উপহাস করে আমাকে। কিন্তু আমার জায়গায় থাকলে তারাও তাই করত। আমার কোনো লুকোচুরি নেই। উনি যে আমার ঠাকুর, আমি ওকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। আমাকে তাঁর ভীষণ দরকার। ওথচ, তাঁর কাছে থাকতে পারছি না। এই কষ্টটা সইতে পারছি না। এই ক'বছরে তাঁর পায়ে পূজা নিবেদনের ভাবটি পলে পলে কেমন করে দল মেলেছে তা ভাবতে গেলে শিউরে উঠি। তাই কোনো ঝুঁকি নিতে ভয় করে। কথাটা বলা ছেলেমানুষি। কিন্তু ভগবান যদি স্বামীজির শরীরটা এভাবে রোগ যন্ত্রণায় বিষিয়ে তোলেন, তবে অমন ভগবানের শরণাপন্ন হতে চাই না। তাঁকে একটুও আমার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, তাঁর আর যে ভাবই থাক না কেন, তিনি আমার ঠাকুর এরই জন্য আমি বেঁচে থাকব এবং আমরণ তাঁর জন্য কাজ করব। তাই তো চোখের আড়াল করতে মনটা এমন হাহাকার করে ওঠে।

যাত্রীরা জাহাজে ওঠা শুরু করল। তুরীয়ানন্দ স্বামীজিকে নিয়ে কিউতে দাঁড়াল। কৃস্টিন ওর চোখের দিকে একটুখানি চেয়ে থেকে বলল, ভেবে, মনকে আর্ত কর না। বিদায়। পৌঁছে চিঠি দেব।

জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যেতে মনে হলো তার আর কোনো গন্তব্য নেই। বড় শূন্য লাগল। গভীর এক বিষণ্ণতায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যতক্ষণ জাহাজ বন্দর থেকে চোখের আড়াল না হল ততক্ষণ জাহাজঘাটের জেটিতে চিত্রবৎ দাঁড়িয়ে রইল নিবেদিতা।

।। দুই ।।

স্বামীজির বিদায় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নোবল পরিবারে একটা বিষাদের ছায়া নেমে এল। সকলের ভেতরে একটা মনমরা ভাব ছিল। কোনো কাজই নিবেদিতার ভালো লাগে না। দিনগুলো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল, ভেঙে যাচ্ছিল টুকরো টুকরো হয়ে। গুরুর সান্নিধ্যে শান্তিতে বাস করার দুরন্ত কামনা নিবেদিতার ভাবনাকে সব সময় অধিকার করে থাকত। মের বিয়েটাই তার জীবনে এক মস্ত বন্ধন। এই বন্ধনটা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো পথ নেই তার। বড় ভগিনী হয়ে বিয়ের সব দায়-দায়িত্ব না নিলে নয়। মে'ও নিবেদিতাকে তার বিয়েতে ভীষণভাবে চায়। বিয়ের সব বন্দোবস্ত নিবেদিতাকে একাই করতে হল। এই কঠিন কঠোর কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে তার ভাবজগতে এক বিরাট টানাপোড়েন চলল। নিবেদিতার মন বুঝেই মে বলল, তোকে জোর করে আটকে রেখেছি। স্বার্থপরের মত নিজের সুখ-সুবিধে দেখছি। কৃতজ্ঞতার জন্য তোকে বড্ড বেশি দাম দিতে হল তাই না?

নিবেদিতা নিস্পৃহভাবে বলল, এভাবে কথা বলছ কেন?

খাঁচায় বন্দী পাখির মত ডানা ঝাপ্টাচ্ছিস। না বললেও বুঝতে পারি তুই শান্তিতে নেই। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেছে।

তোকে বলেছে। কতদিন পরে ভাইবোনে একজায়গায় হলাম। এত খুশির পরেও শান্তিতে নেই, কেমন করে ভাবলি?

তোর কথার মধ্যে প্রাণের তাপ নেই। কথাগুলো বড়ই ফরমাল্ আর আর্টিফিশিয়াল।

প্রত্যেকের ভাবনা নিজের নিজের স্বরে চলে। এমন কথা মনে হওয়ার মত সত্যি কোনো কারণ আছে কি না জানি না।

স্বামীজির ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণ থেকে দূরে সরে থাকা যে কত কঠিন আমি জানি। সত্যি কথা বলতে কি ওঁর সেবা করতে গিয়ে ফেঁসে গেছি। মনটা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। নিজেকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বেশ. বুঝতে পারছিলাম, স্বামীজির আকর্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে নিজের সঙ্গে লড়াই করছি। ওঁকে যদি এড়িয়ে

চলতে না পারি তাহলে তোর মতই ওঁর শিষ্যা হয়ে সারাজীবন কাটাতে হবে। ওর সংস্পর্শে থাকলে এ জীবনে আর সংসারী হতে পারব না। উইলসনকে কথা দিয়েছি। স্বামীজির ডাক শুনলে আমার চলবে না। উইলসনের কাছে মিথ্যেবাদী হতে পারব না। তোর মত আমার মনের জোর নেই। সত্যি বলতে কি, স্বামীজি আমেরিকায় গিয়ে আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছেন। পাছে মনের মন বিরূপ হয় বিয়েতে তাই তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেললাম।

নিবেদিতা থমথমে মুখ করে কিছুক্ষণ সামনের দেওয়ালের দিকে চেয়ে রইল। তারপর মে'র দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি বিবেচক মেয়ে বলেই সময়ে সাবধান হতে পেরেছ। তোমার সামনে অনেক দায়-দায়িত্ব, কর্তব্যের জীবন পড়ে আছে।

মে মাথা নেড়ে ধরা গলায় বলল, তোর জন্য ভাবনা হয় খুব। সারাজীবন এভাবেই কাটিয়ে দিবি। অবলম্বনহীন হয়ে থাকা বড় যন্ত্রণার।

নিবেদিতা একটু হাসল মাত্র। এসব কথা জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। মনে মনে বলল, শুধু এই একটা কঠিন কাজের দায় ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব আমার নেই। এর পরে একেবারে মুক্ত আমি। শুধু বিশ্বমায়ের কাজের কথাই ভাবব।

নিবেদিতাকে চুপ করে থাকতে দেখে মে বলল, এই দিদি কথা বলছিস না কেন? তোকে চুপ করে থাকতে দেখলে আমার কষ্ট হয়। তখন ভাবি, স্বামীজির সঙ্গে তোর সাক্ষাৎ না হলেই ভালো হতো। তাহলে এমন করে আমাদের কাছ থেকে তোকে চিরদিনের জন্য কেউ কেড়ে নিতে পারত না।

ও কথা মুখে উচ্চারণ করতে নেই বোন। অনেক পুণ্যে ওঁর মত মানুষের দেখা পেয়েছি। না হলে, এই জীবনটা বড় ব্যর্থ আর দীন মনে হত।

দিদি?

মে, স্বামীজিকে দেখা থেকেই মনে হত জীবন্ত যীশুখৃস্টের পরিচয় পেলাম যেন তার মধ্যে। আমার মনের বন্ধ কপাট খুলে দিয়েছেন উনি। ওঁকে না পেলে বোধ হয় অনেক কিছু জানা হতো না। আমার কোনো অভাব নেই। দুঃখ নেই। তাই তো এত বেশি উৎকণ্ঠা ওঁকে নিয়ে। আমার ধারণা ভুল হতে পারে। তবু সব সময় মনে হয় ওঁর চোখে চোখে না থাকলে আমি খুব একা আর অসহায় বোধ করি।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল মে'র। আকস্মিক দুর্বলতা বশে দিদির কাঁধের ওপর আলতো করে হাত রাখল। সমবেদনার হাত। বলল, বিয়ের আর ক'টা দিন মাত্র বাকি। বিয়ের দিনে কিন্তু এরকম সাধারণ পোশাকে থাকলে চলবে না। তোকে সাজানোর জন্য নোরাকে বলেছি। ওদিন মিস ম্যাকলাউডের গিফ্‌টেড সিল্কের সাদা গাউনটা পরবি। হুডের ওপর একটা লাল গোলাপ গুঁজে দিলে ফ্যানটাসটিক দেখতে লাগবে।

স্মিত হাসল নিবেদিতা। বলল, এতে যদি তোর সুখ হয় তা হলে তাই করব।

মে ওর গাল দুটো টিপে ধরে বলল, মাই সুইট্ দিদি।

তারপর মুখস্থের মত গড়গড় করে বলে গেল মিস ম্যাকলাউডও তোকে লিখেছে— বিয়ের দিন সুন্দর করে সাজবে। তোমার লাবণ্য আর জৌলুস দেখেই না লোকে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে আসবে। স্বামীজির কথা শোনানোর সেই হবে প্রকৃষ্ট সময়। তুমিও তাঁর কথা বলে অসামান্য সুখ পাবে।

লাজুক হেসে নিবেদিতা বলল, জো চিরকালই আমাকে নিয়ে মজা করে। তবে, ঐ পোশাকটা পরলে ওকে খুব মনে পড়বে। জো'র মত বন্ধু হয় না। বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখতে ঐ পোশাকটা আমাকে পরতে হবে। নইলে, আমিও শান্তি পাব না। হয়তো তোর বিয়েতে ঐ পোশাকটা আমার প্রথম ও শেষ পরা হবে এ জীবনে। তারপর, আর কোনোদিন ছোঁব না। জো বললেও না। সেবাব্রতে আমি দীক্ষিতা। স্বামীজির কথা শোনানোর জন্য পোশাকের দরকার হয় না। বরং এই পোশাকে তাঁর মত সর্বত্যাগী বন্ধনমুক্ত মহাপুরুষের নামোচ্চারণ করলে সেটা হয় দোষের। জীবন থাকতে আমি কি তা পারি?

মে সহসা গম্ভীর হয়ে যায়। বেশ একটু সংকুচিত হয়ে বলল, দিদি কিছু ভেবে বলিনি রে—।

মের বিয়ের পর শেষ নিমন্ত্রিতেরা একে একে চলে গেল। গোটা বাড়িটা এখন নিঝুম। বাইরে ঝিম ঝিম করে পড়ন্ত দুপুর। অসময়ে নিবেদিতাকে স্যুটকেস্ গোছগাছ করতে দেখে মিসেস নোবল একটু অবাক হল। মার্গটের খুব কাছে দাঁড়িয়ে মুখ বুজে তার গোছগাছ দেখতে লাগল। একটু আগে মেকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর থমধরা ব্যথাটা বুকের পাঁজরে পাঁজরে বিঁধে আছে। চোখের জল শুকিয়ে গেছে। মনটা আর্ত হয়ে আছে। না কোনো ব্যথা, বেদনা কিংবা জ্বালা নয়। একটা প্রবল ভার যেন তার হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে ঝুলে আছে। একটা থমথমে বিষণ্ণতা নিয়ে মিসেস নোবল কিছু বলার জন্য ভূমিকা করছিল সেটা বুঝতে পেরে মার্গট চুপ করে রইল। তার শ্বাসের অস্বাভাবিক শব্দে ঘরখানা ভরে উঠল।

মিসেস নোবল ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ভাবল। কিন্তু কী এক প্রবল সম্মোহন তাকে আটকে রাখল। এই দৃশ্যটি তার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল না কিন্তু না দেখেও যেন উপায় ছিল না। তার ভ্রূ কিছু কুঞ্চিত, মুখে যথাযথ উদ্বেগ। ঘরটা ভীষণ শব্দহীন। মার্গট ক্লান্ত হয়ে যেন মুখে তুলে তাকাল মা'র দিকে। বলল, কিছু বলবে?

কোথাও যাচ্ছিস?

রাতের ট্রেনে স্কটল্যান্ডে যাব। সেখান থেকে জাহাজে নিউইয়র্কে যাব।

এত তাড়া কিসের? সে তো দেরি করেও যাওয়া যায়।

যেতে যখন হবে, দেরি করে কী লাভ? আজই রওনা হয়ে যাওয়া ভালো।

আমাকে তো কিছু বলিসনি। একটু আগে মে গেল স্বামীর ঘরে। বুকখানা আমার খালি হয়ে গেছে। চোখের জল শুকোনোর আগে তুইও ছেড়ে যাবি? এমনিতে মনটা খারাপ হয়ে আছে। মায়েদের কাছে মেয়ের বিয়ের দিনটা যে কী ভয়ানক দিন সে কেবল মায়েরাই জানে। আনন্দ, দুঃখ, বিষাদ, উদ্বেগের মাঝামাঝি এক অন্যরকম অনুভূতি হয়। এই কষ্টটা সামলাতে না সামলাতে তুইও যদি চলে যাস, তা-হলে আমার সান্ত্বনা কী থাকল? আমার বুকটা একবারে ভেঙে যাচ্ছে। বড় হতভাগ্য আমি। দু'হাত দিয়ে যাকেই আঁকড়ে ধরতে চাই—সেইই ছিটকে বেরিয়ে যায়।

মা, তোমার কষ্টটা যে বুঝি না, তা নয়। কিন্তু আমারও কিছু অসুবিধে আছে। আর যেতেও হবে আমাকে। কারণ গুরু সান্নিধ্যের আনন্দ মহোত্তর। এই মুহূর্তে সেই পরমানন্দ অনুভবের কথা ছাড়া অন্য কথা ভাবতে পারি না। আমার সমস্ত মন জুড়ে সেই পরমযোগী বসে আছেন। তিনি আমায় ডাকছেন। আমি যে তাঁর কাজ করব বলে কথা দিয়েছি।

আমি তো নিষেধ করছি না। দু'দিন পরে গেলেও তো চলে। বহুদিন পর তোকে কাছে পেলাম। নতুন করে বাঁচার নেশা লেগেছে আমার। মে যখন শ্বশুরবাড়ি থাকবে তখন তো-তোকে পাব—আমার সেই ছোট্ট বিশ্বাসের বুকে বিশ্বাসঘাতকের মত ছুরি মেরে চলে যাবি? কষ্ট হবে না? সব কিছুর জন্য একটা সময়ের দরকার। আমার মনটা তৈরি হওয়ার আগেই এমন নিষ্ঠুরভাবে আমাকে ছেড়ে যাওয়ার কথাটা বললি কী করে?

নিবেদিতা জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকে মার দিকে। হাঁ-না'এর মাঝামাঝি তাকে মাথা নাড়তে দেখে মিসেস নোবল বলল, তুই তো মেয়ে। অনুভূতিপ্রবণ একজন মেয়ে হয়ে তো একথাটা তোরই বেশি করে বোঝা উচিত। মেয়ে হয়ে যদি মেয়েদের কথা বুঝতে না পারিস তা হলে কেমন মেয়ে তুই?

কথাগুলো বলার সময় মিসেস নোবলের স্বরভঙ্গ ঘটল। এমন বিশাল ও বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর নিবেদিতা আগে কখনও শোনেনি। পাঁজরের নিচে মৃদু একটা কম্পন টের পেল। বলল, কে বলে আমি বুঝি না।

বুঝলে, মে'র যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ছেড়ে যেতিস না। মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে গেছে সে। এখনও তার গায়ের গন্ধ, ফুলের গন্ধ, ঘর ভরে আছে। তবু আমার

একাকিত্ব, আমার সঙ্গীহীনতার কথা একবারও মনে হলো না তোর। মায়ের মনটাকে তৈরি করার জন্য যে সহানুভূতি দেখানোর দরকার ছিল, সন্তানের কাছে তা উপেক্ষিত হওয়ার যন্ত্রণা, অপমান যে কী নিদারুণ তুই জানবি কী করে? ছোট থেকে তোর ও আমার মধ্যে সম্পর্কটা ভালো করে গড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। আমার ওপর তোর একটুও মায়া পড়েনি। তাই এত নির্দয় হওয়া তোর পক্ষে সম্ভব হলো।

মার্গটের হাতখানা খপ্ করে ধরে বলল, আমি কেন আজ এত একা মার্গট? কেন আমার এত একা আর অসহায় লাগছে? আমার সন্তানেরা সত্যি কি কেউ নেই আমার পাশে? বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল মিসেস নোবল। কান্না জড়ানো গলায় বলল, এমন করে আমাকে দুঃখ দিয়ে তোর কি খুব সুখ হয়? আমি কি তোর কেউ নই? তোর জন্য কি কখনও কিছু করিনি?

বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল নিবেদিতার। চুপ করে কয়েকটা মুহূর্ত মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। দুটো বছর মাকে ছেড়ে থাকার সময় যে সব কথা উষ্ণ, তরল, প্রমত্ত হয়েছিল লাভাস্রোতে, নির্গত হওয়ার সময় হঠাৎই তা যেন মুহূর্তে শীতল প্রস্তরীভূত হয়ে গেল। কষ্টে ঢোঁক গিলে বলল, মাগো আমি তোমার অবাধ্য মেয়ে। সব জেনেও তুমি আমাকে একটুও বোঝ না। কোনোদিন তোমার সব চাওয়াকে পূর্ণ করতে পারিনি। আজও হয়তো সম্ভব হবে না। আমার সন্ন্যাসিনী জীবনের মধ্যে মায়া-মোহের দুর্বল সম্পর্ককে টেনে এনে আমাকে দুর্বল করে দিও না। তোমার মত ত্যাগ করার ক্ষমতা এবং শক্তি যেন আমি পাই। এই আশীর্বাদ করে। আমার শিক্ষা, চাওয়া পাওয়া ভাবনার সঙ্গে তোমার মিল হচ্ছে না বলে একে সম্পর্কহীনতা মনে করার কিছু নেই। আর যদি হৃদয়হীনতা ভাব তা হলে আমার প্রতি অবিচার করা হবে। মায়েরা সন্তানের খুশিটাই দেখে শুধু। সন্তান খুশিতে ভরে উঠলেই মায়েদের সুখ। আমরা সকলেই সুখের পেছনে ছুটছি। কিন্তু কেউ কেউ যে দুঃখের মধ্যে আনন্দ পায়—এটাকে খুব অদ্ভুত মনে হয়, না? কারো ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখে জগতের কিছু যায় আসে না। স্বামীজি বলেন, যে মানুষ জগতের দায় ঘাড় পেতে নেয় জগতের আশীর্বাদ তাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যায়।

নিবেদিতার কণ্ঠস্বরে সারল্য ও আন্তরিকতার যাদু এবং পবিত্রতার এমনি এক অমৃতস্পর্শ ছিল যে মিসেস নোবল কথা বলতে পারল না অনেকক্ষণ। অভিভূত গলায় অসহায়ের মত উচ্চারণ করল, মাই পুওর চাইল্ড ! আই অ্যাম্ হেলপ্লেস।

মাকে সান্ত্বনা দিয়ে নিবেদিতা বলল, দুদিন থেকে গেলে হয়তো তোমার ভালো লাগত। কিন্তু ঐ স্বল্পক্ষণের ভালোলাগার স্বাদ পেয়ে তুমি আরো কষ্টভোগ করবে। তোমার সেই আর্ত বেদনাময় মুখখানা দেখে আমি কি খুব শান্তি পাব? যতক্ষণ ঐ মুখ

মনে পড়বে ততক্ষণ মোহমুক্ত হয়ে নিশ্চিন্তে কাজে মন বসাতে পারব না। তার চেয়ে হাসিমুখে বিদায় দাও। রাতের ট্রেনে স্কটল্যান্ডে যাওয়ার অনুমতি দাও। হাসি মুখে বল, বাই! সাহসের সঙ্গে এই কথাটা একবার উচ্চারণ করলে আর কোনো কষ্ট থাকবে না। ভুলে যাও, আমি কোনো কালে ছিলাম তোমার।

মিসেস নোবল কন্যার দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণের জন্য চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করল, বাই। মাই চাইল্ড। কথাগুলো বলতে বুক ফেটে গেল। চোখ ভাসিয়ে জল নামল।

।। তিন ।।

নিউইয়র্ক থেকে দেড়শ মাইল দূরে হাডসন নদী ও পাহাড়ঘেরা মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে রিজলিম্যান-এ মিস্ ম্যাকলাউডের বড় বোন মিসেস লেগেটের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য স্বামীজি বসবাস করছিলেন। স্বামীজির তারবার্তা পেয়ে নিবেদিতা ইংলন্ড থেকে সেখানে উপস্থিত হলেন। রিজলিম্যানের চত্বরে মিসেস লেগেটের অতিথিভবন শিকার কুটিরে নিবেদিতার থাকার ব্যবস্থা হলো। সেখানে পুরনো বন্ধুদের মধ্যে মিসেস সারা বুল ও তাঁর কন্যা ওলিয়া, কৃস্টিন এবং আরো অনেক চেনা মানুষের সঙ্গে একত্রে থাকতে পারার জন্য বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করল। দিনগুলো শান্তিতেই কাটছিল। এরকম নিশ্চিন্ত জীবনযাপনে নিবেদিতা হাঁফিয়ে উঠল।

স্বামীজির সঙ্গে প্রতিদিনই দেখাসাক্ষাৎ হয়। মাঝে মাঝে স্বামীজিও তাদের শিকার কুটিরে যান গল্পগুজব করতে। কিন্তু সেখানে নিবেদিতার অস্বস্তি তাঁর নজর এড়াল না। সংশয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করেন, তবে কি কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে নিবেদিতা প্রস্তুত নয়। অথচ এক বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাকে বিদেশ সফরের সঙ্গী করেছেন। রিজলিম্যানে প্রতিদিন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশ হয়। তাদের মারফত যোগসূত্র গড়ে তোলার একটা আদর্শ জায়গা রিজলিম্যানের সারস্বত পরিবেশ। আর সেজন্য মে'র বিয়ের পরেই মার্গটকে রিজলিম্যানে আসার জন্য এক তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। নিবেদিতাও কালক্ষয় না করে মে'র বিয়ের অব্যবহিত পরেই নিউইয়র্ক হাজির হল। নিবেদিতার যে তাঁর প্রতি গভীর টান আছে এটা তাঁকে এক অন্যধরনের স্বস্তি ও সুখ দিল। আগের চেয়ে দেহে ও মনে বেশি করে সুস্থতা বোধ করলেন। নিবেদিতাকে দিনান্তে একবার চোখের দেখা দেখতে পেলে তাঁর ভালো লাগে। মনটাও বেশ আনন্দে থাকে। অনেকটা উজ্জ্বল ঝরনা কিংবা তরঙ্গ সংক্ষুব্ধ সমুদ্র অথবা সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত দেখলে যেমন হৃদয়মধ্যে এক অনাবিল অধীরতা সঞ্চার হয় অনেকটা সেরকম খুশি খুশি ভাব তাকে আকুল করে।

স্বামীজির সব চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রে ছিল নিবেদিতা। রিজলিম্যানে যা কিছু বলেন তা নিবেদিতাকে লক্ষ্য রেখে। সান্ধ্যমজলিসে যেসব শ্রোতারা স্বামীজির কথা শুনতে

আসেন তাঁদের মধ্যে নিবেদিতাও বসে থাকত। ক্রমেই নিবেদিতা সম্পর্কে শ্রোতাদের কৌতূহল সৃষ্টি হল। তার মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বাধীনচেতা শ্বেতাঙ্গ মহিলা কিসের আকর্ষণে স্বদেশ ও স্বজন ত্যাগ করে ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে গ্রহণ করল। ভারতীয়দের মত জীবন যাপনের উৎসাহই বা কোথা থেকে পেল? এসব প্রশ্নে নিবেদিতা স্বভাবত একটু বিব্রতবোধ করত। কিন্তু স্বামীজি উৎসুক শ্রোতাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গর্বের সঙ্গে বলেন, অধ্যাত্ম সাধনার পীঠস্থান ভারতবর্ষ মার্গটের অন্তরের অধ্যাত্ম তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল। ভারতবর্ষের নামের সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই তার একটা যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। সেটা ছিল একটা কাকতালীয় ব্যাপার। মার্গটের বাবার বন্ধু মিঃ ডেভিড ভারত প্রত্যাগত এক ধর্মযাজক। তাঁর কাছেই মার্গট ভারতবর্ষ নামটা শুনেছিল। মার্গটকে দেখে ডেভিডের হঠাৎ মনে হল, এই মেয়েকে ভারত তার কাজের জন্য ডেকে নেবে। মার্গট ভারতবর্ষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবে। ঈশ্বরের সে ইচ্ছা পূরণ করল নিবেদিতা। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ নয়, কেবল ভারতবর্ষ সকলকে বরণ করে নেয়। ভারতবর্ষের আদর্শ ত্যাগ করা নয়, গ্রহণ করা এবং সমাদর করা।

শ্রোতাদের একজন বলল, ভারতবর্ষ অন্যধর্মের বা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করে। তাদের ছায়া গায়ে পড়লে ভারতীয়দের জাত যায়। একে কি কেউ বরণ করে নেওয়ার সদিচ্ছা বলতে পারে?

স্বার্থান্বেষীরা যেদিন ভারতবাসীকে অস্পৃশ্য এবং ম্লেচ্ছ কথাটা শেখাল, সেদিন থেকে তারা ভারতবর্ষের মাটিতে গড়ে ওঠা ধর্ম ও আদর্শের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করল। তখন থেকেই ভারতের ঘোর দুর্দিনের সূত্রপাত। আজ ভারতবর্ষের ভুল শোধরানোর দিন এসেছে। চিরন্তন সত্য ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা ভারত নিজেই করবে। যে মানুষ নিজে পবিত্র এবং সৎ, বাইরের অপবিত্রতা এবং অধর্মকে সে দেখতে পায় না। সে যা চায় তাই পায়। আমি তোমাদের যীশুখৃস্টকে বুকে টেনে নিতে পারি, টেনে নিতে পারি কি, টেনে নিয়েছি, কিন্তু তোমরা আমার কৃষ্ণকে বুকে টেনে নিতে পার? পার না, পারবে না। কারণ তোমাদের হৃদয়ে সেই প্রসারতা নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষের তা আছে। ভারতবর্ষের মানুষের এই চারিত্রিক ঔদার্য ও দৃঢ়তা মার্গটের মধ্যে ষোলো আনা আছে বলেই সে ভারত ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতার ভাবনা-চিন্তা, আদর্শ ও ধর্মবোধের সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল এতই সুগভীর যে ভারতাত্মার বোঝা বহনে সে সক্ষম। মার্গারেটের সে শক্তি, গুণের কথাকে জানতে চায়। মার্গারেট কিছু পাবার জন্য ভারতে আসেনি। মার্গারেট ভারতবর্ষের জন্য শুধু নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। সে শুধু দিতে চায়, চায় না কিছুই। ভারতবর্ষের আদর্শ হল দিবে আর নিবে। মিলাবে আর মিলিবে। প্রেমই আমাদের একমাত্র দেবার বস্তু। মার্গটের অনুভবে এই ভারতবর্ষ

বিদ্যমান। ভারতবর্ষে আসা তার সর্বতোভাবে সার্থক হয়েছে। তার মত আর কোন্ বিদেশিনী পেরেছে ভারতবাসীকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে, দেশের দশের কাজে জীবন দানে উদ্দীপিত করতে, সমস্ত ঘৃণা, বিদ্বেষকে প্রেমে বিশুদ্ধ করতে, আত্মোপলব্ধির কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির হয়ে দাঁড়াতে? আর কার ললাটে লেখা এমন নির্ভুল ঈশ্বরের ঠিকানা?

স্বামীজির মুখে নিজের প্রশস্তি শুনে নিবেদিতা তো অবাক। এগুলো সবই ঘটনা। স্বামীজি একবর্ণ মিছে বলেননি। তবু স্বামীজির সুধাস্নিগ্ধ কণ্ঠে তার ব্যক্তিত্ব ধরাছোঁয়ার বাইরের বস্তু হয়ে উঠল। সেজন্য লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল। সকলের থেকে আলাদা করে তাকে বিশিষ্ট করে তোলার এই চেষ্টার বিপক্ষে কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়াল। বলল, স্বামীজি!

মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতারা চমকে তাকাল তার দিকে। নিষ্কোষিত তরবারির মত নিবেদিতা জ্বলজ্বল করছিল। তার দুই চোখ স্বামীজির ওপর স্থির। অকম্পিত গলায় বলল, আমি নিজের সম্পর্কে যা জানি যা বুঝি তার সঙ্গে বৃহত্তর জীবনযাপনের জন্য আপনি যে নিবেদিতাকে আহ্বান করেছিলেন সে কি আমি? বোধ হয় আমরা দু'জনে এক নই। আজ নিজের এক উপচানো আনন্দ এবং সুখবোধ থেকে আপনি যা বললেন তা নিছকই এক ভাবাবেগ। অথচ, আপনিই শিক্ষা দিয়েছেন মানুষ নিজেকে খুব কম জানে। ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে নিজেকে জানবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা কর। নিজেকে জানা হল সবচেয়ে বড় জানা। আত্মানং বিদ্ধি এই হল জীবনের মূলমন্ত্র। আরো বলেছেন কারো প্রশস্তিতে গলে যেও না। প্রশস্তির মত বড় রিপু আর নেই। আত্মপ্রশংসার দুর্বলতা থেকে শত হস্ত দূরে থাকবে। তা হলে আপনি নিজের বিধান মানছেন না। তবে কি মনে করব, ঠাকুর যেমন অভিনয় করে মা সারদাকে বাজিয়ে নিতেন, আপনি কি তেমনি করে আমাকে পরীক্ষা করছেন!

স্বামীজি নিরুত্তর। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন তার দিকে। দু'চোখে তাঁর কৌতুক, অধরে টেপা হাসি। সবিস্ময়ে বললেন, কী মেয়েরে বাপ্। আমি চলি ডালে ডালে ও চলে পাতায় পাতায়। একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেলাম। খেলার সমস্ত মজাটা মাটি করে দিল মার্গট। নতুন করে আসর জমবে না আর? অতএব আলোচনার ইতি এখানেই।

স্বামীজির মুখে প্রশস্তি শোনার অভ্যাস নিবেদিতার নেই। অন্তত তার স্তুতি করেননি ইতিপূর্বে। হঠাৎ প্রশংসার বিষপাত্রটি অধরের সামনে মেলে ধরলেন কেন? প্রশ্নটা নিবেদিতা নিজেকে করল। এ কোন গৌরব মুকুট পরিয়ে তার অভিষেক করতে চাইছেন? সেই অনাবিস্কৃত সত্যকে জানার জন্য ভেতরটা তার অস্থির হল।

রিজলিম্যানে ডেকে এনে স্বামীজি তাকে নিয়ে কী করতে চাইছেন তা বোঝার পথে

ারো এক ধাপ অগ্রসর হওয়ার জন্য মনের অতলে ডুব দিতে হবে তাকে। সংকল্পে
য়ী হওয়ার জন্য শপথ করল মনে মনে। বলল, রাজা তোমায় যে কত ভালোবাসি,
জো করি তুমি জান না। কিন্তু কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ফুটতে গেলে আমার এ অহংকার
ড়তে হবে। এতকাল যে ভালোবাসা বুকে আঁকড়ে ছিলাম তা বিলিয়ে দিতে হবে।
ব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে যদি অকুণ্ঠচিত্তে তোমায় বলতে পারতাম—তোমার কাছ
থকে আমাকে দূরে যেতে হবে রাজা। তোমার কাছে থাকলে কিছুই করতে পারব না।
মি যে আমায় ছেয়ে আছ।

সভা ভঙ্গ হওয়ার পরে একে একে সকলে বিদায় নিল। কেবল নিবেদিতা এককোণে
প করে বসে রইল। তার থমথমে স্তব্ধ গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্বামীজি বললেন,
াার্গট তুমি গেলে না। কিছু বলবে?

স্বামীজির গলার স্বর কানে এলে খুশিতে ভরে যায় মন। কী ভালো লাগে তখন।
নব গণ্ডগোল হয়ে যায়। বহু কষ্টে বিস্ময়টাকে চট করে নিজের ভেতর লুকিয়ে ফেলে
বলল, কয়েকদিন আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করব না বলে মনে মনে স্থির করেছি।
শিকার কুটিরে নিজের কক্ষে কিছুদিন একা থাকব। কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত
করব না। কিন্তু আপনিই সে পথের একমাত্র বাধা। আপনি ডেকে না পাঠালে ভালো
হয়।

বিবেকানন্দ উৎফুল্ল হয়ে বলল, আত্মবিশ্লেষণের জন্য একা থাকাই সবচেয়ে ভালো।
কিন্তু পাখির মতো ছোট্ট ডানা দু'খানা মিছেই ঝাপটে নিজেকে ক্লান্ত করছ। চোখ মেলে
চেয়ে দেখ নিজেকে। তোমার মুখে হাসি ফুটুক, আনন্দে হৃদয় উদ্বেল হোক।
শক্তিরূপিণী মা সর্বদা তোমার সঙ্গে আছেন। তাঁকে অন্তরের মধ্যে জাগিয়ে তোল।
বৈরাগ্য সাধনের মুক্তি তোমার জন্য নয়। মাকে ডাক দুর্গা দুর্গা করে। মা, তোমায় শক্তি
দেবেন। জয় হোক তোমার।

কথাগুলো বলা শেষ করে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত পায়চারি করতে করতে হঠাৎই
বললেন, মার্গট, গোলকুণ্ডা জাহাজে তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম পশ্চিম থেকে যে
টাকাটা যোগাড় করবে, তার কথা কিছু ভাবছ।

শান্তভাবে নিবেদিতা বলল, সব সময় ভাবছি। কিন্তু দিশা খুঁজে পাচ্ছি না। বাস্তব
বড় কঠিন। শেষ পর্যন্ত কী করতে পারব জানি না।

হতাশ হওয়ার কিছু নেই। রিজলিম্যানে নানা ধরনের মানুষ আসে। এখান থেকে
দিশা খুঁজে নিতে হবে। তোমাকে সফল হতে হবেই। মরবার আগে দুটো জিনিস দেখতে

চাই, একটা হয়েছে, আর একটা বাকি আছে কিছুটা।

নিবেদিতার বুকের ভেতর যুগপৎ আনন্দ ও ভয়ের শিহরন বয়ে গেল। অস্ফুট গলায় বলল, একলা এগিয়ে যাবার শক্তি আমার আছে তো!

স্বামীজি জোর দিয়ে বললেন, আলবৎ আছে। ভালোবাসার জোরে মানুষ পৃথিবী জয় করতে পারে। মনে রেখো মুখে ভালোবাসা বলাটা সব নয়। মনেপ্রাণে এক করে পেতে হবে। এর নাম সাযুজ্য। সাযুজ্য ভালোবাসার চেয়ে বড়। যাকে ভালোবাসি তাকে ঠিক আত্মসাৎ করতে পারি না। ভক্তি আর জ্ঞানের মধ্যে এই তফাত। এ কারণে ভক্তির চেয়ে জ্ঞান বড়। ভক্তিতে ভাবাবেগের শুধু বাড়াবাড়ি, কিন্তু জ্ঞানে তার কোনো স্থান নেই। সেখানে বিচার-বিবেচনাই সব। হৃদয়ের চেয়ে মস্তিষ্কের ভূমিকা সেখানে বড়। তাই জ্ঞানই প্রকৃত সত্যে পৌঁছনোর হদিশ দিতে পারে। ভাবুকতা ছেড়ে নিজেকে জান। নিজেকে যখন জানতে পারবে তখন আকাশ হতে বজ্রের মত ভেঙে পড়বে দুনিয়ার ওপর। যারা বলে আমার কথা কে শুনবে, তাদের ওপর আমার কোনো আস্থা নেই। কিছু বলবার পুঁজি যার ভেতর আছে তার কথা না শুনে ফিরিয়ে দিতে দুনিয়া এ পর্যন্ত পারেনি। নিজের শক্তিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াও।

নিবেদিতার দু চোখে গভীর বিস্ময়। গুরুর এসব কথা বলার অর্থ কি তার জানা নেই। নিজেকে মুক্ত বলেই মনে হয়। তার সংকল্প নেই, বাসনা নেই, তাহলে এসব কথা গুরু শোনাল কেন? এই কেন'র রহস্য ভেদ করতে পারল না। তাই নিরুত্তর রইল।

স্বামীজি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, রাত হয়েছে, চল তোমাকে পৌঁছে দিই।

রাস্তায় আলো ছিল তবু অন্ধকারের তুলনায় সে সামান্য। গুরু শিষ্যা আলো-আঁধারের মধ্যে পাশাপাশি হাঁটছিল। এতই আস্তে পা ফেলছিল যে পায়ের শব্দটি পর্যন্ত ভয়ংকর নির্জনতার মধ্যে শোনা যাচ্ছিল না। পথে কেউ কারো সঙ্গে কথা বলল না। চৌরাস্তার মোড়ে এসে স্বামীজি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে ঠিক করতে হয় কোন্ পথে গেলে সে তার গন্তব্যে পৌঁছবে। আমি এখান থেকে ফিরব। তোমাকে একা এখান থেকে নিজের কুটিরে যেতে হবে। এখন থেকে একলা চলা শুরু করতে হবে। দর্শকের মত আমি শুধু চেয়ে থাকব। মনে রেখ, প্রশ্ন আমিই তুলি, জবাবের ইশারাও দিই আমি।

নিবেদিতার খুব অবাক লাগল। স্বামীজি কেমন করে যে তার ভেতরটা দেখতে পান সে জানে না। মনে মনে সত্যিই প্রার্থীর মত নীরব প্রার্থনা করে আসছে, মায়ের কাছে এবং গুরুর কাছে শক্তি ভিক্ষে করছে। মনের কথাটা টের পেয়েই যেন গুরু তাকে প্রস্তুত হতে বললেন। হাঁটতে হাঁটতে এই কথাগুলো কেবলই মনে হতে লাগল।

ঘর থেকে ক'দিন বেরোল না নিবেদিতা। কপাট বন্ধ করে কালী দি মাদার রচনায় গ্ন থাকল। ক'দিন এভাবেই কেটে গেল। স্বামীজি নিকটে অবস্থান করছেন অথচ সঙ্গে দেখা না হওয়ার জন্য মনটা হাঁফিয়ে উঠল। তবু, সংযমের রাশ ধরে নকে সামলাল। কেমন করে মাকে ডাকবে, তাঁকে নিয়ে গ্রন্থ রচনা করবে সেই ই নিভৃতে ভাবতে থাকে নিবেদিতা। লেখার সময় স্বামীজির কথা বেশি করে মনে কালী সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা তার প্রথম নয়। এর আগেও অনেক বক্তৃতা করেছিল। ; তার অংশবিশেষে স্বামীজির অপছন্দ ছিল। এবার তাঁর মন কাড়াই ছিল বদিতার উদ্দেশ্য। কিন্তু কালী সম্পর্কে বক্তৃতায় অপছন্দের কারণটি নিবেদিতাকে ননি স্বামীজি। এখন তাকেই ভেবে স্থির করতে হবে কোথায় তার অপূর্ণতা। কী নের অপূর্ণতা তাঁকে অতৃপ্ত করেছে। এসবই তাকে আবিষ্কার করতে হবে নিজে ক। কালীর স্বরূপকে মনের মন্দিরে পুনঃনির্মাণ করে এক অভিনব প্রতীকী সত্যকে ন্বষণ করতে লাগল। কিন্তু বক্তব্যগুলোকে মনের মত করে গুছোতে পারে না। টুটা লেখে আর কাটে। লেখার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব পীড়িত করল তাকে। শ হয়ে লেখাটা মাঝে মাঝে ছেড়ে দেয় আবার কিছুক্ষণ পরে যত্ন করে বুকে তুলে য়। মায়ের কাছে ক্ষমা চায় করুণা চায়। কোন অপরাধে মা লেখায় বিঘ্ন করছে—এই জ্ঞাসায় মন আর্ত হয়।

বুকের অভ্যন্তরে এক সময় দৈববাণীর মত কে যেন কথা কয়ে উঠল। নিবেদিতা ষ্ট শুনতে পাচ্ছিল অন্তরীক্ষ্য থেকে মা যেন সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আমার খুশিতে এ য়ায় এসেছ মনে থাকে না কেন? যখন আঁধার ঘনিয়ে আসবে, আমার ইচ্ছে পূরণ ব তখন সেই খুশিতে তোমায় নিয়ে যাব আমার অন্তরের গহনে। মনে রেখ, তুমি ছুই কর না, আমি যন্ত্রী তুমি যন্ত্র—যেমন চালাই তেমনি চল। আমি ইচ্ছে জাগাই, ঃ তুলি আবার তার সমাধানের ইশারাও দিই। শীঘ্রই অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরবে। ন রেখ অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানে ফেরা বড় যন্ত্রণার।

একটা ঘোরের মধ্যে নিবেদিতা নিরুচ্চারে বলল, মা গো যাঁকে ভালোবাসি, কত খ তাঁর মনে। আমার হৃদয়ের পানে উন্মুখ হয়ে আছে তাঁর হৃদয়, আমি তাঁর সহায় । । কিন্তু তাঁর দুঃখ ঘোচাতে পারি না। কেন এমন হয়? তুমি সব জান। শুধু সাক্ষীর ত চেয়ে দেখ না। তাঁর জন্য শান্তি আহরণ করতে পারি এই বর দাও। মা-গো আমার ন্তি আমি চাইব না কেন? কিন্তু তোমার প্রসাদ লাভের জন্য তাঁর প্রয়োজনের দাবিকে নিঃসঙ্গতার বেদনাকে উপেক্ষা করতে পারব না মা!

নির্জন কক্ষের অভ্যন্তরে আকুল আবেদনের প্রত্যুত্তরে স্নেহময়ী জননীর কণ্ঠে ন্ত্বনার বাণী শুনতে পেল নিবেদিতা। বোকা মেয়ে! তার স্নেহের বিনিময়ে তুমি যে াকে ভালোবাসা দিচ্ছ, তোমার সব শ্রদ্ধা নিবেদন করছ তাঁর প্রতিটি কণিকা লোহার

শিকল হয়ে বাঁধছে তাঁকে, যন্ত্রণাময় জীবন তাঁর দীর্ঘায়িত করছে। এখন নিজেকে সরিয়ে নিতে পারিস যদি, তাহলেই শান্তি দিবি তাঁকে।

নিবেদিতা টেবিলের ওপর মাথা রাখল। টেবিল ল্যাম্পের আলোর বৃত্তটা ত্রিনয়নী মায়ের নয়নের মত অপলক চেয়ে রইল তার দিকে। ভেতরটা তার সহসা জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পেল। যেন কোনো অন্ধকারের ভিতর থেকে তার অতীত বর্তমান কথা কয়ে উঠল। মাগো সত্যি বলতে কি স্বামীজির ওপর আমার সামান্যই নির্ভর ছিল, বলতে গেলে কিছুই ছিল না। আলমোড়ার সেই সঙ্কট সময়টাতে যখন মনে হয়েছিল উনি বুঝি অবজ্ঞাভরে নিজের জীবন থেকে আমায় ছেঁটে ফেলেছেন তখনও মনের ধারণা বেশি ইতর বিশেষ হয়নি। কিন্তু এখন ভালোই হোক, বা মন্দই হোক তাঁর জন্য এ জীবন। ভালোবাসায় এখন দিন দিন তাঁর পূজারী হয়ে উঠছি। আমিও বুঝি এভাবটা কমানো দরকার। কিন্তু কেন জানি না, এই আকুলতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, কোথায় যে এর শেষ তাও জানি না। ঠিক বলতে পারি না, তবে মনে হয় তাঁর একটা খামখেয়ালও এখন আমার পক্ষে সর্বস্ব। তাঁর কথা ভাবতেই হৃদয় যেন মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে ওঠে। এমন করে যে ভালোবাসতে পেরেছি এ তোমারই দায়।

নিবেদিতার অন্তঃকরণ সহসা আর্ত হয়ে ওঠে। আকুল কণ্ঠে মার কাছে যেন আবেদন করল, ওই দুর্বার ভালোবাসা রুখতে হবে। তা হলেই আর কিছুতে জড়িয়ে পড়ব না। শান্ত মনে তোমার কথা ভাবতে পারব। ওঁর কাছে আমাকে ছোট করে দিও না।

অন্ধকারের মধ্যে বিশ্বজননী মায়ের মূর্তি ফুটে বেরোল। মা যেন আহ্বান করল তাকে। আয় বাছা, আমার বুকে আয়, তবেই তাকে তৃপ্তি দিতে পারবি। নিজেকে সরিয়ে দিতে পারিস যদি, তাহলেই শান্তি দিবি তাকে।

নিবেদিতা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল সম্মোহিতের মত মার আহ্বানের প্রত্যুত্তরে সে বলছে, হার মেনেছি মা! আমায় তোমার বুকে তুলে নাও। আর পিছন ফিরে তাকাতে দিও না। চোখের জলে দৃষ্টি অন্ধ হয়ে আসছে। তবু, তুমি যদি ডাক দাও, তোমার বুকে পথ খুঁজে পাব আমি। নিশ্চয়ই পাব।

মা যেন সহসা অন্ধকারের মধ্যে হেসে উঠল। বলল, কী বোকা মেয়ে দ্যাখ। আমার করুণা সর্বক্ষণ তোকে ঘিরে আছে। পাখির মত ছোট্ট তোর ডানা দু'খানি মিছেই ঝাপ্টে মরছে। কিসের ভয় তোর? চোখ মেলে চেয়ে দ্যাখ—এই তো আমি। যে মেঘ ঘনিয়ে উঠেছিল তোর চিত্তকাশে ঝড় এসে তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। তোর ত্যাগে, নিষ্ঠার চিত্তকমল ফুটেছে হৃদয় কোকোনদে। তোর আর ভাবনা কী? আনন্দে উদ্বেল হোক তোর হৃদয়।

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘাড় নাড়ল নিবেদিতা। বলল, আমি পারব মা। আর আমার ভয় নেই।

যে নিরন্তর অনন্ত জিজ্ঞাসার প্রহেলিকা তার প্রকাশোম্মুখ সতেজ নবীন মনের ওপর আলেছায়ার খেলা করছিল তার অবসান হলো। মন আলো করা প্রসন্নতায় জীবন্ত অনুভবের সত্য শিল্পের ভাষায় বাণীময় হল। নিবেদিতার এ এক নতুন অনুসন্ধান। কালী মহিমার নবীন বন্দনা।

পাঁচদিন বাদে চকিত কড়ানাড়ার শব্দে নিবেদিতা চমকাল। কালী দি মাদার লেখা তখন সবে শেষ হয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্ত দ্বারে করাঘাত করল কে? দ্বার খুলেই স্বামীজিকে দেখল। নিবেদিতার বিস্ময়ের সীমা নেই। গ্রন্থরচনা শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই স্বামীজির আচমকা দর্শনলাভ করা তার কাছে বিস্ময়কর ঘটনা। এক গভীর ভালোলাগায় মন ভরে গেল। এক ধরনের অপ্রকাশ্য বিস্ময় মেশানো তীব্র আনন্দ কিছুক্ষণের জন্য তাকে বোবা করে দিল। কয়েকমুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারল না। স্বামীজি মৃদু হেসে বললেন, মনে হচ্ছে ভূতনাথের ভূত দেখে চমকে গেছ। অমন করে দরজা আগলে দাঁড়ালে ভেতরে যাই কেমন করে?

নিবেদিতা ওঁর কথায় লজ্জা পেল। থমথমে গম্ভীর গলায় অস্ফুট স্বরে বলল, কী যে বলেন আপনি?

মনের শান্তিতে তুমি মহিমময়ী হয়ে উঠেছ।

এই মুহূর্তে কালী দি মাদার শেষ করে আপনার কথা ভাবছিলাম। পাঠ করে শোনাতে ইচ্ছে করছিল। আমার সেই ডাক আপনার কানে কী করে পৌঁছল? মনে মনে যাকে ভীষণভাবে চাওয়া যায় তিনি বোধহয় এভাবেই ডাকার আগেই চলে আসেন। একেই বলে টেলিপ্যাথি।

তা হয়তো হবে। কিন্তু কাজের সময় নষ্ট হওয়ার ভয় আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। কাজে নামার সময় হয়েছে তোমার। শক্তিস্বরূপিণী মা সর্বদা তোমার সঙ্গে আছেন। তোমার মধ্যেই আছেন। তাঁকে জাগিয়ে তোল, ডাক দুর্গা দুর্গা বলে। মা তোমায় শক্তি দেবেন।

কেমন করে বুঝলেন?

মনের ভেতর তাঁর নির্দেশ তুমি শুনেছ। বসন্ত এলে কোকিলকে ডাকতে হয় না। সে নিজেই কুজন করে বসন্তের আগমন জানিয়ে দেয়। গাছের ডালে ডালে কচিপাতা গজায়, ফুল ধরে, ফল হয়। ঋতুরাজ নিজের হাতে প্রকৃতিকে সাজিয়ে দেয়।

কান জুড়িয়ে গেল নিবেদিতার। কথা তো নয় কাঁচ কাটা হীরে। সমস্ত অন্তঃকরণটা ঝলমলিয়ে ওঠে। অভিভূত হয়ে নিবেদিতা গুরুর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল। চোখের বিন্দু বিন্দু জল গুরুর পা দুটো ভিজিয়ে দিল। শিষ্যার মাথায় হাত রেখে

আশীর্বাদ করলেন বিবেকানন্দ। শান্তিঃ, শান্তিঃ আমার শান্তি তোমার মাঝে। তাকে সার্থক কর। এই হল আমার আশীর্বাদ।

নিবেদিতা স্বামীজির মনের কথা ভালো করেই জানে। গুরু যেন একটা কিছুর দিন গুনছেন। সেটা না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই। স্বামীজির প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার যন্ত্রণা তাকেও শান্তিতে থাকতে দেয় না। স্বামীজি কোনো স্পষ্ট আভাস না দিলেও নিবেদিতা জানে ভারতের চিত্ত জাগরণের বাণীকে মানুষের অন্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই তিনি হাঁক পেড়ে চলেছেন। ওঠো, জাগো, অগ্রসর হও। কাজে নেমে পড়লে শক্তি আপনি এসে যাবে। অপরের জন্য কিছু করতে আরম্ভ করলে বুকে আসবে সিংহের বল। কারণ, জন্ম থেকে তুমি মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। তাই তিনি বারংবার আহ্বান করেছেন শক্তি অর্চনায়। নারী জাগরণ আর জনচিত্ত জাগরণকে তিনি একমাত্র কাজ মনে করেন। অন্ধ কুসংস্কার, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতার অচলায়তন ভেঙে ভারতীয়দের বেরিয়ে আসার জন্য, রক্তস্রোতে গতিবৃদ্ধির জন্য পাশ্চাত্যে যা কিছু শিক্ষাপ্রদ, বীর্যবত্তা প্রকাশের সহায়ক তাকেই নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ভারতীয় জনগণের উত্থানের এই কর্মভার গ্রহণ করার সেই মানুষটা জাতীয় জীবনে বড় অভাব। তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার সারথ্য গ্রহণের ক্ষমতা ভারতপ্রাণা বিদেশিনী নিবেদিতার ভেতর গভীরভাবে আছে বলেই সন্ন্যাসিনী করে তার শক্তিকে চাপা দেননি। তাঁর মানুষ তৈরির স্বপ্ন নিবেদিতা সার্থক করুক এটাই মনে মনে ভীষণভাবে চেয়েছিলেন। নিবেদিতা হলো মায়ের জাত। মা পারে সন্তানের আত্মগঠন করতে, তার ভিতরের শক্তিকে উদ্দীপিত করতে, তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে সংগঠন করতে। আর সেজন্য চাই শিক্ষা। অন্তঃপুর থেকে শুরু করতে হবে। নারীশিক্ষা ছাড়া মানুষ গড়ার স্বপ্ন সফল হবে না। নারীশিক্ষাই নারীর জীবনের মধ্যে এক নতুন বেগ সঞ্চার করে তার চিন্তার অনুভূতির মধ্যে এক শক্তিময়ী জীবন্ত নারীর প্রাণাবেগ সৃষ্টি করবে। বিদ্যুৎ চমকের মত স্বামীজির অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষাগুলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নিবেদিতার সমস্ত চেতনার ওপর নেমে এল বিহ্বলতা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর নিবেদিতা খুব সংকোচের সঙ্গে বলল, রাজা, আপনার কথাগুলো যখন গভীর মন দিয়ে শুনি তখন আপনার সন্ন্যাসীর বহির্বাসের অন্তরালে সৈনিকের বর্ম দেখতে পাই। বোধ হয়, এটুকুতেই সব বলা হল না, রাজপুতের বীরত্ব, শিখের বিশ্বাস, মারাঠার সাহস, সাধুদের ভক্তি ও তপস্যার সমন্বয়ে গড়া এক আশ্চর্য মানবমূর্তি আপনি। আপনার কণ্ঠে যে রণহুঙ্কার, সে বিপ্লবের। এর মধ্যেই তো আমার বাঁচা মরা। তবে, আপনার প্রিয় স্বদেশের কথা ভাবা ছাড়া আমার আর কোনো আনন্দ নেই, কোনো আসক্তি নেই। এ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব না। এ আমার সংকল্প। মনের কথা সব গুছিয়ে বলতে পারি না, জানি না কী বলছি!

নিবেদিতার কথা শুনে স্বামীজি ভীষণ খুশি হলেন। বললেন, চমৎকার। তুমি ক্ষত্রিয়ানী বলে এমন করে আমার বুকের গোপন ভাষা পড়তে পেরেছ। আমরা এক গোত্রের লোক। আমাদের উপলব্ধিও এক। ব্রাহ্মণের কৃচ্ছ্রতপ তোমার জন্য নয়। কাজ কর, করে যাও। আর যে কোন অবস্থায় মনে রাখবে তুমি স্বাধীন। তোমায় সবরকম স্বাধীনতা আমি দিয়েছি। অন্তরের প্রেরণাকে গভীরভাবে অনুভব কর, তারপর আর কিছুই তোয়াক্কা কর না। মনে রেখো মায়ের দাসী তুমি। আর কতদিন এখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। কবে যাবে? কাজে হাত দেবে কবে?

নিবেদিতা ভেবে পেল না এই আকুল জিজ্ঞাসার কী উত্তর দেবে? চোখে-মুখে বিস্ময়ের ভাবটা তখনও পুরো কাটেনি। কাটবে কী করে? গুরু যে শিষ্যাকে অনেক মহামূল্যবান করে তুলেছেন। নিবেদিতাকে নিরুত্তর দেখে বিবেকানন্দ মনে মনে হাসলেন। শিষ্যা লোভীর মত তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে প্রিয় রক্তের দপদপানি অনুভব করল নিবেদিতা। এই হঠাৎ আলোড়নের তীব্রতাকে বুকের মধ্যে চট করে লুকিয়ে ফেলে শান্তভাবে বলল, স্বামীজি আপনার তারবার্তা পেয়ে রিজলিম্যানে এসেছি। আপনার হুকুম মানাই আমার কাজ। আপনার আদেশ পেলেই চলে যাব। আমার নিজের কোন কাজ নেই। আজ বললে আজই যেতে পারি।

মিসেস বুলের কনিষ্ঠা কন্যা ওলিয়া সেই মুহূর্তে নিবেদিতার ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। নিবেদিতার কথা শুনে থমকে দাঁড়াল। ওলিয়া বলল, আসতে পারি? নিবেদিতার দিকে চেয়ে বলল, যাওয়ার কথা বলছিলে না? পরশু আমিও শিকাগোয় যাচ্ছি। তুমি চাইলে আমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে যেতে পার। শিকাগোয় তোমার কোনো অসুবিধে হবে না।

স্বামীজি বললেন, এত খুব ভালো প্রস্তাব। তোমাদের মত যদি সুস্থ থাকতাম তা হলে এই দুনিয়াটা জয় করতাম।

ওলিয়া হেসে বলল, দুনিয়া জয়ের আর বাকি কী আছে? বিশাল ভারত ভূখণ্ডের কোথায় না গিয়েছেন? অর্ধ বিশ্ব পরিক্রমা তো হয়েই গেছে। এবার না হয় একটু বিশ্রামই নিলেন।

তুমি ঠিক বলেছ মেয়ে। সত্যিই, আমার কোনো কাজ নেই। আমার ওপর কারো দাবি নেই আর। এখন কোনো মস্ত গভীর মহীরুহের স্নিগ্ধ ছায়ায় একটা লম্বা ঘুম ঘুমোতে পারলে বেঁচে যাই। একটানা দীর্ঘ পথচলা বড় ক্লান্তিকর। বুকের মধ্যে বড় কষ্ট হয়। তাই শেষ সময় হওয়ার আগে আমার যা কিছু আছে সময় থাকতে থাকতে সব দিয়ে থুয়ে সকলকে সুধন্য করে চলে যাব। নিজের বলে আর কিছু থাকবে না। আমার গুরুও একদিন তাঁর সর্বস্ব আমাকে অর্পণ করে ফকির হয়ে গেলেন নিজে। তাঁর সে বোঝা বইতে আমি অশক্ত। আমি চাই মুক্তি। সম্পূর্ণ মুক্তি। তারপর লোকালয় ছেড়ে

হিমালয়ের বুকে প্রায়োপবেশন করে বলব হর্ হর্ ব্যোম্ ব্যোম্। আবার সন্ন্যাস নেব। নামটা বদলে ফেলব। কেউ আমায় চিনতে পারবে না।

কথাগুলোর মধ্যে লুকোনো তীব্র অভিমান ও বেদনা নিবেদিতাকে চমকে দিল। আশ্চর্য আর অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে তার সারা শরীর মন স্পন্দিত হতে লাগল। নিজের অজান্তে চোখ ভরে জল নামল। শপথের মত নিরুচ্চারে বলল, রাজা, আমি আর কাউকে তোমার চেয়ে বড় হতে দেব না। তোমার পতাকা বইবার শক্তি দিও আমায়।

স্বামীজির কথার মর্মার্থ বুঝতে পারে না ওলিয়া। চুপ করে ছিল। নিবেদিতা নীরব। তার দু'চোখের কোণে নিবিড় ব্যথা জমে উঠেছিল। স্বামীজি ওদের দুজনের ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন, ওলিয়া তোমার ভিতরটা মুক্তির জন্য ছটফট করছে। যাও। তোমার মাকে (মিসেস সারা বুল) রিজলিম্যানে দেখা করতে বলবে। ওঁকে আমার ভীষণ দরকার।

ওলিয়া ঘাড় নেড়ে চলে গেল। নিবেদিতা ওর গমনপথের ওপর চোখ রেখে বলল, বেচারা, হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। হঠাৎ ধীরা মাকে এত দরকার হল কেন?

ওঁর সঙ্গে নিউ ইয়র্কে যাব। আমাদের উভয়ের কর্মক্ষেত্র আমেরিকা। দু'জন দু জায়গায় কাজ করব।

তা না হয় হলো। আপনার যাত্রার দিন তো কালই। মালপত্তরও বাঁধাছাঁদা হয়নি।

তুমি তো আছ। ওগুলো নিজের হাতে গুছিয়ে দেবে। এসব কী করে যে কী করতে হয়, কিছুই জানি না।

নিবেদিতা খুশি হয়ে বলল, এ তো পরম সৌভাগ্য। আপনার সেবা করতে আমার যে কী ভালো লাগে তা তো কোনোদিন জানতেও চাননি।

কে বলল তোমায়? তোমার মনটাকে আয়নার মত দেখতে পাই আমি। তাই তোমার হাতের নিপুণ সেবাটুকু পাওয়ার জন্য রিজলিম্যান থেকে ছুটে এসেছি।

কথাগুলো নিবেদিতার অন্তরকে ভীষণভাবে ছুঁয়ে গেল। শরীরের মধ্যে ঘুঙুর বাজতে লাগল। বারংবার মনে হতে লাগল 'সেবা' একটা চমৎকার শব্দ। প্রিয়জনের স্নিগ্ধ মনের পরশটুকু স্বার্থহীন দানে ভরে ওঠে। স্বামীজি আগে এমনভাবে তাকে ডাকেনি। অথচ, এই সেবার অধিকারটুকু পাওয়ার জন্য কত কী করেছে। তবু তাঁর কাছে অধরা থেকে গেছে। সেই ইচ্ছেটা যখন মরে গেল তখন তার হাতের ঐ সেবাটুকু লাভের জন্য তাঁর এই কাঙালপনা নিবেদিতাকে অবাক করল। এই কথাগুলো এমন অনায়াসে বলার জন্য তাঁর কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কী সরল নিষ্পাপ ওঁর আলোয় ধোয়া মুখ। অধীর আনন্দে তার বুকের ভিতরটা কাঁপছিল তবু যথাসম্ভব ভাবাবেগকে সংযত করে নিজেকে অচঞ্চল রাখার চেষ্টা করল। শান্তভাবে বলল, এজন্য অসুস্থ

শরীরে এতদূর দৌড়ে আসার কোনো দরকার ছিল না। কাউকে দিয়ে খবর দিলে আমিই যেতাম। কালী দি মাদার সম্পূর্ণ হওয়ার খবর জানাতে তো আমি যেতামই।

তখনই এক বুকভাঙা নিঃশ্বাস পড়ল স্বামীজির। বললেন, সবই ঠিক আছে। প্রত্যেকের নিজের কিছু কিছু ব্যাপার থাকে যা অন্যকে দিয়ে হয় না। জীবনের কিছু কিছু মূল প্রশ্নের উত্তর একা একা দিতে হয়। নতুন করে নতুনভাবে বাঁচার দিন নেই আর। আমার দিনে তো পশ্চিমের লাল রঙ লেগেছে। এখন আর পুবে ফিরি কী করে? তোমার জীবন তোমার, আমার জীবন আমার। এখন যার যার জীবনের পথে একা একা হাঁটব। আমার জীবনের আসল মানেটা মুক্তি। সর্ববন্ধন থেকে মুক্তি।

স্বামীজি ও নিবেদিতা পাশাপাশি হাঁটছিল। বেশ কিছুটা পথ মুখ বুজে যাওয়ার পরে স্বামীজি নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, কী সুন্দর আর কী ভালো এই জায়গা। সব রাস্তাই শত ধারায় প্রবাহিত হাডসন নদীর ধার ঘেঁষে গিয়েছে। নদী থেকে উঠে আসা ফুরফুরে হাওয়ায় দেহ স্নিগ্ধ হয়। মন পুলকিত হয়। রাস্তার দুধারে গাছের সার। কতকালের পুরনো ওক গাছ সব। একটা আলাদা গম্ভীর সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছে। চতুর্ধার এত নির্জন যে নিজের পায়ের খস্ খস্ শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়।

নিবেদিতা চুপ করে গুরুর কথা শুনছিল। হ্যাঁ-না কোনো মন্তব্য করল না। শিষ্যাকে নিরুত্তর দেখে বললেন, তোমার মনে অনেক কিছু করার সংকল্প। সেগুলো যতখানি গুরুর জন্য ততখানি নিজের জন্য নয়। এটা কিন্তু কসরত করার জিনিস নয়। সহজে যা মনে আসে তাই করবে। জোর করে কিংবা অন্যের মন রাখার জন্য কখনও কোনো কাজ করবে না। এমন কি মুক্ত আত্মার পক্ষে ধ্যানও একটা বন্ধন। তুমি যা চাও তাই করবে। যে কোনো অবস্থায় মনে রাখবে তুমি স্বাধীন। আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি তোমায় সবরকম স্বাধীনতা আমি দিয়েছি। অন্তরের প্রেরণাকে গভীরভাবে অনুভব কর, তারপর আর কিছু তোয়াক্কা রেখ না। বিশেষ করে কে কী বলল তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল নিবেদিতা। স্বামীজির দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনুভব করল, গুরু তাকে প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করছে। তার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো বাস্তবের কঠিন আঘাতে যাতে নিঃসঙ্গ না করে সেজন্য সতর্ক ও সাবধান করে দিচ্ছেন। গভীর এক কৃতজ্ঞতায় আবিষ্ট হয়ে গেল তার চেতনা। অস্ফুটস্বরে বলল, আমি মুক্ত ছিলাম, মুক্ত আছি। আমার একমাত্র বন্ধন আপনি। যতই দূরত্ব তৈরি হোক, বন্ধন কিছুতে যেতে চায় না। পাঁচদিন আপনাকে ভুলে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার চোখ জুড়ে রয়েছে এক ধ্যানস্থ সন্ন্যাসী। সেই দিব্যপুরুষ বিশাল জনতার মাঝখানে অগ্নিশিখার মতন দাঁড়িয়ে জনজাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করছেন।

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়, অবিরাবীর্মএধি।।

আমার সে সন্ন্যাসীর কোনো কথাই ভোলার নয়। যতকাল বাঁচব ততকাল স্মরণে রাখব।

স্বামীজির অধরে রহস্যময় স্মিত হাসি।

গুরু-শিষ্যা কথা বলতে বলতে রিজলিম্যানের দিকে চলল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিবেদিতা বলল, এ জীবনে একটাই দুঃখ রয়ে গেল। ব্রতচারিণী থেকে সন্ন্যাসীতে উত্তরণের জন্য যতবার বলেছি, ততবারই এড়িয়ে গেছেন আপনি। আমার সে সাধ কি পূরণ হবে না? কিসে অযোগ্য তা তো বলবেন?

প্রত্যুত্তরে স্বামীজি নীরবে হাসলেন। বললেন, সব কিছু ত্যাগ করা বিসর্জন দেওয়া যদি সন্ন্যাসের যথার্থ লক্ষণ হয়, তাহলে দীক্ষা না নিয়েও একজন সন্ন্যাসী হতে পারে। যার মনটাই সন্ন্যাসী তার আবার আনুষ্ঠানিক দীক্ষা কিসের? মানুষ সবচেয়ে কম দেখে নিজেকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও সে নিজের পরিবর্তন দেখতে পায় না। রোজ যে পরিবর্তন হচ্ছে, ইচ্ছে করলেও তাকে কেউ দেখতে পায় না। আমি কিন্তু বাতাসে একটা পরিবর্তনের গন্ধ পাচ্ছি।

কথাগুলো নিবেদিতাকে অন্যমনস্ক করে দিল। কিসের পরিবর্তন। কার পরিবর্তন? এই পরিবর্তনের স্বরূপ কী? তবে কি মনের অভ্যন্তরে পরিবর্তনের পালা লক্ষ্য করে স্বামীজি এসব কথা বললেন?

রিজলিম্যানে যখন পৌঁছল তখনও নিবেদিতা জানে না কী ঘটতে চলেছে তার জীবনে। নিজের মনে স্বামীজির জিনিসপত্তর গোছাতে বসল। বইপত্তর, কাগজপত্তর কোন্ কোনটা লাগবে সব গুছিয়ে এক জায়গায় করল আগে। বাক্স থেকে অগোছালোভাবে রাখা কয়েকটা গেরুয়া রঙের স্কার্ফ বের করল। এগুলো পাগড়ি বাঁধতে লাগে। ওগুলি হাতে নিয়ে স্বামীজিকে জিজ্ঞেস করল, স্কার্ফগুলো তো ব্যবহার করেন না আর। এগুলো স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বাক্স ভরা থাকবে কি?

স্বামীজি হেসে বললেন, মিসেস লেগেটের মেয়েদের ওই স্কার্ফগুলো দেব। তারপর ওরা যা পারে করবে।

নিবেদিতা এরপরে গেরুয়া রঙের দুটি সুতীর উত্তরীয় দেখিয়ে বলল, এগুলো দেবেন কাকে?

নির্লিপ্তভাবে বললেন, ওগুলোও দান কবে দেব।

কিন্তু এ তো যাকে তাকে দান করার বস্তু নয়। অনেক ভাবনা-চিন্তা করে গ্রহীতা খুঁজতে হবে। দান গ্রহণের জন্য কাকে নির্বাচন করেছেন?

এখনও ভাবিনি। কারো কথা যদি ভেবে থাক বলতে পার তুমি।

সম্পত্তি আপনার। কাকে বিলোবেন আমি জানব কেমন করে?

গেরুয়া উত্তরীয় সন্ন্যাসের প্রতীকচিহ্ন। কেন বিলোতে চাইছি সেকথা শুনতে কৌতূহল হয় না তোমার?

সন্ন্যাসীর কোনো বন্ধন রাখতে নেই। গেরুয়া বসনও বন্ধন। সংসার থেকে, জীবনের মায়ামোহের অক্টোপাশ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে দৌড়ে যাওয়া খুব সহজ। ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়াও যায়। কিন্তু মনের বন্ধন তো নিজের কাছে লুকোতে পারবে না। এই গেরুয়া বসনের মায়া তাকে পিছনে টানতে পারে। এই আশংকা করে জীর্ণ বস্ত্রের মত সাবধানী সাধক তাকে ফেলে দিয়ে নির্মোহ হয়। আপনিও তাই চাইছেন।

তুমি চিরদিন সুন্দর কথা বল। এমন মনকাড়া কথার সঙ্গে শ্রোতার হৃদয়ের যে যোগাযোগ, তা মুহূর্তের মধ্যে ঘটে। বিদ্যুৎ চমকের মত হঠাৎই হৃদয়ে বাঁধা পড়ে।

রাজা, হৃদয়মুগ্ধ করা গান, কবিতা, মন আলো করা কথোপকথন, সুন্দর দৃশ্য ও গন্ধর মায়াবী স্পর্শের মত সহস্র হাতের সুদৃঢ় অদৃশ্য বন্ধনে মানুষ-মানুষীকে বেঁধে রাখে। সন্ন্যাসীরা বন্ধনের ফাঁদে ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়। বন্ধন এড়াতে গিরিগুহা খোঁজে। আসলে, মানুষের প্রকৃত কষ্টটা ভাত-কাপড়ের নয়, পরিপূর্ণতার অভাবজনিত এক দুঃখবোধ।

মুগ্ধ দুই চোখে বিবেকানন্দের অবাক বিস্ময়। বললেন, মার্গট, উত্তরীয় দানের গ্রহীতা খুঁজে পেয়েছি। মিসেস সারা বুলকে এই মুহূর্তে আমার বড় দরকার। হয়তো পাশের ঘরে আছেন। চল আমরা সেখানেই যাই।

মিসেস বুলকে ডেকে আনার তর সইল না তাঁর। আত্মদানের আবেগে থর থর করে কাঁপছিল তাঁর ভিতরটা। গেরুয়া রঙের উত্তরীয় দুটি হাতে নিয়ে নিবেদিতাকে হাত ধরে টেনে তুললেন। টানতে টানতে তাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন।

যেতে যেতে নিবেদিতা বলল, আপনাকে একটুও বুঝতে পারি না আমি। কী যে চান আমার কাছে তাও জানি না।

স্বামীজি সহাস্যে বললেন, চলই না। তারপর সব টের পাবে। আগে ভাগে সব কথা কি বলা যায়? বললে তার মজাটাই চলে যায়।

মিসেস বুল তো স্বামীজির কাণ্ড দেখে হতবাক। সকলকে অবাক করে দিয়ে স্বামীজি চটপট দরজায় খিল এঁটে দিলেন। অথচ, সেজন্য তাঁর বিন্দুমাত্র সংকোচ নেই। বরং এক অত্যাশ্চর্য প্রশান্তিতে, আনন্দে তাঁর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দুটি বাহু প্রসারিত করে মার্গট এবং মিসেস বুলকে বুকের খুব কাছে টেনে আবেগকম্পিত গলায় বললেন, তোমরা আমার সন্তান। আমি তোমাদের পিতা। আমি এসেছি,—এই যে আমি তোমাদের মধ্যে আছি এবং থাকব।

নিবেদিতা এবং মিসেস বুল স্বামীজির এহেন অপ্রত্যাশিত আচরণে অভিভূত হল। প্রকৃতপক্ষে, কী যে হতে চলেছে তা একটুও আঁচ করতে পারছিল না তারা। গেরুয়া রঙের উত্তরীয় দুটি খুব যত্ন করে ধীরা মা এবং নিবেদিতার কোমরে জড়িয়ে দিয়ে বললেন, আজ থেকে তোমরা সন্ন্যাসিনী। এই বস্ত্রের গৌরব রক্ষার দায়িত্ব তোমাদের।

আচমকা সব কিছু এত দ্রুত ঘটে গেল যে বিদেশিনী শিষ্যদ্বয় প্রশ্ন করার আগেই অভিভূত হয়ে পড়ল। তাদের জীবনে এ এক সম্পূর্ণ অভিনব এবং অবিশ্বাস্য ঘটনা। নিজের দেশের অনেক শিষ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের মত দুই বিদেশিনীকে স্বামীজি উত্তরীয় দান করলে কেন?

কোন উদ্দেশ্যে স্বামীজি একাজ করলেন নিবেদিতা অনেক ভেবেও তার কারণ খুঁজে পেল না। একে কি স্বামীজির বিদ্রোহ বল্‌বে, না এ কোনো গোপন বিপ্লবের সংকেত? যাঁরা গভীরভাবে সাধক তাঁরা বাণীর মধ্য দিয়ে কাজের মধ্য দিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত আচরণের মধ্য দিয়ে নিরুচ্চারে এমন সব কাণ্ড করে বসেন যে তার তাৎপর্য বোঝা সাধারণের পক্ষে কঠিন হয়। বিদেশিনী শিষ্যাদ্বয়ও কিছু অনুভব করার আগেই গভীর ভাবানুভূতির রসে ভিজে গেল মন। কানের ভেতর মধুর রাগিণীর মত অনুরণিত হতে লাগল, আমি দুঃখকে ভালোবাসি, ভয়ংকরকে ভালোবাসি। অন্য কোন কারণে নয় ওনলি ফর ইটস ওন্ সেক। সত্যমূল্য না দিয়ে জীবনের কোন সম্পদ আহরণ করা যায় না। অপার সংগ্রামই জীবনের পাথেয়। অতএব অবিরাম সংগ্রাম কর। জয়-পরাজয় কোনো কিছুকে ডরাবে না। নির্ভয়ে এগিয়ে যাও। কথাগুলোর ভেতর এমন এক অনাস্বাদিত আনন্দ অনুভব করল যে নিবেদিতার ভেতরটা ভীষণ দীন হয়ে গেল। স্বামীজির পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। ধীরা মা আশ্চর্য-এক গভীর কৃতজ্ঞতার চোখ মেলে চেয়ে রইল স্বামীজির দিকে।

নিবেদিতা ও মিসেস বুলের জন্য আরো একটা নাটক অপেক্ষা করছিল। কিছু বোঝার আগেই স্বামীজি ওদের কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, খুব অবাক লাগছে তাই না। অবাক যে করে তার চেয়ে অনেক বড় দায় যে অবাক হয়। এই অবাক হওয়ার মানেটা নিজেরাই বুঝতে পারবে একদিন। আমি তো একটা মাত্র মানুষ নই; আমি যে অনেকগুলো মানুষ। পুরো আমাকে কেউ কোনোদিন ধরতে পারবে না। কারণ তারা নিজে যা নয় পোশাকে তাই হয়ে উঠতে চায়। সন্ন্যাসী হওয়ার শক্তি যে রাখে তার হাতে দিলাম আমার উত্তরীয়।

কক্ষজুড়ে এক অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছিল। বিবেকানন্দের কথা শুনে দুই বিদেশিনীর গায়ের রোমগুলো সোজা হয়ে উঠল এক মুহূর্তে। শরীরের সব পেশী টান টান হল। এ ধরনের অনুভূতি আগে কখনও হয়নি। বুকের মধ্যে তখন সময় লাফাচ্ছে।

অধীর উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার প্রকাশ কারো নেই। স্বামীজি দুজনের মাথায় হাত রেখে বললেন, নিবেদিতার অনেক স্বপ্ন আছে। পরমহংসদেব একদিন আমাকে যা কিছু দিয়েছিলেন তার সবই তোমায় দিলাম। একটি নারীর কাছ থেকে যা পেয়েছিলাম তা তোমাদের দুজনকে দিলাম—দিলাম নারীকেই। এ নিয়ে যা পার কর। আমি আর নিজেকে বিশ্বাস করি না। কাল যে কী করব ঠিক নেই আমার। হয়তো যা ভেবেছিলাম তা ভণ্ডুল করে ফেলতে পারি। সেরকম কিছু হওয়ার আগেই নারীর শক্তি নারীকে দিলাম। মা তো নারী—তাঁর কাছ থেকে যে শক্তির উত্তরাধিকারিত্ব পেয়েছি, নারীরাই পারে তা ধারণ করতে। নারীরাই তা ধারণ করার যোগ্য। মা, কে বা কী, তা আমি জানি না। তাঁকে দেখিনি কখনও। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখেছেন, এমন কি ছুঁয়েছেন তাঁকে। যেমন করে আমি তোমাদের ছুঁয়ে আছি তেমনি করেই তিনি তাঁর স্পর্শ পেয়েছেন। কে জানে তিনি কেমন? হযতো আমার অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো বিদেহিনী মহাশক্তি। যাইহোক, একদিন যে বোঝা গুরু আমার কাঁধে চাপিয়ে নিজে হাল্কা হয়েছিলেন, আজ সেই বোঝার ভার তোমাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে আমার আমিকে হাল্কা করলাম। আর ক'দিনই বা বাঁচব, এই কটা দিন একটু শান্তিতে থাকতে চাই। আজই সকালে মনে হচ্ছিল পাগল হয়ে যাব। দুপুরে খাওয়ার আগে শুতে গিয়ে কেবলই ভেবেছি, কী করব এ মহাতাপ নিয়ে? মার্গটের হাতে স্কার্ফ দেখে হঠাৎ আইডিয়াটা মাথায় এল। এভাবে নিজেকে অর্পণ করতে পেরে মনটা খুশি হল। যেন মুক্তি পেয়ে গেলাম। এতদিন যে বোঝা বয়েছি আজ তা নামাতে পারলাম। আমার মত সুখী কে আছে?

স্বামীজির কথাগুলো নিবেদিতার মনে মোহ সৃষ্টি করল। বোঝা না বোঝার আলোছায়াময় জগৎটা সব সময় তার ভালো লাগে। কথার মধ্যে এমন একটা রহস্যময় ঘোমটা ছিল যে তার কিছুটা বুঝতে পারল আর কিছুটা পারল না। মনে হলো, তার অন্তরাজ্যে কোথায় যেন কী একটা ঘটে গেছে। পৃথিবীটাই যেন বদলে গেল তার কাছে। সমস্ত চেতনার ভেতর স্বামীজির কথাগুলো আকাশজোড়া বিদ্যুৎলেখার মত চমকিত হতে লাগল। আর ক্ষণে ক্ষণে তার ভিতরটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল। তার অস্তিত্বের স্পর্শ লেগে সারা শরীর যেন গেয়ে উঠল। মনের সমস্ত তারগুলি তাঁরই সুরে বাঁধা। এই পরম মুহূর্তে নিবেদিতা নিজের গভীরে অনুভব করল সর্বব্যাপ্ত সর্বগ্রাসী একটা শক্তির স্পন্দন। মনে হচ্ছিল তার দেহ মন বুদ্ধি চিত্ত কিছুই নেই। মাথার ওপর সন্ন্যাসীর গুরুভার হাতখানার উষ্ণ স্পর্শ হতে শক্তির প্রপাত নামছে। আনন্দের সিঁড়ি বেয়ে বুকের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে যেন তার ধারা। আনন্দসাগরে কখনো সে ভাসছে কখনো ডুবছে। মন আকুলকরা ব্যাকুলতা নিয়ে নিরুচ্চারে বলল, কে তুমি আমার

গুরুর হাতে পরশ পাথর দিয়েছ আমাকে জাগাবে বলে? যদি তেমন কেউ থাকো তবে দিও আমার হাতে অরূপবতন দিও তাঁর। ওগো অন্তরীক্ষের দেবতা, আমায় শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিও না। গুরুর প্রত্যাশা অপূর্ণ রেখে আমাকে রিক্ত করে দিও না। আমাকে তাঁর ব্রত পালনের শক্তি দাও।

তখনি এক বুকভাঙা নিঃশ্বাস পড়ল নিবেদিতার। সহসা ভেতরটা তার কেঁপে উঠল উদ্বেগে উৎকণ্ঠায়। এরকম একটা উদ্বেগ চেপে রেখে সুস্থ থাকা মুশকিল হলো। বলল, স্বামীজি একটা কথা কিছুতে বুঝতে পারছি না। হঠাৎই সেজন্য ভেতরটা আমার অধীর হয়ে উঠেছে। কেবলই মনে হচ্ছে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আপনাকে সর্বস্বসমর্পণ করার পর মাত্র দেড় বছর বেঁচে ছিলেন। এভাবে আপনার নিজেকে সমর্পণ করার মানে কী? আপনার মনের মধ্যে এ কোন ভাব বইছে এখন?

স্বামীজির অধরে কৌতুক হাসি। বললেন, ভালোবাসার ধর্ম হল অকারণ উৎকণ্ঠাবোধ করা। চিরকালের জন্য কেউ পৃথিবীতে আসে না। কাজ শেষ হলে সকলকে চলে যেতে হয়। কেবল সময়ের অপেক্ষা। হয়তো খুব বেশি দিন নয় আর। তবে মাতৃভূমির কোলে মাথা রেখে লম্বা ঘুম দেব একদিন।

নিবেদিতার ভেতরটা সহসা শিউরে উঠল। বলল, জীবনটা আপনার কাছে এত দুর্বিষহ বোধ হচ্ছে কেন? কেন শান্তি পাচ্ছেন না? কী হয়েছে আপনার? ইদানীং মুক্তির জন্য বড় বেশি ছটফট করছেন। মৃত্যুর কথাও বেশি বলেন। ঐ কথাটা বারবার বললে আপনার কি খুব সুখ হয়। আমাদের কত কষ্ট হয় তা একবারও মনে করেন না। যত দিন আছেন রুগ্ণ হয়ে নয়, দিগ্বিজয়ী বীরের মত হেসে-খেলে আনন্দে দিনগুলো যাতে কাটিয়ে যেতে পারেন তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। অন্তত আপনার বেঁচে থাকা পর্যন্ত যদি গুটিকয় জয়ের মালা আপনার পায়ের তলায় এনে দিতে পারি তা হলে কোনো দুঃখ থাকে না। দেবতার কাছে এ আমার প্রার্থনা শুধু নয়, আমার একান্ত দাবি। আপনিও প্রার্থনা করুন যাতে আমার প্রত্যাশা পূরণ হয়।

মিসেস বুল বললেন, মার্গট ঠিক বলেছে। আমরা সবাই প্রার্থনা করব। আদর্শের জন্য সবাই লড়ব। যে যেখানে আছি সেখান থেকে শুধু আপনার সেবাই করে যাব।

নিরুত্তাপ গলায় স্বামীজি বললেন, আমার ছুটি হয়ে গেছে। আর কোনো বাণী নেই আমার। একটু আগে পর্যন্ত ভাবতাম বুঝি আছে, এখন বুঝেছি দুনিয়াকে আমার দেওয়ার কিছু নেই। এখন আমার মধ্যেই সব;—সাধনা বল, সিদ্ধি বল, আত্মদানের আনন্দ বল, এমন কি চরম সত্যের সেই দীপ্তিই বল;—সবই আমার বুকের মাঝে।

নিবেদিতার কথা বলার উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। কর্তব্য সম্পর্কে তাকে সজাগ করার জন্য গুরু বললেন, মার্গট জগতে যারা আদর্শ প্রচার করতে আসে নিজের পথ তাদের

নিজের করে নিতে হয়। মানুষ তাদের কথা শুনবে এবং মানবে এমন আশা করতে নেই। পর্বতপ্রমাণ বাধার সঙ্গে একা যুঝে অভিজ্ঞতার নিরিখে সঠিক পথ তোমাকেই নির্বাচন করতে হবে। পথ একবার খুঁজে পেলে আর ভাবতে হবে না। লোকে নিজে থেকেই আসবে।

বিদ্যুৎচমকের মত হঠাৎই হৃদয়ে বাঁধা পড়ে যাওয়া কথাগুলোর ভাবে নিবেদিতা পুরোপুরি সমাহিত হয়ে গেল। তার সরল নিষ্পাপ, আলোয় ধোয়া মুখখানি স্বামীজির দিকে তুলে ধরল। উদ্ভাসিত ঔজ্জ্বল্যে স্থির হয়ে গেল আঁখিতারা। এই নিঃশব্দ শব্দময়তার সুন্দর রেশটুকু ফুরিয়ে যাওয়ার আগে বিভোর গলায় ডাকল, পিতা।

বিবেকানন্দের একখানা হাত এগিয়ে এসে তার মাথা স্পর্শ করল। ভারি কোমল, ভারি স্নেহময় সে স্পর্শ।

।। চার।।

ভারতীয় নারীর শিক্ষাবিস্তারের জন্য টাকার প্রয়োজন। সেই টাকার ব্যবস্থা করতে আমেরিকার কালিফোর্নিয়া, নিউইয়র্ক, শিকাগো, জ্যাকসন, ডেট্রিয়ট ছাড়াও প্যারিস, নরওয়ে, ব্রিটানিয়া ঘুরল নিবেদিতা। অর্থ সংগ্রহের এই অভিযান নিবেদিতার জীবনে এক নতুন অধ্যায় সূচনা করল। গুরুসঙ্গচ্যুত হয়ে তাঁর উপদেশ, নির্দেশ থেকে বঞ্চিত হয়ে একেবারে একা একা কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিল নিবেদিতা।

বক্তৃতার বিষয় ছিল ভারতবর্ষ—ভারতের ধর্ম, সমাজ, নারীজীবনের আদর্শ, নারীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে যখন যেখানে বক্তৃতা করতে হয়েছে— সে গির্জায় হোক, ঘরোয়া বৈঠকে কিংবা সাধারণ সভায় হোক সর্বত্রই নিবেদিতা আপন বক্তব্যের অনুকূলে একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে চারপাশে ভিড় জমিয়ে তুলত। শিষ্যার কৃতিত্বে খুশি হয়ে স্বামীজি লিখলেন, তোমার সাফল্যে কী যে খুশি হয়েছি তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। লেগে থাকতে পারলে বরাত ফিরবেই।

স্বামীজির কথা ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু বক্তৃতা এবং কাগজে লিখে প্রয়োজন মেটানোর মত টাকা পাওয়া গেল না। অথচ প্রচুর পরিশ্রমে শরীরটা ভেঙে গেল। তাই কেমন একটা ব্যর্থতাজনিত হতাশা তাকে কুরে কুরে খায়। বিশেষ করে স্বামীজির দেবচরিত্রের প্রতি যখন কেউ কিছু বলত কিংবা কটাক্ষ করত তখন সে ভীষণ মুষড়ে পড়ত। মানুষ এত নরাধম হয় কী করে? নিজের মনের সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষ করতে করতে সে ক্লান্ত ও বিমর্ষ হয়ে পড়ত। আর তখনই স্বামীজিকে তার ভীষণ কাছে পেতে ইচ্ছে করত। তাঁর সান্নিধ্যে এলে মনের মধ্যে সব ঝড় থেমে যায়। ওঁর একটু কথা শুনলে মনটা শান্তি পায়। হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাসটা নবীকৃত করে তাকে নতুন প্রাণ দেয়। সেই প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু, সুখের বন্ধু, দুঃখের বন্ধু এবং মমতাময় পিতা তার পাশে নেই এই কথা মনে হলেই হতোদ্যম হয়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে মনে হয় কত কি যেন হারিয়ে গেছে তার। নিজেকে তখন বড় একা লাগে। কিছু মুহূর্ত, কিছু স্মৃতি, কিছু অনুভূতি এমন করে বুকের মধ্যে গেঁথে যায় যে তখন তাঁর পাশে গিয়ে একটু বসার জন্য প্রাণটা আকুলি বিকুলি করে। স্বপ্নে জীবনের যে ছবি এঁকেছিল সেই ছবি হারিয়ে গেলে থাকে শুধু

শূন্যতা। দুঃসহ শূন্যতায় মনটা তখন পাগল পাগল লাগে।

মনের এই সংকট মুহূর্তে মিসেস ওলি বুলের কাছ থেকে নরওয়ে যাওয়ার জন্য অপ্রত্যাশিতভাবে একটা বিশেষ আমন্ত্রণ এল। দু'একদিনের ভেতর স্বামীজিও সেখানে বিশ্রাম নিতে আসবেন। এরকম একটা ঘটনা একসঙ্গে ঘটে যাওয়ার মত কাকতালীয় ব্যাপার নিবেদিতাকে খুব অবাক করল। তবে কি বিশেষ কিছু ঘটার জন্য সময় অপেক্ষা করছে! অথবা কোনো কিছু অসম্ভব ঘটনা ঘটার কি ইঙ্গিত এটা? স্বামীজির মনও কি তার মত তৃষ্ণার্ত? কে জানে? হয়তো মা কালীই সব করছেন অদৃশ্য হাতে ? চিঠিটা হাতে ধরে থাকতে থাকতে মন ভেসে যায় সুদূরে। যেখানে স্বামীজি তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। মাঝখানে শুধু ভৌগোলিক দূরত্ব। কিন্তু মনের যেহেতু কোনো বেড়া নেই, তাই মনের মধ্যে স্বামীজির অস্তিত্বের একটা স্পর্শ লেগেছে। কোন অদৃশ্য হাতে এ সংযোগ সৃষ্টি হল, কে জানে? একটা অদৃশ্য দড়ি দিয়ে গুরুর সঙ্গে কে যেন বেঁধেছে তাকে। এ বাঁধন কেউ কি ছিঁড়তে পারে? নিজের মনেই বলল, পারে না। শ্যামা মা সেজন্য বারংবার বাজিয়ে নিচ্ছে তাকে।

ভৌগোলিক বিচারে নরওয়ে স্ক্যান্ডিনেভিয়া উপদ্বীপের এক ক্ষুদ্রায়তন ও জনবিরল ভূখণ্ড। প্রকৃতির রহস্যময় লীলাভূমি। তিনদিকে অনন্ত নীল মহাসমুদ্র। দিকচক্ররেখায় যেন হারিয়ে গেছে। জলধির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। চতুর্দিকে কত ধরনের গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ এই দেশ। অরণ্যভূমির মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ। নাম না জানা বনজ ফুলের সুগন্ধে সুরভিত। নরওয়ের সবথেকে বড় আকর্ষণ মধ্যরাত্রে সূর্যদেবতার আবির্ভাব। তখন অরণ্যভূমি প্রগাঢ় নির্জনতার মধ্যে নিশীথ সূর্যের দেশটিকে অভিনন্দিত না করে কেউ থাকতে পারে না। আবার তিনমাস দীর্ঘ একটানা রজনীর প্রহরে প্রহরে দূর দিগন্তরেখায় দেখতে পাওয়া যায় আলোর বিচিত্র বর্ণ সমারোহ। ইন্দ্রধনুর রঙে রঙিন এক অপূর্ব মেরুপ্রভা। নিবেদিতার শ্রান্ত দেহ ও ক্লিষ্ট মন নিসর্গের এই অপরূপ রূপ ও রঙেব সাগরে অবগাহন করে পরিতৃপ্ত হল।

কিছুদিনের মধ্যে বিবেকানন্দ এলেন ওলি বুলের গৃহে। গুরু-শিষ্যার মিলন হল। তার চিরচেনা বিবেকানন্দকে কোথাও খুঁজে পেল না তাঁর মধ্যে। এ বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ অন্য। বহুদূরের মানুষ। কী ভীষণ নির্লিপ্ত আর উদাসীন। কোনো কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করে না। সব কিছু থেকে ছুটি নিয়েছেন। জগতের সুখ-দুঃখ তাঁকে বিচলিত করে না। মৃত্যুর মহাপ্রস্তুতির জন্য ধ্যানমগ্ন সে মহাপুরুষ। কারো প্রতি আর তাঁর কোনো দায়িত্ব নেই, আদেশ নেই, নির্দেশ নেই। এখন তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান এবং জপ-তপ হল 'অব শিব পার কর মেরে নেইয়া'— হে শিব আমাকে পার করে নিয়ে চল প্রভু।

একেবারে বদলে গেছেন স্বামীজি। ওঁর কথা শুনলে নিবেদিতার মনটা ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। বুকের ভেতর বড় কষ্ট হয়। তবু এই মানুষটার

রহস্যময় আকর্ষণ তাকে পাগল করে। দু'দুটো দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট প্রাণপণে চেপে ধরে ভিতরকার সব উদ্বেগ দুর্ভাবনা এবং যন্ত্রণার আর্তিকে আটকে রেখে বলল, আপনাকে এভাবে কোনোদিন দেখতে হবে ভাবিনি। স্বামীজি নিবেদিতার দিকে স্থির চোখে অপলক চেয়ে থেকে বলল, আমার জন্য তুমি খুব ভাব তাই না? আয়নায় নিজের মুখখানা যদি ভালো করে দ্যাখ তাহলেই টের পাবে কত অযত্নের চিহ্ন পড়েছে তোমার শ্রীমুখে। চোখের কোণে কালি পড়েছে। কেমন একটা বিষণ্ণ বেদনা তোমার চাউনিকে ক্লান্ত করে তুলেছে। বেশ বুঝতে পারছি, তুমিও ভালো নেই মার্গট।

আমার কথা থাকুক। আপনার ওপর ভীষণ রাগ হয়।

তোমার সব রাগ তো চিরদিন আমার ওপরেই।

কিন্তু সে রাগের তো কোনো দাম নেই।

হাসি হাসি মুখে নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে বিবেকানন্দ বললেন, আমার ওপর সত্যিকারে রাগ করতে পার? ও জিনিসটা তো চিরদিন আমি দেখিয়ে এসেছি তোমার ওপর।

রাগ তার ওপরেই করা যায়, যে রাগের দাম দেয়।

আজ কারো ওপর কোনো অভিযোগ নেই আমার।

সেজন্যে তো কত দুঃখ আমার মনে। মনে মনে মায়ের কাছে বলি যাকে ভালোবাসি তার দুঃখ ঘোচানোর শক্তি আমার নেই। এ জীবনটা যার জন্য ডালি দিতে পারি, তিনি শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিলেন আমাকে।

বোকা মেয়ে। জীবনের বিনিময়ে যাকে ভালোবাসা দিচ্ছ লোহারা শিকলে বেঁধে তার জীবনকে যন্ত্রণাময় এবং দীর্ঘায়িত করতে চাও কেন? বিশ্বের আনন্দ বেদনায় আমার ভাগ নেই। সাক্ষীর মত চেয়ে চেয়ে দেখব শুধু। তাহলে আর কিছুতে জড়িয়ে পড়ব না। মায়ের কাছে সব সঁপে দিয়েছি। মনটা মায়ের জন্য ব্যাকুল হয়েছে। ভারতবর্ষ প্রতিনিয়ত আমাকে ডাকছে। ঐ ডাক শুনে আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। কেবলই মনে হয় এ আমি কোথায় রয়েছি। কোন্ লোভে এখানে আছি?

আপনার এ অভিমান খুবই স্বাভাবিক। কারণ যে মানুষ দেশের মানুষের জন্য শুধু দিল, নিল না কিছুই তারও যে শত্রু হয় ভাবতে পারি না। সব চেয়ে লজ্জার কথা খৃস্টান মিশনারীদের বিদ্বেষ ও কুৎসার ইন্ধন দিচ্ছে ভারতীয়রা। দুর্ভাগ্য তারা সবাই আপনার পরিচিত ও বন্ধুস্থানীয়।

মার্গট, স্বপ্নভঙ্গের নিদারুণ যন্ত্রণা আমার অস্তিত্বের শিকড় ধরে টানছে। মায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার ব্যাকুলতা অনুভব করছি। তারপর কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে কাটানোর পর বললেন, হে রামকৃষ্ণ, আমায় আর কত পরীক্ষা করবে? এবার আমায় তুলে নাও। তোমার পাদপদ্মে জীবনের একমাত্র আশ্রয়। এ শরীর ভেঙে পড়েছে কঠিন

তপস্যায়। একেবারে পতন হওয়ার আগে আমাকে মায়ের কোলে নিয়ে চল।

নিবেদিতা স্বামীজির কোল ঘেঁসে বসে তাঁর গায় হাত রাখল। সারা অঙ্গে মমতাময়ী কন্যার হাতের সুধা-স্নিগ্ধ প্রলেপ দিতে দিতে বলল, অসুস্থ হলেই মনটা মায়ের সেবা পাওয়ার জন্য কাঙাল হয়ে ওঠে। ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা তাই আপনাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। ভারতে গেলে মন যদি শান্ত হয় তবে ভারতেই চলুন। আমিও এখানে হাঁফিয়ে উঠেছি। স্কুলের কী হচ্ছে, কে জানে? কতদিন সারদা মাকে মা বলে ডাকিনি। তাঁর হাতের পরশ পাইনি। আমারও মনটা মায়ের সান্নিধ্যলাভের জন্য চঞ্চল হয়ে আছে। আপনার সঙ্গে আমিও ভারতে ফিরব। একসঙ্গে এসেছি একসঙ্গেই যাব।

তা হয় না মার্গট। এখানে তোমার অনেক কাজ। ভারতের চেয়ে বেশি কাজ করতে পারবে ইংলন্ডে। ভারতে লড়াইয়ের সব ধাক্কাটা কার্যত তোমাকে একা সামলাতে হয়। শুধু শুধু আমার জন্য তোমাকে এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হল। আর কত সইবে? অনেক করলে তবু পারলে কি ওদেশের একজন হতে? ভারতের হয়ে এখানেই কাজ কর। তোমার ভেতর সে তেজ আছে। তুমি কাজ করার মানুষ। কাজ করে যাও।

ভারতবর্ষ আমার কর্মক্ষেত্র। সেখান থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অর্থ আমাকে কাজ করতে না দেওয়া। জেনেশুনেই সে কর্মক্ষেত্র থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখছেন আপনি। ভারতে আমাকে যেতে না দিলে সেটাই হবে আপনার বড় অন্যায়।

মার্গট তুমি ভুল বুঝছ। ভারতে থেকে যে কাজ করতে সেই কাজই ইংলন্ডে বসে ভারতের জন্য করবে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে কোনো কিছু বলার বাধা আর আসবে না, কথা বলার দায় তোমার। প্রাণ ঢেলে শুধু কাজ করে যাও। যে কাজ থেকে আমি স্বেচ্ছায় ছুটি নিয়েছি সে কাজে নিজেকে আর জড়াব না। আমার মধ্যে সেই আগ্নেয়গিরিটা নিভে গেছে। আমার কোনো বাণী নেই, দুনিয়াকে দেবার কিছু নেই। রক্ষা করার ক্ষমতা নেই। আমি শুধু আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ। যা ছিল আমার নিজের তোমাদের দুই নারীকে তা দিয়েছি। তোমরাই আমার ভাবনার রূপকার। তোমরা পারবে আমার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে। কেমন করে তা করবে আমি জানি না। আমি শুধু বলব অন্তরের অন্তস্তলে ডুবে যাও তাহলেই তোমার সব আয়োজন পূর্ণ হবে।

অভিভূত গলায় নিবেদিতা সম্মোহিতের মত বহুকাল পরে ডাকল—রাজা। আত্মমুক্তির পিপাসায় মানুষ যখন শুরু করে উত্তরায়ণের অভিযান, এক আশ্চর্য আশ্বাস জাগে তার অন্তরে। মনে হয় এই তো আমার মধ্যেই সব। সাধনা বলুন, সিদ্ধি বলুন, আত্মদানের আনন্দ বলুন, এমন কি চরম সত্যের সেই দীপ্তি বলুন—সবই তখন বুকের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়। তখন মানুষ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। তাই বাইরের দিকে আপনার আর মন নেই। নিজের মধ্যেই বিভোর হয়ে আছেন। অন্য কারো কথা ভাবার অবসর কোথায়?

মার্গট ! চমকানো মুগ্ধতায় উচ্চারণ করল বিবেকানন্দ। আমি জানতাম আত্ম আবিষ্কারের সাধনায় তুমি উত্তীর্ণ হবে। মা তোমাকে সেই শক্তি দিয়েছে। এমন মরমী অনুভবের কথা কোনো বিদেশিনী বলেনি। আমার সব কিছু অর্পণের ফল ফলেছে। মনে পড়ছে, গুরুর হুঁশিয়ারি। জগতে যারা আদর্শ প্রচার করতে আসে, কোনো মানবসেবামূলক কাজ করতে চায় তারা নিজেরাই নিজেদের পথ করে নেয়। তুমি নিজের পথে নিজের মত চলেছ। আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তুমি লন্ডনে থেকে ভারতবাণী প্রচার কর। লন্ডনে কাজ করার অনেক সুযোগ পাবে। ভারতে বিদেশিনীর ছাপটা কোনোকালে তোমার যাবে না। তোমার পাশে কেউ দাঁড়াবে না। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে না। পদে পদে পর্বতপ্রমাণ বাধার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে তোমার বড় একা মনে হবে। ইংলন্ডে থাকলে তুমি অনেক বেশি কাজ করতে পারবে। তাতে ভরতের লাভ হবে। ইংলন্ডের লোকদের চোখ ফুটলেই ভারত সূর্যোদয়ের মুখ দেখবে।

নিবেদিতার দু'চোখের পাতায় নিবিড় ব্যথা জমে উঠল। নাভিমূল থেকে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সখেদে বলল, আমাকে সঙ্গী না করার জন্য এই অদ্ভুত যুক্তি ফেঁদেছেন। আমাকে নিরুৎসাহ ও নিরাশ করতে আপনার কোনোদিন কথার অভাব হয়নি। ভারত প্রত্যাবর্তনে আপনার সঙ্গী হওয়ার জন্য মনটা যখন আকুল হয়ে আছে তখন নিষ্ঠুরের মত 'না' উচ্চারণ করতে একটুও কষ্ট হল না আপনার! জলভরা চোখে বলল, আমাকে কষ্ট দিলে, দুঃখ দিলে আপনার খুব আনন্দ হয় তাই না?

কৌতুকভরা দুটি উজ্জ্বল চোখ ভরে অনিমেষ তাকিয়েছিল বিবেকানন্দ। নানা শব্দ ও গন্ধর ছিটে চেতনার চারদিকে তারাবাজির মত ছিটকে যাচ্ছিল। রঙিন ফুলকির আলোয় আভাসিত করে যাচ্ছিল কত কিছু। ঘোর কাটিয়ে বলতে খুব ইচ্ছে করল, মুখে না বললেও চোখের ভাষায় অনেক কিছুই ব্যক্ত হয় মার্গট। হয়েছেও, চাওয়া অথবা পাওয়ার মত আর কিছু বাকি আছে কি ?

গাঢ় গভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হল, আমার প্রকৃতিই বোধ হয় অন্যকে যন্ত্রণা দিয়ে আনন্দ পাওয়া। সকলে তো সুখের পিছনে দৌড়চ্ছে। তুমি তো তাদের দলে নও আঘাতের মধ্যেও একটা লুকোনো আনন্দ আছে। ব্যথাকে আনন্দ করার ভার তোমার হাতে। বাইরের একটু আঘাতে যে নেতিয়ে পড়ে রম্যতার স্বাদ সে পাবে কোথা থেকে ? মনের আলোয় আভাসিত না হলে আনন্দ বীজের মতই সুপ্ত থাকে। ফুল হয়ে ফোটে না। কথাগুলো বলার সময় বিবেকানন্দের চোখের পাতা কেঁপে গেল। মুখের ভাব বদলে গেল। দৃশ্যটা নিবেদিতার চোখ এড়াল না।

হঠাৎ এক গভীর দুঃখের সঙ্গে মিশে গিয়ে নিবেদিতার শ্বাস পড়ল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আমার মত দুঃখী আর কেউ নেই। আমার শূন্যতা শুধু মনে হয় চারধারে। কথাগুলো বলতে নিবেদিতার বুক ভেঙে গেল। গলার কাছে কী যেন একটা

দলা পাকিয়ে উঠল। আর তাতেই তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হল।

নিবেদিতার কপালে ঝুলে পড়া চুলগুলো আঙুল দিয়ে সরিয়ে মাথায় হাত রাখল বিবেকানন্দ—শিষ্যাকে আশীর্বাদ করার জন্য নয়, তার অন্তরের সব শূন্যতা যন্ত্রণা ও ব্যথাকে নিঃশেষে শুষে নেবার জন্য।

গুরু-শিষ্যার নিবিড় সান্নিধ্যের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্তটা একসময় ফুরিয়ে যায়। শেষ হওয়ার আগের মুহূর্তে নিবেদিতা চিত্তের গভীরে অনুভব করল সর্বব্যাপ্ত, সর্বব্যাপী এক শক্তির স্পন্দন। সেইক্ষণে মনে হল, তার দেহ মন চিত্তবুদ্ধি কিছুই নেই। মাথার ওপর সন্ন্যাসীর হাতের উষ্ণ স্পর্শ যেন শক্তির নির্ঝর হয়ে শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত হতে লাগল। আর সে একটু একটু করে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল। সমস্ত স্নায়ুর মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছিল কী-এক গভীর বোধ। একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ খেলে গেল। সম্মোহিতের মত স্বগতোক্তি করল—আমি স্বামীজির সন্তান, মায়ের সন্তান। জগতে আমার একটিমাত্র কামনা সন্ন্যাসীর জীবন যাপন। আমার ভবিষ্যৎ জীবন কঠোর কিংবা ভয়াবহ হলে কী আসে যায়? আমার ভয়ই বা কি? আমি মায়ের সন্তান। তিনিই যন্ত্রী, তিনিই পরমগতি।

নরওয়ের দীর্ঘশীর্ষ তপোমগ্ন দেবদারু বৃক্ষশ্রেণীর অনুপম সৌন্দর্যের মধ্যিখানে বসে থাকলে হিমালয় ভ্রমণের দিনগুলোর কথা খুব বেশি মনে পড়ে নিবেদিতার। হিমালয়ের শান্ত নির্জন, ধ্যানমৌন পাহাড়ের চূড়ায় বসে চরম সত্যের সাধনা করেছেন ভারতের মুনি-ঋষিরা। মুক্তিপিয়াসী সন্ন্যাসীরা ত্যাগের বৈভবে শুধু সুন্দর নয়। সর্বরিক্ত হয়েও অন্তরে পরিপূর্ণতায় মহা ঐশ্বর্যশালী ছিল। সেদিন তারা লাভ করেছিল আনন্দ, পান করেছিল অমৃত, আয়ত্ত করেছিল নির্বাণ। কিন্তু টুডে হার গিফটস্ আর ডিক্রায়েড বাই অল্ মেন্। ফর্ টুডে দি মাইটি মাদার ইজ উইডোড অ্যান্ড অ্যাবেস্‌ড্। সি হু হ্যাড্ হেলড ওপেন পোর্ট-টু অল্ ফিউজিটিভস্ ইজ আনেবেল নাউ টু গিভ্ ব্রেড টু হার ওন চিলড্রেন। এজন্য অন্য কেউ নয়, ভারতীয়রাই দায়ী। তাদের ঔদাসীন্যের রন্ধ্রপথ ধরে এক মহা সর্বনাশ প্রবেশ করেছে জাতীয় জীবনে। আত্ম সচেতনতার অভাবে সর্বরিক্ত হয়েছে তারা। নিজের অধিকার পর্যন্ত তারা বোঝে না। কেউ যদি অধিকার ছিনিয়ে নেয় তবু প্রতিরোধ কিংবা প্রতিবাদ পর্যন্ত করবে না। এমনই নির্লিপ্ত এবং উদাসীন তারা। প্রাত্যহিক জীবনে কী হারাল, আর কী পেল না তার অঙ্ক কষে দেখ না কখনও। তার স্বভাবে সংগ্রামবিমুখতা ও পরনির্ভরশীলতা বড় বেশি। এই দোষে দস্যুরা লুণ্ঠন করল তাদের সর্বস্ব, তাদের ঘর ভেঙে দিল, আশ্রয় কেড়ে নিল, ক্রীতদাসে পরিণত করল। তবু সহিষ্ণুতার বরফ ক্রোধে গলে জল হল না। দেশের জলবায়ু বোধহয় সেজন্য দায়ী।

বিপুল আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করে বলেই হয়তো এই শূন্যতা তাদের চঞ্চল করে না। অথবা, নিজের জন্মভূমিকে সঠিক চেনে না বলেই পরাভবের আত্মগ্লানি নেই। পরাধীনতার হীনতা তাকে স্বাধিকার অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে না। নিজের অধিকার ভুলে এমন নির্লিপ্তভাবে জীবনযাপন পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের অধিবাসী করে কি না নিবেদিতার জানা নেই। যতকাল ভারতীয়রা তাদের অধিকার ভুলে থাকবে ততকাল স্বাধীন হওয়ার চেষ্টায় নড়ে চড়ে বসবে না। পরনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকার অভ্যাস যতদিন ত্যাগ না করবে ততদিন পরাধীনতার অভিশাপ থেকে নিজেকে ও জাতিকে মুক্ত করার উদ্যোগ তাকে অনুপ্রাণিত করবে না। বাইরের কোনো শক্তি কিংবা মানুষ এসে তাকে স্বাধীন করে দিতে পারবে না। স্বাধীনতার যে একটা বিশেষ মূল্য আছে মানুষের জীবনে এবোধটাই ভারতীয়দের নেই। সেজন্য রাজশক্তির সহযোগী এজেন্ট হয়ে কাজ করতে ভারতীয়রা কোনো কুণ্ঠা বোধ করে না।

এইসব নিগূঢ় চিন্তার মুহূর্তগুলিতে নিবেদিতার ধ্যানে বিবেকানন্দ সর্বব্যাপ্ত হয়ে থাকত। তাঁর অবয়ব, তাঁর কণ্ঠ ও স্বপ্ন সব যেন একসঙ্গে শরীরী হয়ে তার সম্মুখে উপস্থিত হত। ওঁর সঙ্গে সাধারণ ভারতীয়দের তুলনা করা মানে এক কঠিন মর্মযাতনা ভোগ করা। এ কারণেই হয়তো স্বামীজি রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার অর্জন থেকে সরে আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন হয়েছেন। নিবেদিতা তাই নিজের কাছে নিজেই প্রশ্ন করল কেন এমনটি হল? কোন্ মহাপাপের রন্ধ্রপথ ধরে ভারতের ভাগ্যে এমন ভয়াবহ অধোগতি এল?

ব্রিটানিয়া থেকে যাওয়ার একদিন আগে নানা অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক কথা মাথার ভেতর তার ভিড় করছিল। নানা ঘটনা ও কথার টুকরো চেতনার চারদিকে তারাবাজির থেকে উৎক্ষিপ্ত কণার মত ছুটে যাচ্ছে। সোফায় বসে জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছিল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের চঞ্চলতা। মনে হচ্ছিল, পায়ে ঝুমঝুম করে মল বাজিয়ে দৌড়ে আসছে এক ঝাঁক কিশোরী। পুঞ্জীভূত ফেনরাশি যেন ওড়না হয়ে তটভূমিকে ঢেকে দিচ্ছিল। কতক্ষণ এভাবে তন্ময় হয়ে বসেছিল জানা নেই নিবেদিতার। স্বামীজির ডাকে তার চমক ভাঙল।

স্বামীজি দ্বিধাভরা দুটি চোখ মেলে নিবেদিতার দিকে তাকাল কিছু বলার জন্য। বলি বলি করে বলল অবশেষে। মার্গট কাল তোমার যাত্রার দিন।

নিবেদিতা ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল, এই বোধহয় হওয়ার ছিল। ভবিতব্য একেই বলে। এক চাইলাম, আর এক পেলাম। সত্যিই, আমি নির্বোধ। আগাছার জঙ্গলে দম আটকে আসছে তবু মন থেকে তা উপড়ে ফেলতে পারছি না। অথচ, আপনি নিজেকে মুক্ত করে কত সুখে আছেন।

বিবেকানন্দের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। বিবেকানন্দ নিজের হস্তরেখার দিকে

কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে বললেন, জীবনের গভীরে গভীরে কত কী রহস্যময় আছে। সুখের সংসার ছেড়ে মানুষ যখন ঈশ্বর সন্ধানে যায় তখন বুঝতে হবে সুখের ধরণী সকলের একরকম নয়। একেকজনের একেরকম। সে যাই হোক, যাত্রার আগে তোমাকে একটা কথা বলব বলেই ডেকেছিলাম। তোমার মনে কোনো আক্ষেপ জমিয়ে রেখ না।

নিবেদিতা চোখ বুজে একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে বলল, আমার গুরু, আমার রাজা, আমার পিতার কাছে যাত্রার আগে আশীর্বাদ নিতে এসেছিলাম। আপনার নির্দেশ আমি মেনে নিয়েছি। একদিন আমার মনে যে উৎসাহের আগুন জ্বালিয়েছিলেন তার শেষ কণাটি নিবে না যাওয়া পর্যন্ত আমি ইউরোপে থেকে কাজ করব। কথা বলার সময় আপনা থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। সেই সঙ্গে গলা কেঁপে গেল। অজান্তে চোখের কোণ ভরে গেল জলে।

বিবেকানন্দের পা ছুঁল নিবেদিতা। কয়েকটা মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে স্বামীজি বললেন, জান মার্গট, আমার গুরু বলতেন, আকাশের অনেক নক্ষত্রের মধ্যে সূর্যও এক নক্ষত্র। কিন্তু সূর্যের পাশে অন্য নক্ষত্রদের অস্তিত্বটুকু পর্যন্ত চোখে পড়ে না। তেমনি প্রবল প্রতিপত্তিশালী পিতা কিংবা গুরুর পাশে তাদের সন্তান ও শিষ্যরা নিজের যোগ্যতা সত্ত্বেও নিজের মত গড়ে উঠতে পারে না। তাদের যে স্বকীয় মান-মর্যাদা আছে, যোগ্যতা আছে কেউ তা স্বীকার করে না। তাই সব কিছু থেকে আমি মুক্তি চেয়ে নিয়েছি। আমিও বিশ্বাস করি শক্তিধর পুরুষের উচিত কর্মী তৈরি করে দূরে সরে যাওয়া। কারণ তিনি কাছে থাকলে তারা পুরোপুরি স্বাধীন হতে পারে না। তাদের যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব নজর কাড়ে না। এজন্যই আমি তোমার কেউ নই।

স্বামীজি থামল। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা নিয়ে নিবেদিতা গুরুর কথা শুনছিল। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বিবেকানন্দ বললেন, আমার যা শক্তি ছিল তা তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। আমি এখন শুধু সন্ন্যাসী। তোমাকে অদৃষ্টের হাতে সমর্পণ করেছি। এক সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধ মুসলমান আছে যারা নবজাতকের ভাগ্য স্থির করার জন্য জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাকে রাস্তায় ফেলে রেখে বলে, আল্লা যদি তোকে পয়দা করে থাকেন তো মর, আর আলি যদি তোকে সৃষ্টি করে থাকেন তো বাঁচ। সেই ফ্যানাটিক মুসলমানেরা তাদের সদ্যোজাত শিশুর উদ্দেশে যে কথা বলে থাকে আজ এই নিস্তব্ধ রাত্রিতে সে কথাটি তোমায় উল্টোভাবে বলছি, গো ফোরথ ইনটু দি ওয়ার্ল্ড, এন্ড দেয়ার, ইফ আই মেড ইউ, বি ডেস্ট্রয়েড! মাই মাদার মেড্ ইউ লিভ্! —যাও জগতের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়। আমি যদি তোমায় গড়ে থাকি তুমি বিনষ্ট হবে, আর বিশ্বজননী মহামায়া স্বয়ং যদি তোমায় সৃষ্টি করে থাকেন তবে তুমি চির আয়ুস্মতী হও, দীর্ঘকাল বেঁচে থাক।

কথাগুলো বলে স্বামীজি আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালেন না। ধীরে ধীরে ঘর

থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরের দিন ভোরে নিবেদিতা ইংলন্ডের উদ্দেশে যাত্রা করল। স্টেশনে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ঘোড়ায় টানা একটা টাঙা আগেই ঠিক করা ছিল। তাকে নিয়ে হন্ হন করে গাড়ি ছুটল গ্রামের পথ ধরে। কনকনে হাওয়ায় নিবেদিতার শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছিল। গায়ের চাদরটা দু'হাতে চেপে ধরে গাঁয়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে যাচ্ছিল। রিজলিম্যানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেল ঐ কাকভোরে পথের পাশে প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন স্বামীজি। উত্তোলিত দু'হাত দিয়ে নিবেদিতাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। আর নিবেদিতা কর জোড় করে মনে মনে বলল, আমি চললাম। গুরু আমার, রাজা আমার। তোমার জয় হোক। তোমার মহিমার তোমার করুণার পারাপার দেখি না দেবতা। মনে হচ্ছে তুমি নও, তোমার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ যেন হাত রেখেছেন আমার মাথায়।●

।। পাঁচ ।।

অবশেষে মোম্বাসা জাহাজে ইংলন্ডে ফিরল নিবেদিতা। জীবনের বেশিরভাগ সময়টা এখানে কাটলেও চিরচেনা ইংলন্ডকে নতুন লাগল। নিজেকেও তার আগন্তুক মনে হল। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হয়ে থাকলেও বড় একা লাগে তার। কী একটা অতৃপ্তিতে মনটা ছেয়ে থাকে। শান্তি জিনিসটা বোধহয় তার কপালে লেখা নেই। তবু মনের শান্তিটুকু পাওয়ার জন্য নিজের সঙ্গে কত আপোষ করল। তবু বিবেকানন্দকে তার একান্ত করে পাওয়া হল না। তাঁর কাছে চিরদিনই দূরের মানুষ হয়ে রইল। এ নিয়ে নিবেদিতা অনুযোগ করতে ছাড়েনি। হৃদয়ভরা জিজ্ঞাসা নিয়ে স্বামীজিকে আকুল কণ্ঠে বলেছে, হৃদয় দেবতাকে একান্ত নিজের করে পাওয়ার জন্য একজন মানুষ যদি তার চারপাশের পৃথিবীর মানুষজনকে নির্দয়ভাবে ত্যাগ করতে পারে তাহলে ঐ হৃদয় দেবতা তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকল কেন? কী করেছিল নিবেদিতা? যার জন্য এতবড় আত্মবলি দিল, সে কেন প্রসন্ন হল না তার প্রতি ? ভারাক্রান্ত গলায় কথা গিলে গিলে বলল, এই যে আমি, গুরুর জন্য সব ছেড়ে তো এসেছি, তবু গুরু কি আমার কোনো কথা বিবেচনা করলেন? আমার দিকে ফিরে তাকালেন? কিংবা আমার মত করে তাঁকে পেলাম।

সেই মুহূর্তে চমকে ওর দিকে তিরস্কার ভরা চোখে তাকিয়ে রইলেন বিবেকানন্দ। বললেন, স্বার্থপরের মত কথা বললে। গুরু কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যে, চাইলেই পাওয়া যায় তাঁকে। নিজের সঙ্গে অনেক লড়াই করেছ তুমি। বিভিন্নভাবের সঙ্গে সংঘাত করতে গিয়ে ছিন্নভিন্ন করেছ নিজেকে। সেজন্য ভেতরে ভেতরে ত্যাগের অহংকার জমেছে। এ পর্যন্ত তুমি যা করেছ তাতে শুধু বাইরের খোলসটা ছেড়েছ। রক্তে আইরিশ জাতির গর্ব, অহংকার, স্পর্শকাতরতা, নিদারুণ অভিমান, প্রখর আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ, নারীজাতির আত্মকেন্দ্রিক আত্মসুখের এষণা তোমার মধ্যে প্রবলভাবে আছে। তাই তোমার সব ছেড়ে আসার কোনো মূল্য নেই। এসব ত্যাগ করার কথা মনে হলে দুঃখে তোমার চোখে বন্যা বয়ে যায়। ব্রজগোপীদের মত কুলশীলমান, লজ্জা, অভিমান ত্যাগ করে আসনি বলেই দ্বিধা-সংশয়ে, মান-অভিমানে মনেতে কষ্ট পাচ্ছ। এসব বোধরহিত হলে মা নিজেই সস্নেহে কোলে টেনে নেবেন তোমায়। মা তখন সর্বস্ব

হবে তোমার। এটা জোর করে পাওয়ার নয়, পরাণুকরণ করেও পাওয়া যায় না। আরাধনার হাত ধরেই মায়ের মন্দিরের গর্ভগৃহে পৌঁছে যাবে।

ওঁর কণ্ঠনিঃসৃত বাণীর মধ্যে এমন একটা হৃদয়হরণ চমৎকারিত্ব ছিল যে কথা হারিয়ে গেল। নিবেদিতার মুখে সহসা কথা যোগাল না। বরং একটা অপরাধবোধে বুকটা তার কেমন করতে থাকে। তখন খুব ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে ওঁর পায়ে পড়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেয়। কিন্তু কিসের একটা অদৃশ্য টানে মেঝের সঙ্গে বাঁধা থাকে পা দু'খানি। মেয়েলি অভিমান নিয়ে বলল, জানি, কোনোদিন আমাকে বোঝার চেষ্টা করেননি আপনি। কোনোদিন আপনার মনের তল পেলাম না। ধরাছোঁয়ার বাইরে ভগবানের এক আশ্চর্য সৃষ্টি আপনি।

বিবেকানন্দের অধরে জীবনরহস্য বোঝার কৌতুক হাসি।

ইংলন্ডে বিবেকানন্দকে বড় বেশি করে মনে পড়ে। স্বামীজির শরীর সম্পর্কে তার উদ্বেগের অন্ত নেই। মাঝে মাঝে তাঁর শরীর খারাপ হয়ে পড়ে। তখন নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকে না। হাঁপানি ও ডায়েবেটিসে স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। আগের শ্রী নেই। দু'চোখের কোণে রোগের ক্লান্তি। গায়ের মাংস ঢিলে হয়ে গেছে। চামড়া খসখসে হয়ে গেছে। পা দুটো সব সময় ফোলা ফোলা, চোখের দৃষ্টিশক্তি প্রায় ক্ষীণ হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে স্বামীজির শরীর একটুও ভালো নেই। ঐ অবস্থায় লেখা-পড়ার কাজ করে যাচ্ছেন। কারো কোনো কথা শোনেন না। কেবল সে একটু বকাঝকা করলে সুবোধ বালকের মত কাজকর্ম বন্ধ রাখেন। কিন্তু কাছে না থাকার জন্য সেটুকু করা হয় না। এই জন্য নিবেদিতা শান্তিতে নেই। স্বামীজির কথা বেশি ভাবলে তার দুচোখ জলে ভরে যায়। মনটা অস্থির হয়। ইংলন্ডের দিনগুলো তখন দুর্বিষহ লাগে। রাগ হয় রাজার ওপর। শাস্তি দেওয়ার জন্যই তাকে ইংলন্ডে নির্বাসন দিল। রাজার কাছে কী দোষ করেছিল, কে জানে?

ইংলন্ডবাস নিবেদিতার কাছে যন্ত্রণাকর হয়ে উঠল। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় সময়ের অপব্যয় করছে। জীবনের মূল্যবান সময়গুলো এভাবে চোখের ওপর নষ্ট হতে দেখলে নিবেদিতার কান্না পায়। ইংলন্ডে থেকে ভারতের জন্য সত্যি যে কিছু করা সম্ভব নয় এই বাস্তব সত্যটা রাজা বুঝল না, কেন? কী করে ভাবল, নিবেদিতা ইংলন্ডে থাকলে ভারতের জন্য বেশি কাজ করতে পারবে? কাজের জন্য বেশি সময় হয়তো দিতে পারে। কিন্তু সেটা কতটা ফলপ্রসূ হবে তা তাঁর জানা নেই। জীবনের অনেক উদ্যোগই মনের খেয়ালে অপচয় হয়। এই বাস্তব সত্যটা জেনেও স্বামীজির মুখের ওপর সে না বলতে পারল না। পাছে স্বামীজি নিরাশ হন তাই সম্মতি দিল তাঁকে। কিন্তু সে যে পরে আত্মদহনের কারণ হতে পারে একবারও মনে হয়নি। মনের সঙ্গে তাই অহরহ যুঝতে হচ্ছে তাকে। ভয়ানক ক্লান্ত লাগে। কুসুমাগন্ধী ক্লান্তির মধ্যেও বোধহয় একধরনের রম্যতা আছে। মনকে সব কিছু থেকে আলাদা করে নিয়ে গভীর করে ভাবা যায়।

হঠাৎই নিবেদিতার মনে হল স্বামীজি যাদু করেছিল তাকে। সত্যি কি তাই? নিজে থেকে যাদু হতে রাজি না থাকলে কেউ যে যাদু করবে তাকে এমনটি হবার জো নেই। বোধহয় যাদুতে স্বেচ্ছায় সম্মোহিত হওয়ার ব্যাপারটাও গোলমেলে।

স্বামীজির কথায় ইংলন্ডে থাকতে রাজি হওয়ার মধ্যে অন্য একটা বোধ কাজ করছিল। প্রিয় মানুষ বিশ্বাস করে যখন কিছু দাবি করে তখন তার ডাকে সাড়া দিতে মন আকুল হয়ে থাকে। এ ধরনের উন্মুখ আত্মসমর্পণের মধ্যে ভালোবাসার অহংবোধটা খুব সূক্ষ্ম হয়ে জেগে থাকে। তার একটু ত্যাগ যদি গুরুকে সাফল্যের জয়মাল্য উপহার দিতে পারে তাহলে তার চেয়ে বড় সুখ নেই। কথাগুলো নিবেদিতাকে চমকে দিল। খুব আশ্চর্য লাগল, যাকে সে ভেবেছিল অনাসক্তি আসলে, তা সুপ্ত আসক্তি ছাড়া কিছু নয়। গুরুর মুখ চেয়ে এবং তাঁকে সুখী করতেই ইংলন্ডে থাকতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু তাঁর প্রত্যাশাকে জয়যুক্ত করার জন্য যে তপস্যার দরকার সে ধৈর্য তার কোথায়? থাকবে কোথা থেকে ? প্রাণটা যে তার ভারতের জন্য উথাল-পাথাল করছিল।

ইংলন্ডে প্রায় একবছর আছে সে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়টা ভারতের জন্য কী করল। মার্গট চেষ্টা করেও উল্লেখ করার মত কাজের নাম মনে করতে পারল না। তা হলে, এখানে থাকার প্রয়োজনটা কী? বহু কাঠখড় পুড়িয়ে বড়জোর একটা বেদান্ত চর্চার কেন্দ্র তৈরি করতে পারে। তাতে ভারতের অধ্যাত্মচিন্তা সম্পর্কে ইংলন্ডবাসীর মনে একটা ভাবাবেগ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু তাতে ভারতের কী? ভারতের অশিক্ষা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা, ধর্মীয় সংকীর্ণতা, জাতপাতের বিভেদ, বিদ্বেষ কতটুকু অবসান হবে? জাতিগত অধঃপতনের গ্লানি কিংবা পরাধীনতা জনিত অপূর্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইংলন্ডে থেকে কতখানি করতে পারবে? ভারতের বিবিধ সমস্যার প্রকৃতরূপ স্বচক্ষে না দেখে শুধু বক্তৃতা শুনে ইংরেজরা তার প্রতিকারের জন্য স্বেচ্ছায় ভারতবাসীর পাশে দাঁড়াতে যাবে কেন? অন্যের দয়া, কৃপা, অনুগ্রহে যারা বাঁচতে চায় তারা জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করতে পারবে না। স্বাধীনতা কিংবা সংস্কারের কাজ অন্য দেশ থেকে আমদানি করা বস্তু নয়। দেশের মাটিতে তার বীজ বপন করতে হয়। স্বামীজি সে সব জেনেও ভারত থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখল। অথচ, ভারতবর্ষে থাকলে স্বামীজির আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার কাজটা হাতেকলমে করে দেখাতে পারত। প্রয়োজনের তুলনায় তা ক্ষুদ্র কিংবা সামান্য হলেও অনুর্বর মাটিতে বিপ্লব-বিদ্রোহের বীজ বপন করে তার চারাগাছটি অঙ্কুরিত তো করতে পারত। চিত্ত জাগরণের একটা পরিবেশ তো তৈরি হত। এক বছরের বেশি সময় ইংলন্ডে থেকে সে শুধু স্বামীজির মনের খেয়ালকে প্রশ্রয় দিয়েছে। কাজের কাজ হয়নি কিছু। যতদিন যেতে লাগল তার মনে এই ধারণাই দৃঢ়তর হল যে ইংলন্ডে বসে একটা ঘুমন্ত জাতের ঘুম ভাঙানো যাবে না। ঘুমের ঘোর কাটিয়ে কাজের ভেতর টেনে এনে তাকে কর্মে ব্রতী করার কঠিন কাজটি কেবল ভারতের মাটিতে বসে করা সম্ভব। এত বুঝেও

নিজের ইচ্ছেতে নিবেদিতা ইংলন্ড ছাড়তে পারল না। রাজার নির্দেশ ছাড়া ভারতে গেলে গুরুকে অমর্যাদা করা হয়, নিজের কাছেই রাজাকে ছোট করা হয়। জীবন থাকতে সে তা পারবে না।

এমনি করে কতদিন একঘেয়ে কেটে গেল। যত দিন যেতে লাগল নিবেদিতার ভেতরটা অশান্ত হল। মনটা প্রশ্নে প্রশ্নে তোলপাড় হল। প্রবোধ দেওয়ার জন্য নিজেকে বোঝাত, স্বামীজি যে তাকে ছেড়ে চলে গেছেন এটা পাওনা ছিল তার। স্বামীজির মধ্যেকার মানুষটিকে স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করার যোগ্যতা বা প্রস্তুতি হয়তো তার ছিল না। অথবা, যে উদ্দেশ্যে স্বামীজি তাকে ইংলন্ডে রাখল তার তাৎপর্যটাই হয়তো সে ধরতে পারেনি বলে ইংলন্ডে থাকাটা তার নিরর্থক মনে হয়। সময়ের অপব্যয় তাকে অধৈর্য করল। তবু ইংলন্ড ছেড়ে ভারতে যেতে তার পা উঠল না। এই বাধাটা যে তার মনে কত ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী তা গভীর করে টের পায়। অথচ মানুষ তৈরির সংকল্প নিয়ে স্বামীজি যে কাজের সূচনা করেছিল তাতে তারও একটা ভূমিকা ছিল। সেখান থেকে কেন তাকে দূরে সরিয়ে রাখলেন এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর খুঁজে পেল না নিবেদিতা। যত দিন যায় ভেতরটা তার নানাবিধ জিজ্ঞাসায় আর্ত হয়। কাজকর্মে মন লাগে না। বলতে কি, এই অশান্ত, অস্থির মনের শান্তি খুঁজতে সে নরওয়েতে মিসেস সারা বুলের গৃহে অতিথি হল।

মিসেস বুল সে সময় গৃহে ছিলেন না। বাড়ির কাজের লোকেরা নিবেদিতাকে চিনত। সুতরাং তার কোনো অসুবিধে হলো না। মিসেস বুল যখন গৃহে ফিরল তখন বিকেল হয়ে গেছে। বাইরের জামা-কাপড় বদলে হাত-পা ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হতে যেটুকু সময় লাগল তারপরে নিবেদিতার কাছে এল। ইজিচেয়ারে দেহটা এলিয়ে দিয়ে একটা চৌকির ওপর পা রেখে আধশোয়া হয়ে নিবেদিতা স্বামীজির 'রাজযোগ' পড়ছিল। মিসেস বুল নিঃশব্দে একটা চেয়ার নিয়ে তার পাশে বসল। নিবেদিতা পা দুটি তৎক্ষণাৎ নামিয়ে সোজা হয়ে বসল। মিসেস বুল শান্ত-স্নিগ্ধ দুটি চোখ তার চোখের ওপর মেলে ধরল। জননীর মত ওর গায়ে হাত রেখে বলল, এ কী চেহারা হয়েছে। মনে হচ্ছে তোমার ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ভেতরটা এখনও অশান্ত। মার সঙ্গে ঝগড়া করনি তো। স্বামীজি কুশলে আছেন তো!

মনের ক্ষোভটাকে চট করে লুকিয়ে ফেলে নিবেদিতা বলল, স্বামীজির কোন্ খবরটা কোন্দিন আমি জানি? কোনোদিন আমাকে বলে কিছু করেছেন? আমার সঙ্গে পরামর্শ করেছেন কখনও? তোমাদের কাছ থেকে যা জানতে পাই তাকেই আমার করে নিই। অথচ, ওঁর কথা শোনার জন্য কত আকুল হয়ে থাকি। এটাই আমার দুঃখ যে নিজে থেকে আমাকে বুঝতে চাইলেন না। তবু সব রাগ-অভিমান ভুলে ভাবি ভগবান পাখির মত আমাকে ডানা দিল না কেন?

মিসেস বুল একগাল হেসে বললেন, ডানা দিলে মানুষ আকাশবিহারী দেবতার কর্তৃত্ব কেড়ে নিত তাহলে।

মানুষের জ্ঞানের খিদে আবিষ্কারের নেশা একদিন পাখির মত তাকে আকাশে উড়তে সাহায্য করবে। বোধ হয় সে দিন খুব বেশি দেরি নেই।

মিসেস বুল বললেন, আমেরিকা, প্যারিস, ইংলন্ডে তোমার বক্তব্য যে সমাদর লাভ করবে সে আমি জানতাম। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। যতটা অর্থ আশা করেছিলে ততটা পাওনি।

নিজের সমস্যার কথা নিবেদিতা নিজের মনেই রাখল। মিসেস বুলের ক্লান্তিকর আলোচনা শুনতে তার একটুও ভালো লাগল না। অস্বস্তিতে বই-এর পাতাগুলো আনমনে ওল্টাচ্ছিল আর বন্ধ করছিল। ধীরা মা ওর অন্যমনস্কতার দিকে তাকিয়ে বলল, স্বামীজি বলতেন, সমস্যা ছাড়া জীবন হয় না। এও এক ঈশ্বরের লীলা। এই লীলা রসাস্বাদন ছাড়া কর্মের গৌরব ও মহিমা জানবে কেমন করে। স্বামীজি তো সব সময় বলতেন জগতে যারা আদর্শ ও বাণী প্রচার করতে আসে, তাদের পথ কণ্টকাকীর্ণ। পথের কাঁটা সরিয়ে নিজের পথ নিজেকে করে নিতে হয়। মানুষ তাদের কথা শুনবে, মানবে এরকম কোনো অভিমানও মনে রাখতে নেই। এই অভিজ্ঞতা পুরোপুরি না হওয়া পর্যন্ত মনের যন্ত্রণা ঘুচবে না। এও এক ধরনের সাধন পদ্ধতি।

নিবেদিতার দিশাহারা মনের ভেতর হঠাৎ দপ করে আলো জ্বলে উঠল। আর তাতেই সব ক্ষোভ অভিযোগ, অভিমান দূর হয়ে গেল। মন আলো করা প্রসন্নতায় তার বিষণ্ণ মুখখানা দীপ্ত হয়ে উঠল। তার নিজের কথা বলার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। একটু ইতস্তত করে বলল, দিশারী হিসেবে নিজের চেয়ে তোমার ওপর আমার ভরসা বেশি। রাজা তোমার বাধ্য ছেলে। তুমি কিছু বললে 'না' বলে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। বলতে কি আমার কর্মক্ষেত্র ভারত। সেখানে কাজ করতেই আমি আনন্দ পাই। দুর্ভাগ্য, আমার জায়গা থেকে সরে থাকার জন্য কিছুই করতে পারি না। তোমাদের মত আমি বোধহয় স্বাধীন নই। একটা বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছি। এ জীবনে বোধ হয় তার থেকে মুক্ত হতে পারব না। স্বামীজি আমাকে সর্বতোভাবে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু আমি তো মুক্ত হতে পারলাম না। তাঁর ডাক অন্তরে না এসে পৌঁছলে আমার বাধা ঘোচে না। ধীরা মা তুমি একবার আমার কথা বল তাঁকে। এমন কতকগুলি ঘটনায় আমি জড়িয়ে গেছি যে স্বামীজি তা অনুমোদন করতেন না। তাই তোমার শরণাপন্ন হয়েছি। ম্যাকলাউডকে আমি ভারতে ফিরে যাওয়ার কথা লিখেছি। রাজার অনুমতি ছাড়া ইংলন্ড ছাড়তে পারছি না। এ যে আমার গুরুর আদেশ। তিনি ফিরিয়ে না নিলে আমি ফিরতে পারি না।

মিসেস বুল বললেন, তোমার ভারত প্রত্যাবর্তনের রাস্তা যে আমি করতে পারি এরকম বিশ্বাস তোমার হল কেন?

তোমার 'পরে তাঁর বেশি ভরসার কথা কারো অজানা নয়। বহুবারই অকপটে বলেছেন, তোমার ভিতর দিয়ে মা তাঁকে পথ দেখাচ্ছেন।

কিন্তু—

আর কথা নয়। তোমার একটা কথাতেই মন্ত্রের মত কাজ হবে।

তুমি কি ভাব, জানি না।

তুমি ধীরা মা। তোমার ইচ্ছেটাই তাঁর কাছে আদেশ। আমিও কোনো অন্যায় দাবি করব না। যে কাজ স্বামীজি মনে মনে পোষণ করতেন, বাস্তবে তার কিছুই হয়নি। তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সে ধারা লুপ্ত হয়ে যাক তা তিনি চান না। অথচ তার হাল ধরারও লোক নেই। মুখ ফুটে না বললেও আমার কাছে তাঁর অনন্ত দাবি। একদিন কথার মধ্যে বললেন, মার্গট, জীবন্ত তপস্যা করে যাবে তুমি? সে তপস্যা ভারতের নিদ্রিত মানুষের সত্তাকে জাগ্রত করা, তাদের আত্মশক্তিকে চিনিয়ে দেওয়া, দেশ ও জাতি সম্পর্কে সচেতন করা, ভারতের ধর্ম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করা। দেশের চেয়ে তাঁর কাছে বড় কিছু ছিল না। কিন্তু তাঁর কাজের সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাব সত্ত্বেও একজন বিদেশিনীর ওপর তার ভার অর্পণ করতে সংকোচ ছিল তাঁর। বলি বলি করেও জাতীয় নেতৃত্বর পাশে দাঁড়ানোর কথা বলতে পারছেন না। বোধহয় সেজন্য আমায় সন্ন্যাসিনীর দীক্ষা দিতে রাজি হয়নি। সন্ন্যাসের প্রতীক গেরুয়া বস্ত্র দান করে বললেন, তোমার শিরায় ক্ষত্রিয়ের রক্ত। আমার এই গেরুয়া হলো কুরুক্ষেত্রে মরণের সাজ। আমাদের লক্ষ্য : উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাণপাত, সাফল্য অর্জন নয়। সাফল্যের তটরেখার কোনো চিহ্ন তখনও দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু গৈরিকবাসের অন্তরালে যে স্বদেশপ্রেম ছিল প্রচণ্ডভাবে লুকোনো তা হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল। সন্ন্যাসের জন্য স্বদেশের কিছু করা হল না। কিন্তু প্রবন্ধে, বক্তৃতায় স্বদেশভাবনা রয়ে গেল। তাকে বাস্তবায়িত করার কোনো কাজ শুরু হলো না। আবার আমাকেও ভারতে যেতে দিলেন না। এখন গুরুর, সংকল্প, স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাক এমন কিছু করব না আমরা।

ধীরা মা'কে মাথা নাড়তে দেখে নিবেদিতা বলল, মাথা নাড়লে যে!

রুশ বিপ্লবের নেতা নির্বাসিত প্রিন্স ক্রুপ্টকিনের সঙ্গে তোমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগের শুভ ফল ফলতে আরম্ভ করেছে। ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ, অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে তোমার অন্তরে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিল আয়ার্ল্যান্ডে স্বামীজির রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তার সংস্পর্শে তা কী নতুন করে প্রাণ বোধ হয় পেল। ভারতের মাটিতে সেই বীজটি অঙ্কুরিত করা তোমার কাছে এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

জানি না। এত গভীর করে ভাবিনি। কেউ যদি সেভাবে ব্যাখ্যা করে তাহলে তা অন্যায় নয়। কারণ বিপ্লবের প্রেরণা আমার রক্তে। পরিবার সূত্রে আমি তা পেয়েছি। আয়ার্ল্যান্ডের হোমরুল আন্দোলনের একজন সক্রিয় বিপ্লবী কর্মীও ছিলাম। রাজনৈতিক মুক্তি ছাড়া একটা দেশ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। স্বামীজিও বুঝেছিলেন আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য চাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা। স্বামীজির স্বপ্নের ভারতভূমি গঠনের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক এত স্পষ্ট যে তাকে রূপদান করতে হলে ভারতের

মাটিতে বসে তা করতে হবে। দেশের মানুষের সঙ্গে তার যোগসূত্র গড়ে তুলতে হবে। বিদেশের মাটিতে বসে ইংলণ্ডের জনমত জাগ্রত করার জন্য ড. বসু, মি. দত্ত, স্বামীজির মত মানুষের দরকার। মার্গটের একাজ নয়। অন্তত একাজের জন্য আমি সৃষ্টি হইনি। যে স্বপ্ন দেখেছি তাকে রূপ দিতেই হবে আমায়। এর বেশি পরিকল্পনার কথা বলতে পারছি না। এখন আমি স্বামীজি এবং শ্রীমার কাছে ফিরে যেতে চাই। আমার সব বাসনা এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষায় পর্যবসিত। তুমি আমাকে ভারতে যাওয়ার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা কর। ভারতের জল-স্থল, মাটি-আকাশ, বাতাস থেকে প্রাণভরে শ্বাস না নিলে আমি বাঁচব না। আমি মনেপ্রাণে হিন্দু এবং ভারতীয়।

মিসেস বুলের অধবে টেপা হাসি। স্বামীজিব প্রতি নিবেদিতার তীব্র ভালোবাসা এবং অনুরাগ তাঁকে চমৎকৃত করল। নিঃস্বার্থ আত্মদানের আবেগে তার ভালোবাসা এত নির্মল যে বলিদানের 'আনন্দে হৃৎস্পন্দন কাঁপিতেছে ক্ষণে ক্ষণে বেদনার রুদ্রদেবতা।' বিস্মিত চোখে মিসেস বুল চেয়ে রইলেন তার দিকে। বললেন, স্বামীকে আমি সব বলব। কোথাও কোনো অস্পষ্টতা রাখব না। কোনো কিছু গোপন করব না। ভারতের মানুষের আত্মমুক্তির জন্য তোমার পিপাসিত অন্তরের প্রতিটি কথা তাঁকে বলব। দেশকালের সব সংকীর্ণ নিয়মগুলির বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য মার্গট প্রস্তুত। তোমার কর্মযজ্ঞের ঋত্বিক করে তাকে কাছে ডেকে নাও। তোমাকে জয়যুক্ত করার এতবড় অঙ্গীকার খুব কম মানুষ করেছে। মার্গটকে কোনো বড় কাজে নিযুক্ত করলে ওর দুঃখটা নিশ্চয় চলে যেত। ইংলন্ডে রেখে ওর সমৃদ্ধ জীবনটা এভাবে নষ্ট করে দিতে পার না। তুমি ওর জীবন বলিদানকে সম্মান কব স্বামী।

কথাগুলো নিবেদিতার সারা শরীরের মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ দিয়ে গেল। বিচিত্র একটা আবেগ জেগে উঠল বুকের ভেতর। মন্ত্রের মত নিরুচ্চারে আবৃত্তি করল, 'হে রুদ্র তব সঙ্গীত আমি কেমনে গাহিব কহি দাও স্বামী। মরণ নৃত্যে ছন্দ মিলায়ে হৃদয় ডমরু বাজাব। ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে তোমার অর্ঘ্য সাজাব।' রুদ্ধ আবেগে তার দুচোখ ভরে জল নামল।

অবশেষে, ভারতে ফেরার জন্য সারদা মা নিবেদিতাকে চিঠি লিখলেন। উদ্বেগের অবসান হল। স্বস্তি পেল নিবেদিতা। তবু সব গুছিয়ে ভাবতে রওনা হতে তার দেরি হয়ে গেল। ক'টা মাস কোথা দিয়ে কেটে গেল টের পেল না। একা একাই ভারতে যাওয়া স্থির করল নিবেদিতা। কিন্তু যাত্রার সময় ড. জগদীশচন্দ্র বসুর বন্ধু আই. সি. এস. রমেশচন্দ্র দত্ত মোম্বাসা জাহাজে তার সহযাত্রী হল। রমেশ দত্তর সঙ্গে ইংলন্ডে থাকাকালে নিবেদিতার আলাপ হয়েছিল। সমুদ্রপথে তাদের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। নানারকম মত বিনিময় করে জাহাজে সময়টা ভালোই কেটে যেত।

নিবেদিতা সম্পর্কে রমেশচন্দ্রর কৌতূহল বেশি। রেলিংঘেরা ডেকে পায়চারি করতে করতে রমেশচন্দ্র দেখল নিবেদিতা নিবিষ্ট হয়ে সে সমুদ্র দেখছে। রমেশচন্দ্র

নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়াল। মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বার কয়েক খুক্ খু
করে কাশল। কিন্তু নিবেদিতার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। রমেশ দত্ত তখন ওর দিকে মু
করে দাঁড়িয়ে বললো, মিসেস নোবল, তন্ময় হয়ে সমুদ্রের জলে এত কী দেখছেন?

ওঁর কথায় নিবেদিতার তন্ময়তা ভঙ্গ হল। বলল, কী দেখব? সমুদ্রের ঢেউ এন্জ
করছিলাম। বেশ লাগে। অনন্ত সময় কোথা দিয়ে বয়ে যায় খেয়াল থাকে না।

প্রত্যুত্তরে রমেশচন্দ্র বলল, সমুদ্রের মধ্যিখানে বসে সমুদ্র দেখার আনন্দই আলাদ
বিশালাকার ঢেউগুলো যেভাবে বুনো মহিষের মত ফোঁস ফোঁস করে তেড়ে এ
জাহাজকে গোঁত্তা মারে তাতে মনে হয় এই বুঝি ডুবে গেল। প্রাণের ভেতরটা গে
গেল করে ওঠে। আবার কখনও কখনও প্রাণোচ্ছল ঢেউগুলো যেভাবে ডেকের ওপ
লাফিয়ে ওঠে এক ঝাঁক দুষ্টু ছেলের মত হৈ-চৈ বাধিয়ে দেয়, তখন খুব বিপন্ন এব
অসহায় মনে হয় নিজেকে।

নিবেদিতার অধরে কৌতুক হাসি ফুটল। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। হাসলে তার গা
টোল পড়ে। রমেশ দত্ত অপলক চেয়ে রইল তার দিকে। স্মিত হেসে বলল, মিঃ দ
আপনি যাকে বলছেন সমুদ্রের ফোঁসফোঁসানি, আমি তাকে বলছি সমুদ্রের আহ্বান
অনন্তকাল ধরে সমুদ্র এভাবেই আহ্বান করছে শুধু ধাও, উদ্দাম উধাও, ফিরে নাহি চাও
যা কিছু তোমার দুহাতে ফেলে ফেলে যাও, কুড়ায়ে লয়ো না কিছু, কর না সঞ্চয়। এ
হল চিরন্তন সত্য। মানুষ কিছু নিয়ে যায় না সঙ্গে। তাই যা কিছু নিজের তা দিয়ে
দু'দিনের এই জীবন ভরপুর কবে সুধন্য করে তোলে সকলকে।

মার্গট আপনাকে যত দেখছি তত বিস্ময়বোধ করছি। ভারতের দর্শন ও সাধনাকে
আপনি কত সহজে নিজের করে নিয়েছেন। ভারতের মর্মবাণী আপনার মধ্যে এব
অন্যরূপে মূর্ত হয়ে ওঠেছে। যার মূল কথা হল ত্যাগ। নিঃস্বার্থ আত্মদানে তা অসামান
সুন্দর। আপনার সঙ্গে দেখা না হলে কোনোদিন এসব জানা হতো না।

অধরে হাসি ফুটিয়ে নিবেদিতা বলল, ফ্লাটারি করছেন।

একেবারে না। অনুভূতির কথা বললে কি ফ্লাটারি করা হয়। স্বচক্ষে দেখছি, ইংলন্ড
অপেক্ষা ভারত আপনার কত প্রিয়। ভারতের মঙ্গলের জন্য, ভারতবাসীর আত্মিক
উন্নতির জন্য আপনি কত ভাবেন। কিন্তু সেজন্য ভারতবাসী আপনার কাছে কতটুকু
ঋণ স্বীকার করবে জানি না। হয়তো দেখা যাবে, সারাজীবন ভারতের জন্য প্রাণপাত
করলেন, কিন্তু পেলেন না কিছু। একেবারে শূন্য হাতে ফিরতে হল আপনাকে। এযে
আমাদের জাতীয় জীবনে কতবড় লজ্জা সেকথা বলে বোঝানোর নয়। আমার বিশ্বাস
সেজন্যই ইংলন্ডে বসে ভারতের কাজ করতে বলেছিল নরেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও
ভালোবাসার টানে ইংলন্ড ছাড়লেন চিরকালের জন্য।

আমি নিজেও ভালো করে তার উত্তর জানি না। তবে ভারতের মর্মবাণী আমি
রক্তের কল্লোলে শুনতে পাই। পরাধীন ভারতবর্ষের মত আমিও পরাধীন আয়ার্ল্যান্ডের
অধিবাসী। হয়তো এই আশ্চর্য মিলটাই গভীরভাবে আমাকে ভারতের প্রতি টানে।

উভয় দেশের শাসক ইংলন্ড। ঐ মিলই হয়তো ভারতের জন্য কিছু করতে বলে। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা না হলে এসব কিছুই হতো না হয়তো। এমনও হতে পারে আমার নিয়তিই আমার কূল থেকে তাঁর কূলের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। আমার সব ভালোবাসা তো স্বামীজিকে কেন্দ্র করে। তিনিই আমাকে ভারতবর্ষ চিনিয়েছেন। গুরুকে ভালোবাসি বলেই তাঁর স্বদেশকেও ভালোবাসি।

আপনার গুরু তো ইংলন্ডে থেকে ভারতের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা ও অনুরাগকে ইংলন্ডে বসে দেখাতে বলেছেন। আপনার যা কিছু কর্তব্য তাও ইংলন্ডে থেকে করতে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু সে কাজ আপনার সম্পূর্ণ হয়েছে বলে কি মনে হয়?

ইংলন্ডের নিজের প্রায়শ্চিত্তের ভার আমি নিতে যাব কেন? একাজ সম্পূর্ণ না করার দায় আমার নেই। আবার আমি যে গুরুর অবাধ্য হয়েছি একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। তাঁর অনুমতি না আসা অবধি ইংলন্ডে থেকেছি। তাঁর ও শ্রীমায়ের আদেশে ভারতে রওনা হয়েছি। কার্যত ইংলন্ডে রেখে স্বামীজি আমাকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পরীক্ষা নিয়েছেন। কারো ওপর নির্ভর না করে স্বাবলম্বী হতে বলেছেন। নিজের কাজের সিদ্ধান্ত নিজে নেবার যোগ্য হতে বলেছেন। ইংলন্ড ছিল আমার অনুশাসনের কাল। আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের আত্মাকে আবিষ্কার করা এবং অন্যকে উপলব্ধি করানো। একটি শান্তিপ্রিয় সহিষ্ণু জাতের ওপর ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে নিষ্ঠুর উৎপীড়ন, অত্যাচার চালাচ্ছিল সে সম্পর্কে ইংলন্ডের মানুষকে অবহিত করা, তাদের মনের অভ্যন্তরে ভারতের প্রতি সহানুভূতির বীজ বপন করা, ভারত সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণা পাল্টে দেওয়া, এককথায় ভারতীয় জীবনযাত্রা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ গড়ে তোলা ছিল আমার কাজ। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য বিশ্বের এই সহানুভূতিটুকু তার দরকার। এতে দুটি কাজ অবশ্যই হবে। পাশ্চাত্য আবিষ্কার করবে ভারতকে আর ইউরোপে বসবাসকারী ভারতীয়রা আবিষ্কার করবে নিজেকে। এই সূত্রে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং ভালোবাসবে। কর্তব্যপালনে আমার কোনো ফাঁকি ছিল না। কিন্তু কতখানি সফল হল তার বিচার করিনি। ফললাভ তো একদিনের ব্যাপার নয়। তার জন্য সময় লাগে। অযথা সময়ের অপব্যয় করে কী লাভ। ভারতে প্রচুর কাজ বাকি। ভারতের উন্নতি এবং মঙ্গলের জন্য আমরা সর্বশক্তি কীভাবে নিয়োগ করব তার অন্বেষণই আমার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান।

বিবেকানন্দের ভাবকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য নিবেদিতার সাংগঠনিক বুদ্ধি রমেশচন্দ্র দত্তকে অভিভূত করল। আবেগঘন গলায় বললেন, ভারতের জন্য কত ভাবেন আপনি। কিন্তু ভারতবাসী কতটুকু ভাবে আপনাকে সেটুকু জানতে ইচ্ছে করে না।

কাজ করার লোক পৃথিবীতে খুব কম। কিন্তু কাজ পণ্ড করার লোক অনেক। আমি যা করি সব আমার গুরুর জন্য। পূজা করেই পূজারীর সুখ। তার অন্য কামনা থাকতে

নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়াল। মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বার কয়েক খুক্ খুক্ করে কাশল। কিন্তু নিবেদিতার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। রমেশ দত্ত তখন ওর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বললো, মিসেস নোবল, তন্ময় হয়ে সমুদ্রের জলে এত কী দেখছেন?

ওঁর কথায় নিবেদিতার তন্ময়তা ভঙ্গ হল। বলল, কী দেখব? সমুদ্রের ঢেউ এন্‌জয় করছিলাম। বেশ লাগে। অনন্ত সময় কোথা দিয়ে বয়ে যায় খেয়াল থাকে না।

প্রত্যুত্তরে রমেশচন্দ্র বলল, সমুদ্রের মধ্যিখানে বসে সমুদ্র দেখার আনন্দই আলাদা। বিশালাকার ঢেউগুলো যেভাবে বুনো মহিষের মত ফোঁস ফোঁস করে তেড়ে এসে জাহাজকে গোঁত্তা মারে তাতে মনে হয় এই বুঝি ডুবে গেল। প্রাণের ভেতরটা গেল গেল করে ওঠে। আবার কখনও কখনও প্রাণোচ্ছল ঢেউগুলো যেভাবে ডেকের ওপর লাফিয়ে ওঠে এক ঝাঁক দুষ্টু ছেলের মত হৈ-চৈ বাধিয়ে দেয়, তখন খুব বিপন্ন এবং অসহায় মনে হয় নিজেকে।

নিবেদিতার অধরে কৌতুক হাসি ফুটল। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। হাসলে তার গালে টোল পড়ে। রমেশ দত্ত অপলক চেয়ে রইল তার দিকে। স্মিত হেসে বলল, মিঃ দত্ত, আপনি যাকে বলছেন সমুদ্রের ফোঁসফোঁসানি, আমি তাকে বলছি সমুদ্রের আহ্বান। অনন্তকাল ধরে সমুদ্র এভাবেই আহ্বান করছে শুধু ধাও, উদ্দাম উধাও, ফিরে নাহি চাও। যা কিছু তোমার দুহাতে ফেলে ফেলে যাও, কুড়ায়ে লয়ো না কিছু, কর না সঞ্চয়। এই হল চিরন্তন সত্য। মানুষ কিছু নিয়ে যায় না সঙ্গে। তাই যা কিছু নিজের তা দিয়ে দু'দিনের এই জীবন ভরপুর করে সুধন্য করে তোলে সকলকে।

মার্গট আপনাকে যত দেখছি তত বিস্ময়বোধ করছি। ভারতের দর্শন ও সাধনাকে আপনি কত সহজে নিজের করে নিয়েছেন। ভারতের মর্মবাণী আপনার মধ্যে এক অন্যরূপে মূর্ত হয়ে ওঠেছে। যার মূল কথা হল ত্যাগ। নিঃস্বার্থ আত্মদানে তা অসামান্য সুন্দর। আপনার সঙ্গে দেখা না হলে কোনোদিন এসব জানা হতো না।

অধরে হাসি ফুটিয়ে নিবেদিতা বলল, ফ্লাটারি করছেন।

এক্কেবারে না। অনুভূতির কথা বললে কি ফ্লাটারি করা হয়। স্বচক্ষে দেখছি, ইংলন্ড অপেক্ষা ভারত আপনার কত প্রিয়। ভারতের মঙ্গলের জন্য, ভারতবাসীর আত্মিক উন্নতির জন্য আপনি কত ভাবেন। কিন্তু সেজন্য ভারতবাসী আপনার কাছে কতটুকু ঋণ স্বীকার করবে জানি না। হয়তো দেখা যাবে, সারাজীবন ভারতের জন্য প্রাণপাত করলেন, কিন্তু পেলেন না কিছু। একেবারে শূন্য হাতে ফিরতে হল আপনাকে। এযে আমাদের জাতীয় জীবনে কতবড় লজ্জা সেকথা বলে বোঝানোর নয়। আমার বিশ্বাস সেজন্যই ইংলন্ডে বসে ভারতের কাজ করতে বলেছিল নরেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভালোবাসার টানে ইংলন্ড ছাড়লেন চিরকালের জন্য।

আমি নিজেও ভালো করে তার উত্তর জানি না। তবে ভারতের মর্মবাণী আমি রক্তের কল্লোলে শুনতে পাই। পরাধীন ভারতবর্ষের মত আমিও পরাধীন আয়ার্ল্যান্ডের অধিবাসী। হয়তো এই আশ্চর্য মিলটাই গভীরভাবে আমাকে ভারতের প্রতি টানে।

উভয় দেশের শাসক ইংলন্ড। ঐ মিলই হয়তো ভারতের জন্য কিছু করতে বলে। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা না হলে এসব কিছুই হতো না হয়তো। এমনও হতে পারে আমার নিয়তিই আমার কূল থেকে তাঁর কূলের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। আমার সব ভালোবাসা তো স্বামীজিকে কেন্দ্র করে। তিনিই আমাকে ভারতবর্ষ চিনিয়েছেন। গুরুকে ভালোবাসি বলেই তাঁর স্বদেশকেও ভালোবাসি।

আপনার গুরু তো ইংলন্ডে থেকে ভারতের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা ও অনুরাগকে ইংলন্ডে বসে দেখাতে বলেছেন। আপনার যা কিছু কর্তব্য তাও ইংলন্ডে থেকে করতে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু সে কাজ আপনার সম্পূর্ণ হয়েছে বলে কি মনে হয়?

ইংলন্ডের নিজের প্রায়শ্চিত্তের ভার আমি নিতে যাব কেন? একাজ সম্পূর্ণ না করার দায় আমার নেই। আবার আমি যে গুরুর অবাধ্য হয়েছি একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। তাঁর অনুমতি না আসা অবধি ইংলন্ডে থেকেছি। তাঁর ও শ্রীমায়ের আদেশে ভারতে রওনা হয়েছি। কার্যত ইংলন্ডে রেখে স্বামীজি আমাকে আত্মনির্ভরশীল হওয়াব পরীক্ষা নিয়েছেন। কারো ওপর নির্ভর না করে স্বাবলম্বী হতে বলেছেন। নিজের কাজের সিদ্ধান্ত নিজে নেবার যোগ্য হতে বলেছেন। ইংলন্ড ছিল আমার অনুশাসনের কাল। আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের আত্মাকে আবিষ্কার করা এবং অন্যকে উপলব্ধি করানো। একটি শান্তিপ্রিয় সহিষ্ণু জাতের ওপর ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে নিষ্ঠুর উৎপীড়ন, অত্যাচার চালাচ্ছিল সে সম্পর্কে ইংলন্ডের মানুষকে অবহিত করা, তাদের মনের অভ্যন্তরে ভারতের প্রতি সহানুভূতির বীজ বপন করা, ভারত সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণা পাল্টে দেওয়া, এককথায় ভারতীয় জীবনযাত্রা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ গড়ে তোলা ছিল আমার কাজ। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য বিশ্বের এই সহানুভূতিটুকু তার দরকার। এতে দুটি কাজ অবশ্যই হবে। পাশ্চাত্য আবিষ্কার করবে ভারতকে আর ইউরোপে বসবাসকারী ভারতীয়রা আবিষ্কার করবে নিজেকে। এই সূত্রে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং ভালোবাসবে। কর্তব্যপালনে আমার কোনো ফাঁকি ছিল না। কিন্তু কতখানি সফল হল তার বিচার করিনি। ফললাভ তো একদিনের ব্যাপার নয়। তার জন্য সময় লাগে। অযথা সময়ের অপব্যয় করে কী লাভ। ভারতে প্রচুর কাজ বাকি। ভারতের উন্নতি এবং মঙ্গলের জন্য আমরা সর্বশক্তি কীভাবে নিয়োগ করব তার অন্বেষণই আমার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান।

বিবেকানন্দের ভাবকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য নিবেদিতার সাংগঠনিক বুদ্ধি রমেশচন্দ্র দত্তকে অভিভূত করল। আবেগঘন গলায় বললেন, ভারতের জন্য কত ভাবেন আপনি। কিন্তু ভারতবাসী কতটুকু ভাবে আপনাকে সেটুকু জানতে ইচ্ছে করে না।

কাজ করার লোক পৃথিবীতে খুব কম। কিন্তু কাজ পণ্ড করার লোক অনেক। আমি যা করি সব আমার গুরুর জন্য। পূজা করেই পূজারীর সুখ। তার অন্য কামনা থাকতে

নেই। গুরুর বাণী আমার জপতপ। তপোভূমি ভারতের জন্য তিনি মানুষকে আহ্বান করে বললেন, আগামী পঞ্চাশবৎসর হিন্দুর দেবদেবী, যাগযজ্ঞ বিসর্জন দিয়ে একমাত্র দেশবাসীকেই আরাধ্যদেবী করে পুজো কর। সে কথায় সারা শরীরে শিহরন খেলে গেল। চৈতন্যের ঘরে ঘরে দীপ জ্বলে উঠল। দেশের মানুষের কাছে তাঁর একটাই দাবি—ওঠ জাগ এগিয়ে চল। কাজের সময় হয়েছে। এখন কি ঘুমিয়ে থাকা সাজে। কিসের ভয়? মা তো সঙ্গে আছেন। তাঁকে জাগিয়ে তোল। তাঁকে ডাক— দুর্গা দুর্গা বলে। মা দশভুজা মূর্তিতে দুর্জয় প্রহরণ ধরে দানব দলন করবে। তোমাকে শক্তি দেবে। এই শক্তিস্বরূপিণী মাকে আজ ভারতের ভয়ানক দরকার। এসব কথা শোনার পর রক্তমাংসের কোনো মানুষ চুপ করে থাকতে পারে রমেশবাবু?

রমেশচন্দ্রর কথা ফুরিয়ে যায়। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, বিবেকানন্দের কথাগুলো আপনার মত করে ব্যাখ্যা করার কোনো কারণ আছে?

তাঁর সব ভাবনা আমাঁকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। কেবল আমিই টের পাই দেশের অবর্ণনীয় দুর্দশার জন্য দেহে মনে কী বিপুল যন্ত্রণা ভোগ করেন তিনি। অথচ সকলকে শুনিয়ে বললেন, আমি কে? আমি তো গোত্রহীন পথের সন্ন্যাসী।

রমেশচন্দ্র বললেন, সন্ন্যাসী সম্পর্কে আমাদের চিরন্তন ধারণাটা বদলে দিয়েছেন, বলেই নিজেকে গোত্রহীন সন্ন্যাসী ভাবার কারণ আছে তাঁর। কোন মুডে এবং কী প্রসঙ্গে কথাগুলো স্বামীজি বলেছেন জানি না, কিন্তু কথাটা যে দারুণ সত্যি তাতে সন্দেহ নেই। সর্বান্তকরণে তিনি চেয়েছেন নতুন ভারত, নতুন ঠাকুর, নতুন ধর্ম, নতুন বেদ।

আপনি ঠিক বলেছেন। স্বামীজি মানুষকে কাজে নেমে পড়তে আহ্বান করেছেন। অনেক সময় অপচয় হয়ে গেছে। আর কালক্ষয় নয়। প্রত্যেক মানুষের ভিতর দুঃখ মোচনের শক্তি আছে। সেই শক্তির উদ্বোধন করতে হবে তার নিজের মধ্যে। তবে এ জাতি দৈন্য থেকে মুক্ত হবে। কিন্তু তার জন্য চাই শিক্ষা। জ্ঞানের আলো পড়ে ভেতরটা যখন আলোকিত হবে, নিজেকে জানতে পারবে তখন তারাই আকাশ হতে বজ্রের মত ভেঙে পড়বে দুনিয়ার ওপর। কিন্তু আশ্চর্যের কথা নিজে পূর্ণ স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী এবং জনজীবনে স্বাধীনতার প্রেরণাদাতা হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ্য রাজনীতি থেকে কেন যে দূরে সরে থাকলেন তিনিই জানেন।

রমেশ দত্ত বললেন, আসলে স্বদেশপ্রেম আর সন্ন্যাস দুটো একসঙ্গে হয় না।

নিবেদিতা বলল, কে বলল, স্বদেশের জন্য সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন কোনো ঘটনা নয়। আমার বিশ্বাস রামকৃষ্ণ সংঘ ও মিশনকে রাজনীতির সংস্রব থেকে দূরে রেখে সেবাধর্মের ওপর জোর দিয়েছেন। সেবার মনোভাব নিয়ে মানুষের খুব কাছে পৌঁছনো যায়। তার আত্মগঠনের ভূমিকা নেওয়া যায়। আগে চাই মানুষ গঠন। মানুষ তৈরি করে জাতিগঠন করা ছিল তাঁর আদর্শ। কিন্তু শেষ অবধি সন্ন্যাসীর কাছে ঈশ্বরই সত্য হল। ঈশ্বরপ্রেম দেশপ্রেমকে ভাসিয়ে নিয়ে

গেল। মা-ই সব। ভাবের উত্তরণের ফলে স্বদেশচিন্তা উপেক্ষিত হল।

এত হারিকারি—বললেন রমেশ দত্ত।

না, আমার গুরুর গৈরিকবাসের অন্তরালে রয়েছে প্রচণ্ড স্বদেশপ্রেম। আমার কাছে তাঁর স্বদেশপ্রেমের একটা বিশেষ মূল্য আছে। সেটা কতখানি রাজনৈতিকভাবে প্রয়োজন তা আমার কাছে এত স্পষ্ট যে, সেটি আমি অস্বীকার করতে পারছি না। বছরখানেক আগে রিজলিম্যানে থাকতে একখণ্ড গৈরিকবাস দিয়ে বললেন, এ হল কুরুক্ষেত্রের মরণসাজ। কম কথায় বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মন্ত্র দিলেন আমাকে। গুরুদক্ষিণা দেবার ডাক এসেছে শ্রীমার কাছ থেকে। তাঁর সে অন্তরঙ্গ ডাক আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না—ফিরে এস খুকী, ফিরে এস ভারতবর্ষে। আমার অজস্র আশীর্বাদ নিয়ত তোমার ওপর বর্ষিত হচ্ছে। এরপর আর ইংলন্ডে থাকা যায়! ইংলন্ড কী দিতে পারে আমাকে?

ভারতের কাছ থেকেই বা কী পেলেন?

অনেক পেয়েছি। আমার ভাবের নবজন্ম হয়েছে ভারতের মাটিতে। আমি লোকমাতা, ভগিনী নিবেদিতা, আমি মহাশ্বেতা, আমি শিখাময়ী নিবেদিতা কত কি। ভারত আমার প্রাণ। ভারতের ধর্ম আমার ধর্ম। ভারতের স্বাধীনতা আমার স্বপ্ন। ভারতবাসী আমার ভাই-বোন। ভারত মা আমার সারদা মা। গুরুর সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বার বার বলেছি—ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।

রমেশচন্দ্র ডাক ভুলে যাওয়া পাখির মত স্তব্ধ দৃষ্টিতে নিবেদিতার দিকে চেয়ে রইলেন। কথাগুলো দামামার শব্দ তোলে তাঁর রক্তে। বুকের মধ্যে নানারকম বিস্ফোরণ হতে থাকে। স্বদেশপ্রেমের ভেতর যে এতসব অসামান্য আনন্দ এবং অসহনীয় সুখবোধ লুকোনো আছে রমেশচন্দ্রের জানা ছিল না। ভিতরে ভিতরে এক অদ্ভুত অকারণ আনন্দ ঢেউ দিতে থাকে। তরঙ্গমুখর সমুদ্রের নির্জনতায় দাঁড়িয়ে রমেশ দত্ত অনেক বড় একটা কিছুকে অনুভব করেন। সত্যিকারের স্বদেশকে তিনি দেখতে পান। এই প্রথম নিবেদিতার মত তাঁরও মনে হল এই ভারতবর্ষের জন্য তাঁর কিছু করার আছে। কথাটা মনে হতেই গায়ে কাঁটা দিল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে অস্ফুট গলায় বললেন, মিসেস নোবল আপনার কথাগুলো এত সহজ যে মর্মের ভিতরে টনটন করে গিয়ে লাগে। ভারতপ্রীতি এবং স্বদেশপ্রেমের পরীক্ষায় আপনার কাছে হেরে গেছি। আপনার চোখে এক ধরনের ধিকি ধিকি আগুন আছে। কিন্তু আমার মধ্যে তাঁর আঁচটুকু পর্যন্ত নেই।

মাথার ওপর দিয়ে ভাসমান খণ্ড মেঘের মধ্যে বিবেকানন্দের মুখ ফুটে উঠল। কত স্মৃতি, কত বাণী মনে পড়ল। কোনোটাই থামে না। যে আবেগ বিবেকানন্দ নামে এক সীমানায় আবদ্ধ ছিল তা উপচে গেল তাঁর স্বদেশের দিকে। রমেশচন্দ্রের কথায় মনটা প্রসারিত হয়ে গেল বহুদূর পর্যন্ত। স্বামীজির জন্য মনটা তার আকুল হল।

সমুদ্রবক্ষে রমেশচন্দ্র নিবেদিতাকে নতুন করে চিনল। তার ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পেল। নিবেদিতার মন জুড়ে রয়েছে বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভারতবর্ষ। বিদেশী শাসন শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে এক স্বাধীন স্বদেশভূমি গঠনের স্বপ্ন নিবেদিতার দুচোখে। এই ভাবনা-চিন্তা নিয়ে নিবেদিতা ভারতে প্রত্যাবর্তন করছে। ভারতবর্ষের প্রতি ব্রিটিশ জাতি যে অন্যায় করেছে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যেন নিবেদিতা ভারতে আসছে। তার মনের এই অভিব্যক্তি স্বামীজির হয়তো অজানা ছিল না। কোনো এক কালে গিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের চৌহদ্দিতে ধরবে না এটাও বোধ হয় প্রজ্ঞাদৃষ্টি দিয়ে স্বামীজি টের পেয়েছিলেন। নিবেদিতার স্বাধীনতাপ্রিয় নির্ভীক মনটি মঠের বাধা গণ্ডি কেটে উপচে যাবে জীবনের অন্য কোনো আলোকিত প্রান্তরের দিকে। তাই সন্ন্যাসের দীক্ষা থেকে তাকে দূরে রেখেছিলেন। ভারতের রাজনীতি এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সে প্রমাণ করবে নবজাগ্রত ভারত আর ভারতীয়দের জন্য তার কিছু করাব আছে।

অনন্ত সময় বয়ে যায়। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলল না অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

রমেশচন্দ্র দত্ত একটু ইতস্তত করে বলল, আপনার ভাবনা-চিন্তায় একটা বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। ভারত সম্পর্কে আপনার নতুন দৃষ্টি খুলে গেছে।

নিবেদিতা আত্মমগ্নতা থেকে সহসা জেগে উঠল। বলল, মানুষের ভাবনা-চিন্তা স্ট্যাটিক নয়। তার রূপান্তর পরিবর্তন অবশ্যই থাকবে। আমার স্নেহময় পিতা ইউরোপ থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করার কদিন আগে আমায় যে ধারা ধরিয়ে দিয়েছেন সে সব ছিল তাঁর এলাকার বাইরে। শ্রীরামকৃষ্ণকে এমন করে আঁকড়ে আছি যে, কোথাও যদি ভুল হয়ে যায় সেটা আমি তাঁরই দোষ মনে করব—আমার নয়। নিষ্ঠার সঙ্গে আমার যা করার তাই করছি শুধু। কার্যত, আমি করার কেউ নই। মা আমাকে দিয়ে যা করছেন তাঁর ইচ্ছেয় আমি তাই করছি। যদি কোনো দোষ হয় সে মায়ের। এখন ভালোয় ভালোয় সারদা মা আর আমার স্নেহময় পিতার কাছে পৌঁছতে পারলে হয়। যতক্ষণ তাঁদের দু'জনকে দেখতে না পাচ্ছি ততক্ষণ স্বস্তি পাচ্ছি না। মাদ্রাজে পৌঁছতে আর ক'দিন লাগবে? সত্যি বলতে কি, রাজার জন্য মনটা বড় অস্থির হয়েছে। এই যে কথা বলছি, ভালো লাগছে না। জাহাজে তো কিছু করার নেই, তার জন্য পরম করুণাময়ী শক্তিস্বরূপিণী মা কালীর কাছে শুধু প্রার্থনা করছি। অন্যমনস্ক থাকার জন্য কথা বলে নিজের ভেতরটাকে সামলাচ্ছি। জানেন মিঃ দত্ত, কেবিনে যখন একা একা থাকি তখন ভীষণ কান্না পায়। চোখ বন্ধ করলে বহুমূত্র আর হাঁপানিতে কাবু হওয়া রাজাকে দেখি। পাছে কোনো কুচিন্তা মনকে গ্রাস করে সেজন্য নিবিষ্ট হয়ে রুদ্রাক্ষের মালা জপ করি। আস্তে আস্তে মনটা শান্ত হয়ে আসে। কল্পনায় দেখি আমার রাজা সকলের হৃদয়ের রাজা হয়ে বসে আছেন। আর তাঁর বিছানা ঘিরে এবং ঘরের মেঝে দর্শনার্থীরা নিবিষ্ট হয়ে বসে তাঁর কথা শুনছেন। কী ভালো লাগে তখন।

।। ছয় ।।

বহু সাগর-উপসাগর পাড়ি দিয়ে, সমুদ্রঘেরা বহুদেশ ও জনপথ অতিক্রম করে, ছায়া সুশীতল কত বন্দরের গা ঘেঁসে, মোম্বাসা জাহাজ যাত্রার চব্বিশ দিনে মাদ্রাজ উপকূলে পৌঁছল। সেখানে নিবেদিতার জন্য এক গভীর বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। মিঃ সুব্রাহ্মনিয়ম, মিঃ আয়েঙ্গার এবং বিবেকানন্দের ভক্তরা জাহাজঘাটে নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করতে সমবেত হল। জাহাজের ডেক থেকে নেমে এলে নিবেদিতার ললাটে একজন মহিলা রক্তচন্দনের তিলক এঁকে দিল। আয়েঙ্গার একগুচ্ছ রক্তগোলাপ দিল তার হাতে। মিঃ সুব্রাহ্মনিয়ম হরেক রকম ফুল দিয়ে তৈরি মালাটি রমেশচন্দ্র দত্তকে পরিয়ে দিয়ে স্বাগত জানাল। তারপর বিপুল হর্ষসহকারে অতিথিদ্বয়কে হুড খোলা ঘোড়া গাড়ি করে শহর পরিক্রমা করল।

ফিটন গাড়িতে শান্ত হয়ে বসেছিল নিবেদিতা। পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসেছিল রমেশচন্দ্র দত্ত, সুব্রাহ্মনিয়ম ও আয়েঙ্গার। ফিটন গাড়ির আগে আগে হাঁটছিল একদল শোভাযাত্রী। নির্মল আনন্দে ও উৎসাহে ঘনঘন জয়ধ্বনি দিচ্ছিল তারা। নিবেদিতা এবং বিবেকানন্দের নামের সেই জয়ধ্বনি বহুদূর পর্যন্ত সময়কে চমকে দিয়ে গেল। শিহরন জাগাল নিবেদিতার বুকে। মৃদু মৃদু কাঁপছিল তার ভেতরটা। চুপিসাড়ে পা পা করে এক অদ্ভুত অনুভূতি হাঁটছে রক্তে মধ্যে। কী ভালো লাগছিল নিবেদিতার। এই অনুভূতি তার সম্পূর্ণ নতুন। প্রশ্নে প্রশ্নে ভরিয়ে ফেলল তার অন্তঃকরণ—এটা হল কি ? এমনটা হলই বা কী করে? নেপথ্যে কে বা কারা আয়োজন করল উষ্ণ অভ্যর্থনার? আগমনের কথা স্বামীজি ছাড়া অন্য কারো জানার কথা নয়। তিন ছাড়া অন্য কেউ নেই তাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর। কিন্তু তিনি তো কাশীতে এখন। তাহলে তাঁর নির্দেশেই কী আয়েঙ্গার এই অভ্যর্থনার আয়োজন করেছে? চারবছর আগে প্রথম যেদিন মাদ্রাজে জাহাজ নোঙর করল সেদিন গুরুর নির্দেশে গুডউইন মাদ্রাজ বন্দরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। আজ তার জায়গায় এল আয়েঙ্গার।

শোভাযাত্রার গাড়ি মন্থরগতিতে চলেছিল। গাড়িতে বসে ভাবতে লাগল স্বামীজির মত কর্তব্যপরায়ণ, দায়িত্বশীল মানুষ সন্ন্যাসী হল কেমন করে? চতুর্দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি! কখন কে আসছে, কার জন্য কী দরকার আগে থাকতে যথাস্থানে তার নির্দেশ

পাঠিয়ে দেন। দেবতার অদৃশ্য হাতের মত সব কাজ নিঃশব্দে হয়ে যায়। অথচ, তিনি থাকেন নেপথ্যে। বাইরে থেকে তাঁর উপস্থিতি বোঝার উপায় নেই। এই মানুষটি যে অন্তরালে আছেন এবং ভীষণভাবে আছেন তার কোনো দাবি নেই তাঁর। ওঁর এই আত্মগোপন নিবেদিতাকে একটা বিশেষ দৃষ্টি দেয়। সেবার মূল্য হয়তো তাঁর আত্মনিবেদনের তৃপ্তিতে। সেজন্য কারো কাছে কৃতজ্ঞতার দাবি নেই। পুণ্যের আশ্রয়ের মত এক নিশ্চিত শান্তি বিরাজ করে সেখানে। মনটা শ্রদ্ধায় ভরে যায়। হৃদয়ভরা বিস্ময় নিয়ে মনে মনে 'বলে শ্রদ্ধা নিত্য জেগে আছে প্রেমের শিয়র কাছে— মিলনসুখের বক্ষমাঝে।'

নিবেদিতাকে নিশ্চল হয়ে গাড়িতে বসে থাকতে দেখে স্বামীজির একান্ত ভক্ত ও অনুরাগী মিঃ আয়েঙ্গার বলল, মিসেস নোবল, আপনাকে কেন্দ্র করেই আমাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা। কিন্তু আপনি যদি মৌন থাকেন তাহলে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হয় কী করে?

আত্মমগ্নতা থেকে সহসা যেন জেগে উঠল নিবেদিতা। ভিতরের আবেগ সামলে নিতে কিছুক্ষণ সময়ও লাগল। লাজুক হেসে বলল, ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না। আমি একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম। আড়াই বছর আগে এই পথে এর থেকেও বড় শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। সেদিন স্বামীজির সঙ্গে আমি এক গাড়িতে ছিলাম। ঘোড়া দুটো খুলে দিয়ে মানুষে টানছিল সে গাড়ি। স্বামীজির গাড়ি চলেছে সকলের আগে। পিছনে পিছনে চলেছে বিপুল জনতা। স্বামীজির জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হচ্ছিল। রাস্তার ধারে দাঁড়ানো দর্শকদের মন টানছিল ঐ শোভাযাত্রায় নেমে আসতে। কেউ কেউ যোগ দিলও। হাতে ধরা প্লাকার্ডে নানা কথা লেখা আছে। তার মধ্যে দেখেছি বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়, আরো দেখেছি মানুষকে উদ্দীপিত করার মন্ত্র : 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' ঐ কথাগুলো রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়। হৃদয় মনকে জীবনদানের জন্য ব্যাকুল করে। উদ্বেলিত জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হতে লাগল—'হে রুদ্র তব সঙ্গীত আমি কেমনে গাহিব কহি দাও স্বামী। মরণ নৃত্যে ছন্দ মিলায়ে হৃদয় ডমরু বাজাব—ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে তোমার অর্ঘ্য সাজাব।' এই মুহূর্তে আমার পরমগুরু স্বামী বিবেকানন্দের কথা ভীষণভাবে মনে পড়ছে। আমার সমস্ত চেতনার মধ্যে তিনি জ্বল জ্বল করছেন। তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম। আসলে আমার সমস্ত কাজের মধ্যে ভাবনার মধ্যে তিনি ভীষণভাবে আছেন। মিঃ আয়েঙ্গার এই মুহূর্তে ভীষণ ইচ্ছে করছে আমি ঐ জনতার সারণীতে মিশে যাই। আমার গুরুর ভাবের মধ্যে হারিয়ে যাই।

মিঃ সুব্রাহ্মনিয়ম অভিভূত গলায় বলল, স্বামীজির মনের দিব্য আলো পড়ে সব কিছুই উজ্জ্বল করে। পুণ্যের মত মনটা পবিত্র হয়ে যায়। তখন পরও আপন হয়। ক্ষুদ্র

স্বার্থগুলো দূর হয়ে যায়। চারপাশ আলোয় ভরে উঠে। বড় মনের আলো পড়ে আমরা সবাই বড় হয়ে উঠি। সামান্য জিনিস অসামান্য হয়ে ওঠে। প্রিয় আরো প্রিয়তর হয়। আপনিই তার উদাহরণ।

নিবেদিতা তৎক্ষণাৎ তীব্র আপত্তি করে বলল, না, না—আমি কোনো দৃষ্টান্ত নই। যাজ্ঞবল্ক্য যা বলেছেন মানুষ অন্য কাউকে কিছু দিতে পারে না, নিজেকেই দেয়—গুরুর প্রতি প্রেম, ইষ্টের প্রতি ভক্তি সব আমাদের নিজের জন্যই, আমার আত্মাকেই তা পূর্ণ করছে। স্বামীজির প্রতি আমার ভক্তি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আমার দেহে মনে এমন আশ্চর্য সঙ্গীতে বাজছে যে প্রতিমুহূর্ত আমি তা অনুভব করি। তিনি না থাকলে কোথায় পেতেন নিবেদিতাকে? তিনি আমার স্রষ্টা, আমার পিতা। আমি কোনো ভাবে সেটা ভুলে যেতে চাই না।

ঘোড়া গাড়িতে বসেই কথোপকথন চলছিল। মিঃ দত্ত টাই-এর নট্‌টাকে একটু ঢিলে করে দিয়ে বলল, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ইংলন্ডের লোক হয়েও আপনি ভারতে ইংলন্ডের রাজ্যশাসনের অবসান চান।

হ্যাঁ সর্বান্তঃকরণে কামনা করি সেদিন সত্যিই আসুক যেদিন ভারতবাসী তার স্বদেশকে ইংরেজের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে। সেদিন আমিও যেন স্বাধীন ভারতে নতুন জন্ম নিয়ে শিশু ভারতের জয়গাথা উচ্চারণ করতে পারি। আপনি তো ভালো করেই জানেন, ইটালির স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের কচি কচি ছেলেরা রংরুট হয়ে ম্যাট্‌সিনির পাশে দাঁড়িয়ে মুক্তির বার্তা প্রচার করেছিল।

মিঃ আয়েঙ্গার বললেন, আপনার ভাবনা-চিন্তার ধারা পাল্টে গেছে। আড়াই বছর আগের নিবেদিতার সঙ্গে আজকের নিবেদিতার কোনো মিল নেই। আপনার উক্তিতে বিপ্লবের গন্ধ পাচ্ছি।

আপনি ঠিক বলেছেন। আমার পরিকল্পিত কাজকে সবাই খাঁটি রাজনীতি বলে ধরে নেবে। যত দিন যাচ্ছে তত নিজেকে প্রশ্ন করি গুরুর চাওয়া কতটা পূরণ করতে পেরেছি? অথচ আমি তো ভীষণভাবে চাই ধরিত্রীর প্রতি ধূলিকণা আমার গুরুর আকুল বাণী বহন করুক। সেজন্য চাই প্রদীপ্ত আহ্বান, জনতার উদ্দীপনা, প্রাণ বিসর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তার জন্য কর্মী চাই। স্বামীজি তাই মানুষ তৈরির ওপর জোর দিয়েছিলেন। গণদেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামীজি বলেছেন, হাজার হাজার শিষ্য, অনুগামী ও বন্ধু যোগাড় কর। তারপর একদিন যখন বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়বে তখন ইংলন্ডের মানুষের ঘুম ভাঙবে। সেদিন দল বেঁধে তারাও বলবে ওদের স্বাধীন হতে দাও।

মহাজন হলের সামনে ঘোড়া গাড়ি থামল। একজন স্বেচ্ছাসেবিকা নিবেদিতার হাত ধরে গাড়ি থেকে নামাল। তারপর ওরা সকলে একসঙ্গে সভাগৃহের দিকে অগ্রসর হল।

মঞ্চের দিকে যেতে যেতে নিবেদিতার বারংবার বিবেকানন্দের কথা মনে হতে লাগল। চলার পথে আদর্শ ঠিকানা তো তাঁর কাছ থেকে পাওয়া। তাঁর সঙ্গে থাকাটা

কোনো ব্যাপার নয়। তিনি অন্তরালে আছেন এবং ভীষণভাবে আছেন বলেই কোনো কাজই থেমে নেই। সবকিছু আগে থেকে ছকা আছে। মাদ্রাজে অভ্যর্থনা করে বুঝিয়ে দিলেন ভারতবর্ষ নিবেদিতাকে বরণ করছে। লন্ডনে থাকতে থাকতে নিবেদিতা নিজেই বুঝে গিয়েছিল নিদ্রিত ভারতকে জাগানোর জন্য কী ধরনের কাজ করতে হবে তাকে। ভারতের নবপ্রজন্মকে জাগিয়ে তোলার ব্রত তার। সেজন্য গুরু তাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী করে রেখেছে।

স্বামীজির অভিপ্রায় নিবেদিতার অজানা ছিল না। অশিক্ষার জগদ্দল পাথর দুরন্ত ঠেলায় একদিনে সরিয়ে ফেলার নয়। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে দেশের মানুষকে মুক্ত করতে অনেক সময় দরকার। সেই সময় অপেক্ষা না করে সমবেত চেষ্টায় রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের প্রশ্নটি সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পথ ধরেই আসবে সার্বজনীন মঙ্গল ও কল্যাণ। মানুষ নিজেই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝে নেবে। স্বামীজিও সর্বান্তকরণে তার বক্তব্য সমর্থন করে বলেছিলেন তাই হবে, মার্গট, তোমার কথাই ঠিক।

একদিনের একটা ঘটনা হঠাৎই নিবেদিতার মন ছুঁয়ে গেল। বিবেকানন্দ তখন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। সেখানে মিসেস লেগেটের বাড়িতে প্রায়ই গানবাজনার আসর বসত। কখনও কখনও বিবেকানন্দও যেতেন ওখানে। জগৎ-বিখ্যাত ফরাসী সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পী এমা কালভেরও সেখানে যাওয়া-আসা ছিল। আমেরিকার এক বক্তৃতা সভায় এমা কালভে বিবেকানন্দকে প্রথম দেখেছেন। কিন্তু তার সঙ্গীত শোনার সৌভাগ্য হয় মিঃ লেগেটের গৃহে। তারপর থেকেই বিবেকানন্দ তার একজন অনুরাগী হয়ে ওঠেন। এক সন্ধ্যায় সঙ্গীতের আসরে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, আপনার গানের একজন ভক্ত আমি। বলতে কী ভীষণ এনজয় করি। চমৎকার। যে ভূমিকায় গান গেয়ে আপনি সব চেয়ে আনন্দ পান সেই ভূমিকায় আপনাকে একবার দেখতে খুব ইচ্ছে করে। এখন বলুন তো কী সে ভূমিকা।

এমার মুখখানা সহসা খুশিতে ঝলমল করে উঠল। কিন্তু কথা বলার সময় লাজুক সপ্রতিভতায় বলল, বোধহয় কারমেনের ভূমিকায় আমাকে ভালো লাগে। যখন কারমেন সাজি, তখন মনে হয় ঘরছাড়া, বাঁধন ছেঁড়া যাযাবর তরুণী আমি। যখন অভিনয় করি তখন অজান্তে ঐ চরিত্রের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যাই। ভদ্রতা করার জন্য এমা বলল, বেশ একদিন হলে আসুন।

অফ কোর্স। আমি হলেই যাব। যে পরিবেশে যা—

এভাবে স্বামীজির রাজি হয়ে যাওয়াটা নিবেদিতার একটুও ভালো লাগল না। তৎক্ষণাৎ দৃঢ়তার সঙ্গে আপত্তি করল। বলল, না, না রাজা। তা হয় না। ওসব থিয়েটার টিয়েটারে আপনার যাওয়া চলবে না। আপনার মত লোকদের যাওয়ার জায়গা নয় ওটা। লোকে কী বলবে? চারদিকে সমালোচনার ঝড় বইবে।

অবাক হয়ে নিবেদিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন স্বামীজি। নিবেদিতার উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠার কী জবাব দেবেন? কিছুক্ষণ বাদে একটুকরো কৌতুক হাসি ফুটল তাঁর অধরপ্রান্তে। বললেন, সমালোচনা তো থেমে নেই। ওজন্য আমি ভয় পাই না। কারমেন নাচে তো কোরাস গানের সঙ্গে উতরোল হয়ে ওঠে বাজনা। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে উদ্দাম নৃত্য। সেই উদ্দামতায় আত্মস্বরূপকে অনাবৃত করে। নাচের তালে তালে দেহের রক্ত লাফায়, রক্তিম চুলের ঢেউ আছড়ে পড়ে বুকের ওপর। এলোমেলো হয়ে সারা মুখখানা ঢেকে দেয়। প্রায় স্বল্প পোশাকের আড়ালে অগ্নিশিখার মত জ্বলন্ত সেই যৌবনের মূর্তি দর্শকদের স্নায়ু বিকল করে দেয় বলেই তো তোমার আপত্তি। আমি সন্ন্যাসী। ওর মধ্যে খারাপ কোথায়। খারাপ ভালো সব মনের ব্যাপার। ফরাসি বিপ্লবের সময় জীবনমুখী এই পথনৃত্য ও গান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল তা তো তুমি জান।

নিবেদিতার আপত্তি সত্ত্বেও স্বামীজি মিঃ লেগেটের সঙ্গে এমার কারমেন নৃত্য দেখলেন। পরের দিন লেগেটের বাড়িতে নিবেদিতার সামনেই এমাকে বললেন, কাল আপনার অনুষ্ঠান দেখলাম। কী বিচিত্র নাচ! কোনোদিকে খেয়াল নেই, নিজের মধ্যে তন্ময় হয়ে নাচছেন। কখনো স্বর্ণলতার মত দুটো বাহু তুলে, কখনো চক্রাকারে পাক খেয়ে উল্কার গতিতে নেচেই চলেছেন। কিছু যে একটা বোঝাতে চাইছেন সেটা গানের ভাষার সুরের আগুনে জ্বালিয়ে তুলল শিরায় শিরায়। সেটি একবার গেয়ে শোনাবেন এমা? ওটি আমি শিখতে চাই।

এমা বলল, লা মার্সেইয়াজ? কিন্তু ও যে সমর সঙ্গীত স্বামীজি। কামান গর্জে উঠেছে আর সৈন্যেরা হুঙ্কার ছাড়ছে—

স্বামীজি তার কথা শেষ করার আগেই বললেন, হ্যাঁ, ঐ গানটিই। ঐ গানের ভেতর আমি নিজেকে খুঁজে পাই। ভাবতে অবাক লাগে ও গানের সম্মোহন শক্তি নির্ভয়ে আগুন জ্বালে আপনাদের অন্তরে। তখন দেশের প্রতি সুগভীর ভালোবাসায় প্রাণদেবার আকুতি জাগে। মানুষের শিরায় শিরায় একোন আবেগ জাগে? কোন অদৃশ্য শক্তির মন্ত্রবলে ভয়, সংশয় এবং দ্বিধা ত্যাগ করে তারা মাথা তুলে দাঁড়ায়। আমার দেশের ছেলেদের এই গান শেখাতে খুব ইচ্ছে হয়। তাদের প্রাণে নির্ভয়ের আগুন জ্বেলে দেওয়ার চারণ গান করব তোমার সুর ও ছন্দকে। তাহলে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা আমার দেশের মানুষকে বীর্যবান করবে। তারাও বলবে নির্ভয় যে প্রাণ করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

স্বামীজির মনোভাব হঠাৎই নতুন করে নিবেদিতার মনকে আলোড়িত করল। তাই কেমন একটা নির্বাক স্তব্ধতায় কয়েকটা মুহূর্ত তাকে আচ্ছন্নকরে রেখে ছিল। মঞ্চে উঠতেই ঘোর ঘোর ভাবটা কেটে গেল। ভাষণ দিতে উঠে স্বামীজির স্বদেশী আবেগকে মাথায় রেখে নিবেদিতা বলল, আপনাদের আদর-আপ্যায়ন ও আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। ভারতের মানুষের কাছে এত আদর, ভালোবাসা, আপ্যায়ন আগে পাইনি।

তাই এক অনাস্বাদিত আনন্দে পরিতৃপ্তিতে আমার ভেতরটা শূন্যকুম্ভের মত ভরে উঠছে। ভারতকে বড় আপনার মনে হচ্ছে। এই দেশের মানুষের ভালো-মন্দের সঙ্গে আমার ভাগ্যও জড়িয়ে আছে। আজ আমার সব সমাদরের কেন্দ্রে আছে আমার গুরু বিবেকানন্দ। তিনি এখন কাশীতে। কাশীর একটি ঘরে বিশ্বনাথের মন্দিরের দিকে চেয়ে বসে আছেন। ওই চোখ দুটি পৃথিবীব কোনো কিছুই দেখছে না। অসীম যিনি বিশ্বনিখিলের মধ্যে স্বরাট হয়ে আছেন তাঁর কাছে সমস্ত প্রাণমন সমর্পণ করে বিভোর হয়ে গুনগুন করে গাইছেন অনলে অনিলে, জলে, মধুপ্রবাহিনী চলে, বলে মধুরং মধুরং।

বলতে বাধা নেই, গুরুর মধ্য দিয়ে আমার ভারতদর্শন সম্পূর্ণ হয়েছে। গুরুই আমার ভারতবর্ষ। তাঁর কাছ থেকে আমি ভালোবাসতে শিখেছি। গুরুর দেশকে ভালোবেসে তার জন্য প্রাণ দেবার প্রেরণা পেয়েছি। আমার সামনে এখন সুদীর্ঘ এক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হবে। সম্ভবত পরাজয়ের পথ ধরে সাফল্যের দিকে এগোতে হবে। আমার কাজ একটি ভাব সৃষ্টি করা এবং সে ভাব স্বামীজির। ব্যর্থতা বা সফলতা যাই আসুক আমি যেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে স্বামীজির কাজ করে যেতে পারি। যিনি ভারতকে বলেছেন, ওঠো, জাগো, নিজেকে আবিষ্কার কর, শক্তি ধরো, নিজেকে শৃঙ্খলমুক্ত কর, জগৎসভায় তার শূন্য আসন পূর্ণ কর দীপ্ত তেজে। ভুলে যেও না প্রত্যেকের মধ্যেই লুকোনো আছে জগৎ আলোড়নকারী শক্তি। নিজের মধ্যে তাকে জাগাতে হয় শুধু।

ভারতের কোটি কোটি মানুষের মুখে লেখা রয়েছে পরাধীনতার জ্বালা, বেদনা, অপমান। এদেশের দুঃখ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা সব কিছুর মূলে রয়েছে শোষক ইংরেজের দেড়শো বছরের অপকর্মের বোঝা। একটা ইস্কুল খুলে, কয়েকটা মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে অবস্থার একটা বিশেষ পরিবর্তন আনা যাবে না। মূল সমস্যার গায়ে একটি আঁচড়ও কাটা যাবে না। বেদান্ত চর্চায় কিংবা হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান প্রচেষ্টার পথ ধরে ভারতকে স্বাধীন করা যাবে না। তলোয়ার, বন্দুক, কামান গোলা বারুদে সশস্ত্র শাসক শ্রেণীকে উৎখাত করার জন্য শক্তির উপাসনা করতে হবে। ভারতের ইতিহাক পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব হিন্দুদের যুদ্ধ ক্ষমতার কোনো ইতিহাস নেই। দীর্ঘকাল তারা অস্ত্র ধরতে ভুলে গেছে। শিক্ষিত লোকেরাও ইংরেজদের দেবতার মত অপরাজেয় ভেবে বন্দনা করে। মুসলমানেরা লড়াকু জাত হলেও তারা অনেককাল নিরস্ত্র ও অবদমিত। এ অবস্থার অবসানের জন্য চাই রাজনৈতিক স্বাধিকার। বিদেশি শাসকদের দূর করে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনই প্রথম ও প্রধান কাজ।

পরাধীন দেশ বলে ভারতকে পৃথিবীর অন্যদেশগুলি কত অবজ্ঞা করে ভারতীয়রা তা জানে না। জানলেও স্বাধীনতার অর্থ বোঝে না। বহু বছর ধরে পরাধীনতার অপমান সইতে সইতে স্বাধীনতার স্বাদই ভুলে গেছে। এরকম একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা উল্লেখ

করছি। ব্রাহ্মধর্মের নেতা বিপিনচন্দ্র পাল একজন বড় বাগ্মী। একেশ্বরবাদ প্রচার করতে তিনি নিউইয়র্কে গিয়েছিলেন। শ্রোতাদের চিত্ত উদ্দীপিত করার মত একটা দীর্ঘ বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতা শেষ হবার পরে একজিন সৌম্যদর্শন আমেরিকান তাঁর কাঁধে হাত রেখে তারিফ করে বললেন, মশাই, আপনি বৃথাই অরণ্যে রোদন করছেন। আপনার আইডেন্টিটি কি? একটা পরাধীন দেশের মানুষ বৈ তো কিছু নয়। ইংরেজের দাসত্ব করে যাদের দিন পোহায় তার মুখে ধর্মের বড় বড় কথা শুনবে কে? তার গুরুত্বই বা কি? আমেরিকানরা ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে স্বাধীন হয়েছে। তারা মনে করে আপনাদের যেটা আসল কাজ সেটাই করছেন না। আগে আপনার দেশ স্বাধীন হোক, তারপরে এসব তত্ত্বকথা শোনাতে আসবেন। তখন লোকে ধৈর্য ধরে আপনার কথা শুনবে এবং গুরুত্ব দেবে।

ঐ আমেরিকানকে আপনাদের অত্যন্ত অভদ্র, অমার্জিত মনে হতে পারে। কিন্তু উনি অত্যন্ত শিষ্টভাবে প্রকৃত সত্য কথাটা বলে বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে আমাদেরও চোখ খুলে দিলেন। সত্যি তো পরাধীন মানুষের মুখে বড় বড় আদর্শের কথা মানায় না।

আমার গুরু কিন্তু পরাধীন মানুষের এই অপমান, অসম্মান সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তাই তিনি বলতেন আমি সবচেয়ে পছন্দ করি ফুটবল খেলা। তার কারণ তাতে লাথির বদলে লাথি দেওয়া যায়। অর্থাৎ আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাতে বিশ্বাসী। ইংরেজকে আঘাত হেনে তাকে বিদেশের মাটি থেকে হঠাতে হবে।

বলতে বলতে ভাবাবেগে নিবেদিতার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। সভাকক্ষ নিস্তব্ধ। সূচীপতনের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়। নিবেদিতা নির্নিমেষ নয়নে দেয়ালে টাঙানো একটা ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, এবার কিছুক্ষণের জন্য বাহ্যদৃষ্টি বন্ধ করে মানসচক্ষে ভারতমাতার চরণ দর্শন করে প্রণতি জানান। তাহলে দেখবেন মা মাটি মানুষ এক হয়ে গেছে আপনার ভাবনায়। আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলুন বন্দেমাতরম্। আপনারা সর্বক্ষণ জপ করবেন ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, মা, মা মা।

কাগজে কাগজে নিবেদিতার বক্তৃতা ছাপা হল। দাবানলের মত সমগ্র ভারতভূমিতে ছড়িয়ে পড়ল। সেই সময় বিবেকানন্দ হাঁফানি ও ডায়াবেটিসে কষ্টভোগ করছিলেন বলে শিষ্যরা জোর করে বিশ্রামের জন্য কাশীতে পাঠিয়েছিল। মাদ্রাজের খবর কাগজে প্রকাশিত নিবেদিতার বক্তৃতা ক্লিপ করে ম্যাকলাউড বিবেকানন্দকে যথাসময়ে পাঠিয়ে দিল। ক'দিন বাদে কোলকাতার খবর কাগজেও সে সংবাদ ছাপা হল। স্বামীজি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ভাষণের প্রতিটি শব্দ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেন। একবার নয় বহুবার। পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দিল তাঁর। কাগজগুলো পর্যন্ত মন্তব্য করেছে একজন

বিদেশিনী হয়ে নিবেদিতা গোখরো সাপের মত ইংরেজ শাসককে ছোবল দিয়ে বিবেকানন্দের স্বদেশিয়ানা প্রচারে নেমেছে। ইংলন্ড থেকে বিপ্লব, বিদ্রোহের দীপবর্তিকা নিয়ে ফিরেছে। শিষ্যার কৃতিত্বে ভীষণ খুশি হলেন বিবেকানন্দ। মার্গারেটের জয়কে নিজের জয় মনে হল। মার্গারেটকে চিনতে তাঁর এতটুকু ভুল হয়নি। তার জীবন্ত অনুভবে দেশমাতা যেন মাহাসমরের দশপ্রহরণধারিণী দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা হয়েছেন। কথাটা এভাবে মনে হতে বুকখানা গর্বে ফুলে উঠল।

জীবন্ত সৃষ্টির তপস্যায় মেতে ওঠার সংকল্প নিয়ে যেন মার্গারেট ইউরোপ থেকে ফিরেছে। মাদ্রাজের ভাষণ তারই সূচনা পর্ব। শোষক ইংরেজ দেড়শ'বছর ধরে যে সব অপশাসন, দুষ্কর্ম, অনাচার এবং পাপ করেছে তার বিষ একা গলাধঃকরণ করে মার্গারেটের নীলকণ্ঠ হতে চাওয়ার ভেতর অভিনবত্ব আছে। এই ভালোবাসা এবং আত্মদান যে তার গুরুদক্ষিণা আর কেউ না জানলেও তিনি জানেন। খুব গভীর করেই অনুভব করেন তার নীরব প্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত তাঁর বুকেও বয়ে যায়। এটা যার বোঝার সে ঠিকই বোঝে আপনা থেকে।

মার্গারেটের ভেতরে যে আগুন আছে প্রথম দেখাতেই টের পেয়েছিলেন। তাঁর দেখার মধ্যে কোনো ভুল ছিল না। তার চেহারা, কথাবার্তা, নীল চোখের দৃষ্টি, পা ফেলার ভঙ্গি সবকিছুর মধ্যে এমন একটা অনির্বচনীয় বিশেষত্ব ছিল যা তাঁর সমস্ত নজর কেড়ে নিয়েছিল। মন তো আলোর চেয়ে অনেক বেগে দৌড়য়—উভয়ের মনও সেই মুহূর্তে দু'জন দুজনকে গভীর করে চিনেছিল। মানুষ যেহেতু দেবতা নয়, কোনো মানুষই নয় তাই প্রত্যেক ভারসাম্যসম্পন্ন অতি বিচক্ষণ এবং সুস্থমস্তিষ্কের মানুষেরও কিছু কিছু দুর্বোধ্য দুর্বলতা থাকেই। থাকে গভীর ভালোবাসায় সিঞ্চিত এক জ্বালাধরা অনুভূতি। মানব-মানবীর কামনা-বাসনায় নয় এক নিরুচ্চার ভালোবাসা এবং সম্পর্কের নীরব স্বীকৃতিতে যতক্ষণ তার আবেশটুকু মনে লেগে থাকে এক অপার্থিব সুখ গভীরবোধে ভরে থাকে ভেতরটা। সে সুখ ও তৃপ্তির উষ্ণতায় কোনো কামনা নেই, হতাশা নেই, উল্লাস উত্তেজনা নেই, দাহ নেই। আছে অমৃতের স্বাদ। সবাই কি তা পায়! কে জানে? এরই নাম কি স্বর্গীয় ভালোবাসা?

নিবেদিতার কাছে বিবেকানন্দের প্রত্যাশা অনেক। তাই সন্ন্যাসীর দীক্ষা না দিয়ে তাকে ব্রহ্মচর্যপালন করতে বলেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তের যে কোনো ভুল ছিল না নিবেদিতা তা প্রমাণ করল। বীর্যবান, নির্ভীক, সংগ্রামদৃপ্ত পৌরুষের আজ বড় বেশি দরকার। দেশের স্বাধীনতা যজ্ঞে তাদের বেশি করে অংশ নিতে বলেছেন। মাদ্রাজের ভাষণ কার্যত তারই প্রতিশ্রুতি বহন করছে। স্বদেশের কার্যে নিবেদিতা যে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করছে কোথাও অস্পষ্ট নেই তা। ভারতবাসীর একজন হয়ে তাদের সঙ্গে একত্রে সংগ্রামে অংশ নেওয়ার প্রস্তাব যে ইংরেজ বিদ্রোহের নামান্তর তা জেনেও মধ্যপথে থামল না নিবেদিতা। ভারতের জন্য প্রাণ দিতে এসেছে সে। নেতাগিরি কিংবা

গুরুগিরির ইচ্ছে তার মনে নেই। তার একমাত্র লক্ষ্য পরাধীনতার নাগপাশ থেকে ভারতকে মুক্ত করা। রণরঙ্গিণী মূর্তিতে ইংলন্ড থেকে সে ভারতে এসেছে। সুতরাং বিপ্লবের যে দেরি নেই বারাণসীতে বসেই তার আঁচ পেলেন বিবেকানন্দ। নিবেদিতা যথার্থই তাঁর সার্থক উত্তরসূরি। সংগ্রামই তার জীবনের একমাত্র মন্ত্র। লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত থামবে না। নিবেদিতার কথা শুনে যদি সন্ন্যাসের দীক্ষা দিতেন তাকে তাহলে একটা বিরাট শক্তির অপমৃত্যু হত। এখন মনে হচ্ছে, নিবেদিতা তাঁর স্বপ্নের ভারতভূমিকে বৃটিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একদিন তাঁকে গুরুদক্ষিণা দেবে। গুরুর অন্তরে একান্ত করে চাওয়া পৃথিবীটা নিবেদিতার মত বেশি কেউ জানে না বলেই সন্ন্যাসীর মধ্যে লুকোনো লড়াকু বিপ্লবীকে মরমী অনুভূতি দিয়ে নিবেদিতা ঠিক আবিষ্কার করেছিল।

নিবেদিতার সাফল্যের তৃপ্তিতে তাঁর মন আচ্ছন্ন রইল। বিবেকানন্দের নিজের চোখ নিজের দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে পর্যবেক্ষণ করছে যেন নিজেকে। আর মিট মিট করে হাসছেন নিজের মনে। কী সুন্দর সেই অনুভূতি।

।। সাত ।।

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মাদ্রাজ থেকে কোলকাতায় এল নিবেদিতা। স্বামীজি তখন বাংলার বাইরে। অসুস্থতার কারণে কাশীতে গোপাল শীলের বাগানবাড়িতে অবস্থান করছেন। শ্রীমা সারদা জয়রামবাটিতে আছেন। এমতাবস্থায় নিবেদিতা কোলকাতায় কোথায় উঠবে, ভেবে পেল না। আগে থেকে থাকার কোনো বন্দোবস্ত করা ছিল না। বাগবাজারে ১৬ বোসপাড়া লেনের বাড়িটিও খালি ছিল না। বাধ্য হয়েই নিবেদিতাকে সাহেবপাড়ায় আশ্রয় নিতে হল। আমেরিকার কনসালের স্ত্রী মিসেস প্যাটারসন ছিল তার বান্ধবী এবং স্বামীজির অনুরাগিণী। নিবেদিতা তাঁদের চৌরঙ্গী ম্যানসনেই উঠল। সেই সময় মিসেস বুলও সেখানে ছিলেন। নিবেদিতা তাঁর সঙ্গেই রইলেন।

অল্প কয়েকদিনের ভিতর বাগবাজার বোসপাড়া লেনে বাড়ি পাওয়া গেল। আগে যে বাড়িতে থাকত তার পরের ১৭নং বাড়িতে নিবেদিতার থাকার বন্দোবস্ত হল। ৯ ফেব্রুয়ারি নিবেদিতা তার জিনিসপত্তর নিয়ে সেখানে উঠে এল। চেনা জায়গায় ফিরে আসতে পেরে স্বস্তিবোধ করল। মনে হল, অনেককাল পরে স্বগৃহে ফিরল। দীর্ঘকাল প্রবাসে কাটিয়ে স্বদেশে ফিরলে যে আনন্দ হয় সেরূপ আনন্দ হতে লাগল। পুরনো বাসিন্দারা তাদের মেমদিদিকে পেয়ে ভীষণ খুশি হল।

খবর কাগজের পাতায় নিবেদিতার আগমনের সংবাদ শুধু ছাপা হল না, মাদ্রাজে তার বিপুল সম্বর্ধনা এবং ভাষণের খবরও প্রকাশিত হল। এই সংবাদ নিবেদিতাকে বাগবাজারে রাতারাতি বিখ্যাত করল। পল্লীবাসীর খুব সমাদর লাভ করল। প্রত্যেক মানুষকে তার নিজের পরিচয় নিজে তৈরি করতে হয়। বিবেকানন্দের এই কথাটা যে কত সত্য নতুন করে তা অনুভব করল নিবেদিতা। কার্যত তার বিদেশিনী পরিচয়টা মুছে গেল। তার সঙ্গে আগের দূরত্বও হ্রাস পেল। সে তাদের দুঃখের বন্ধু। তাদের একজন পড়শী। পাড়ার একজন নাগরিক। পাড়া-পড়শীর মনোভাবটাই একেবারে বদলে গেল। চতুর্দিকের সব কিছুকে আপন জেনে উৎফুল্ল হল নিবেদিতা। কটা দিন পূর্ব পরিচিতদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখা-সাক্ষাৎ করল। কামারহাটিতে গিয়ে গোপালের মার সঙ্গে দেখা করতেও ভুলল না।

মাত্র কটা দিন অবকাশ, তারপরেই কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সামনেই ᠄ পুজো। হাতে তৈরি বালিকা বিদ্যালয়টি ইংলন্ডে যাওয়ার জন্য দীর্ঘকাল বন্ধ ছিল. ‥ণা বন্দনার শুভ দিনে বিদ্যালয়টি পুনরায় চালু করার ইচ্ছে নিয়ে কাশীতে স্বামীজিকে চিঠি দিল। সম্মতি এল ফেরত ডাকে, সেই সঙ্গে গুরুর শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ। সমারোহে দেবী ভারতীর পূজো উদ্‌যাপন করে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের কার্যারম্ভ করল।

এবার সে একা। প্রিয় ছাত্রী সন্তোষিণী নেই তার পাশে। ছাত্রী সংগ্রহ থেকে বিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজ কর্ম, অর্থ সংগ্রহ করা সবই এক হাতে করতে হয় তাকে। শিক্ষকতার পাশাপাশি গ্রন্থ রচনা করতে হয়, প্রবন্ধ লিখতে হয়, বিবিধ ভাষণ প্রস্তুত করতে হয়, সভা-সমিতিতে যেতে হয়। অতিথি এবং অভিভাবকদের জন্য সময় দিতে হয়। সর্বক্ষণ ব্যস্ততার মধ্যে থাকে। দিনটা কোথা দিয়ে কিভাবে যে কেটে যায় টেরই পায় না। অথচ, আড়াই বছর আগে এই সময় তার বুকে পাষাণের মত চেপে বসেছিল। আর এখন তার কোনোদিকে তাকানোর সময় নেই। একটু কাজ করার জন্য কী ব্যাকুলতাই না ছিল তার। পরিবর্তে জুটেছিল নিদারুণ অবহেলা, প্রত্যাখ্যান, ঘৃণা আর চরম অপমান। সেই দিনগুলির কথা মনে হলে চোখ ভরে জল নামে। মাত্র আড়াই বছর পরে পুরো চিত্রটা একেবারে বদলে গেছে। ঐদিনের কথা মনে রেখেই হয়তো গুরুজি বলেছিলেন, মার্গট তুমি স্বাধীন। তোমার পছন্দ-অপছন্দ নিজের। তোমার কাজও তাই। আমি আর কেউ নই। তোমাকে কোনো নির্দেশ দেবারও নেই আমার। শুধু এই জানি, যতদিন প্রাণ ঢেলে মায়ের কাজ করবে তিনিই তোমায় চালিয়ে নেবেন। দূরাগত বাণীর মত কানের মধ্যে অনুরণিত হতে লাগল তাঁর কথাগুলো।

হঠাৎই অভিমানের সমুদ্র উথলে উঠল বুকের ভেতর। স্বামীজি নিষ্ঠুরের মত তার সঙ্গে এতদিনের মধুর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন কী করে? এই দুঃখে ভীষণ কেঁদেছিল সে। কিন্তু তার কান্না দেখার সেই-মানুষটি রইল মুখ ফিরিয়ে।

ব্রিটানিয়া থেকে যেদিন ইংলন্ডে যাবে তার আগের রাতে নিবেদিতাকে একান্তে কাছে ডেকে শান্তভাবে সস্নেহে বললেন, বোকা মেয়ে, এত বোঝ এটুকু বোঝ না, আমার ব্যক্তিত্বের পাশে মিট-মিট করবে তোমার ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিভা। তোমার সঙ্গে আমি থাকলে তুমি কোনো আলাদা সম্মান পাবে না, স্বীকৃতি পাবে না। তোমার ব্যক্তিত্ব তোমার নিজের মত গড়ে উঠবে না কোনোদিন। তোমারও মনে হবে আমার কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া, আমার সম্মতি ছাড়া তোমার কোনো পথ নেই। নিজেকে তখন বড় হতভাগ্য মনে হবে। প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ কর্মীরা তাই একটা সময় এলে দূরে সরে থাকেন। আমাকে ছাড়াও যে তুমি বিরাট কিছু, এই উপলব্ধির জন্য তোমার কাছ থেকে আমাকে সরে যেতে হবে। এখন থেকে আমি তোমার কেউ নই। আমার যা শক্তি ছিল তোমাকে দিয়ে রিক্ত হয়ে গেছি। আমি এখন শুধু সন্ন্যাসী।

খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, কিন্তু কথাগুলি ভীষণভাবে সত্যি। গুরু তাকে ছেড়ে গেছেন বলেই তাঁর প্রতি আর কোনো নির্ভরতা নেই। নেই কোনো অপেক্ষা। তার কাজের সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হবে। এই বোধে সে সতর্ক এবং সচেতন। মাঝে মাঝে বড় একা লাগে, তখন আর কাউকে নয়, বিশ্বনিয়ন্তা মাকেই মনে মনে শুধোয় মা গো, যে ব্রতে আমায় ব্রতী করতে চাও তুমি, তা কি আমাকেই বেছে নিতে হবে? গুরু আমায় ত্যাগ করেছেন। আমার সব বুদ্ধি-বিবেচনা তোমার পায়েই সঁপে দিলাম। তুমিই সব।

পরম নিশ্চিন্তে তাই কাজের মধ্যে সর্বক্ষণ ডুবে রইল। খবরটা রটে যেতে দেরি হল না। নিবেদিতার কাজ-কর্মের টানে বহু মনীষী, চিন্তাবিদ, জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত, সামাজিক কর্মী, রাজনৈতিক নেতা ১৭ বোসপাড়া লেনে যাওয়া-আসা করতে লাগল। খবর কাগজের পাতায়, বিবিধ সাময়িকীতে নিবেদিতার নাম, তার লেখা এবং তার সম্পর্কিত লেখালেখি তাকে বিখ্যাত করে তুলল। এবার তার কাজকর্মে কোনো সামাজিক প্রতিরোধ কিংবা বাধা আসেনি। প্রত্যাখ্যান কিংবা অপমানের মর্মযন্ত্রণাও ভোগ করতে হয়নি। কাজ করার একটা পরিবেশ পেয়েছিল। নিজের চারপাশে নিশ্চিত আশ্বাসের এই পরিবেশ কার্যত তার গুরুরই সৃষ্টি। কাজের যে পরিবেশটি মনে মনে চেয়ে আসছিল, ভারতে যার অপেক্ষায় বসেছিল ইংলন্ড থেকে এসে তাকেই পেয়ে গেল একেবারে হাতের মুঠোয়। অসীম উৎসাহে কাজ শুরু করল নিবেদিতা। কাজে কোনো ক্লান্তি ছিল না। প্রতিমুহূর্ত গুরুর কথা মনে হয়। বান্ধবী জো'কে চিঠি লিখল, সারা জীবনে আমি যা করব, আমার গুরুর গৌরবের পাশে তা একমুঠো ছাই। আমার কর্মোন্মাদনার সব উৎস তাঁরই মাঝে। আমার গুরু ক্ষত্রিয়ের মতই নির্ভীকভাবে লড়েছেন প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে। সর্বত্র অসাধারণ তাঁর সাফল্য। তাঁর গৈরিক বস্ত্র মন্ত্রপূত কবচের মত আমাকে সুরক্ষিত রেখেছে। তাঁর দেওয়া গৈরিক বস্ত্রে লিখিত রয়েছে 'কর্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'। কী শক্তি ঠিকরে পড়ছে ঐ বস্ত্রের সর্বাঙ্গ হতে। আমার সব সাফল্যের মূলে রয়েছে তাঁর শুভেচ্ছা। একথাটা ভুলতে পারি না। আমার সমস্ত কাজের মধ্যে তিনি আছেন, ভীষণভাবে আছেন। খুশিতে আমার হৃদয় তখন গান গেয়ে ওঠে। মনে মনে বলি, হে আমার গুরু, রাজা আমার, পিতা আমার তোমার জয় হোক। তোমার করুণায়, তোমার মহিমায় পারাপার দেখি না দেবতা।

হৃদয় দেবতা কাশী থেকে পক্ষকাল পরে বেলুড়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। রামকৃষ্ণের ৬৬ বছর জন্মোৎসব পালন করতে অসুস্থ শরীর নিয়ে কাশী থেকে ফিরেছেন। তাঁর আগমন সংবাদ পাওয়া মাত্রা নিবেদিতা বেলুড়ে গেলেন গুরুকে দর্শন করতে।

মঠ স্থাপনের সময় যে পুরনো বাড়িটি সংস্কার করে তারা এককালে বসবাস করত সেই বাড়ির দোতলায় বিবেকানন্দ থাকতেন। আলো বাতাসযুক্ত বড় ঘরে তিনটি দরজা

এবং চারটি জানলা দিয়ে হু-হু করে গঙ্গার হাওয়া বইছে সব সময়। নিবেদিতা ঘরে ঢুকে দেখল গঙ্গার দিকে মুখ করে বিবেকানন্দ বসে আছেন। দুচোখে তাঁর কী গভীর তন্ময়তা। নিজের স্বপ্নে যেন বিভোর হয়ে আছেন। ঢুলু ঢুলু রোগক্লান্ত চোখ দুটো প্রদোষের নীল আকাশে অস্তমান সূর্যের দিকে নিবদ্ধ। নিবেদিতা পা টিপে টিপে নিঃশব্দে তার সামনে দাঁড়াল।

অনেককাল পরে রাজাকে দেখল। কিন্তু একী হাল হয়েছে রাজার। তাঁকে দেখামাত্র বুকের ভেতর বেদনার সমুদ্র উথাল-পাথাল করে উঠল যেন। রাজার কোনো ভাবান্তর নেই। তবু ভেতরটা তাঁর খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত ছাড়া ছাড়া গলায় স্বামীজি বললেন, আমার মন বলছিল আজ তুমি আসবেই। তারপর ক'টা মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, আমার কাছে বস। অনেক বদলে গেছ! স্কুল শুরু করেছ?

কী মিষ্টি, কী মধুর তাঁর কণ্ঠস্বর। মুহূর্তে তার সমস্ত চেতনার ভেতর মধুর একটা আবেশ ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তার অধিক উদ্বেগে নিবেদিতার বুকটা হু-হু করে উঠল। উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় বলল, একী চেহারা হয়েছে আপনার!

শিষ্যার চোখে চোখ রেখে হাসল। এক আশ্চর্য মজার হাসি। নিজেকে নিয়েই তাঁর কৌতুক যেন। তাতেই নিবেদিতার সব কষ্ট গলে জল হয়ে গেল। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গিয়ে স্বামীজির চরণপদ্মে মাথা রাখল। ভক্ত যেমন ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে ঈশ্বরকে প্রণাম জানায় তেমনি করে নিবেদিতা গুরুর চরণে মাথা রেখে নিশ্চল হয়ে রইল। মনে হল সে শুধু প্রণাম করছিল না, নিজের সর্বস্ব তাঁর পায়ে নিবেদন করে এক অনির্বচনীয় সুখে ও পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠতে লাগল। যতক্ষণ পর্যন্ত গুরু তাকে না ওঠালেন ততক্ষণ পা দুটো জড়িয়ে পড়েছিল।

জলভরা দুটো চোখের করুণ দৃষ্টি মেলে ধরল তাঁর মুখের ওপর। বলল, আপনার এ অবস্থার জন্য নিজেকে অপরাধী মনে হয়। আপনার সঙ্গে দেখা না হলে বোধ হয় এত কষ্ট আমাকে বয়ে বেড়াতে হতো না।

সস্নেহে স্বামীজি বললেন, পাগলীর কথা শোন। রোগের দোষ কী, একদিন এই শরীরের ওপর অনেক জুলুম করেছি। অবিচার করেছি, অত্যাচারও কম করিনি, আজ তো তার গুনগারি দিতে হবে। এজন্য তুমি কেন মনস্তাপ করবে। তোমার দোষ কোথায়?

আছে। আপনি জানেন না। শিষ্যা হয়ে গুরুর সেবা করতে পারলাম কৈ? এর মত অপরাধ হয়?

বিবেকানন্দ স্মিত হাসল। সেই সঙ্গে তাঁর প্রশান্ত দুটি চোখও হেসে উঠল। মধুর কণ্ঠে বললেন, সেবার কোনো ত্রুটি ছিল না। প্রকৃতির নিয়মে যা হওয়ার তা হয়েছে। আমার গুরুর গলার অসুখ সারানোর জন্য কত কী করলাম আমি। তবু পারলাম কি তাঁর কষ্টের উপশম করতে? ঠাকুর বলতেন, আমরা যা কিছু ভোগ করি তার জন্য

আমরাই দায়ী, আর কেউ নয়। কার্য কারণ দুই-ই আমার।

নিবেদিতা গুরুর পায়ের কাছে বসে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, পা দুটো এত ফুলল কেন? দু'এক জায়গায় হাত লাগতে মনে হচ্ছে পেশীর মধ্যে দিয়ে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল। অঙ্গের কোনো কোনো অংশে এরকম অনুভূতি প্রবল হল কেন?

কী করে বলব? শরীরও দুর্বল হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। ডাক্তার বৈদ্য দেখাচ্ছি। ওষুধ পত্তর নিয়মিত খাচ্ছি। ডাক্তারের কথা শুনে মিষ্টি, নুন ত্যাগ করেছি। এমন কি জল পর্যন্ত। তবু ব্যামোকে বশে আনতে পারছি কৈ? এসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার কিছু নেই। দেহটা রোগের মুখোশ। রোগ যা হুকুম করে দেহ তা মানতে বাধ্য। দেহ থাকলেই ব্যাধি থাকবে। কিন্তু মনটা ব্যাধির বাধ্য নয়, দাসও নয়। দুরারোগ্য ক্যানসারের দুঃসহ কষ্টকে আমার গুরু কত সহজে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। মুখের হাসিটি কখনও মলিন হয়নি। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নিজের সঙ্গে কী রসিকতাই না করেছিলেন।

আপনিও কম যান না। শরীরের কথা কবে শুনেছেন? অসুস্থ শরীর নিয়ে কিছুদিন আগেও মায়াবতী ও হরিদ্বার করে বেড়িয়েছেন। তাতেও ক্ষান্তি দেননি। গর্ভধারিণী মাকে নিয়ে পূর্ববঙ্গ-ঢাকা, আসাম-শিলং বেড়িয়ে এলেন। তারপর ওকাকুরার সঙ্গে বুদ্ধগয়া, সারনাথ স্তূপ দেখতে গেলেন। সেখান থেকে বেলুড় ফিরে আবার কাশীতে রওনা হলেন। অসুস্থ শরীর এত ধকল নিতে পারবে কেন! সকলের চোখে নিজেকে সুস্থ প্রমাণ করার জন্য নিজের খুশিতে যা খুশি করছেন। নিজের কথা ভাবার আপনার দরকার নেই। কিন্তু যারা আপনাকে আশ্রয় করে বেঁচে আছে, আপনার জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে পারে, তাদের কথাটা তো একটু ভাববেন। তাদের আপনি ছাড়া যে কেউ নেই। অন্তত তাদের কারো একজনের কথা মনে রেখে আপনার শরীরের যত্ন নেওয়া উচিত। দয়া করে এভাবে কাঁদাবেন না তাকে। ঈশ্বর আপনাকে নিষ্ঠুর করে গড়েছেন। নিষ্ঠুর না হলে নিজের কথা ভাবে কেউ? আমার যা কিছু আনন্দ উত্তেজনা তা শুধু আপনাকে ঘিরেই। আপনার দেশকে, ধর্মকে, দেশের মাটি, মানুষ, আকাশ, বাতাস, ধুলোর গন্ধ, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত সব কিছুকে আপনার মত বড় ভালোবাসি। সে কথাটা যদি আপনি ভুলে থাকেন তা হলে আমার নিজের বলে কী রইল?

শিষ্যার অনুযোগে স্বামীজি দুটি উজ্জ্বল চোখ মেলে অনিমেষ তাকিয়ে রইলেন। অধরে মৃদু মৃদু হাসি। উপভোগের আলোতে আভাসিত হয়ে তির তির করে প্রদীপশিখার মত কাঁপছিল ওষ্ঠদ্বয়ের ফাঁকে।

গুরুর চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নিবেদিতার অধরে বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল। রাগ দেখিয়ে বলল, পারেনও বটে। নিজের সঙ্গে এমনই মজা করেন, যেন কিছুই হয়নি আপনার। মন কতখানি গভীরতায় প্রশান্ত থাকলে তবেই মানুষ এরকম নির্বিকার হতে পারে। কথাগুলোর বলার সময় নিবেদিতার গলার স্বর কেঁপে গেল, মুখের ভাবও পাল্টে গেল। নিজের কাছে নিজে ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জায় মাথা হেঁট

করল।

কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কাটার পর নিবেদিতা বলল, এবার উঠব। আমি থাকলেই কথা হবে। আপনার কথা বলা মানা।

স্বামীজি বললেন, অনেকদিন পর এলে। এর মধ্যে যাবে? মাত্র পনেরো-কুড়ি মিনিট তো হয়েছে।

তা হোক। থাকতে আমারও খুব ইচ্ছে হয়। কিন্তু তার জন্য অনেক মূল্য দিতে হবে আপনাকে। কিন্তু আমার বিবেক মন আপনার জন্য সর্বক্ষণ চিন্তা করে। বড় উদ্বেগে থাকি। তা-ছাড়া চিকিৎসকের নির্দেশ মানাটা অসুস্থ মানুষের বেঁচে থাকার একটি অত্যন্ত জরুরী শর্ত। এটা মরে গেলেও ভাঙতে পারব না আমি। প্লিজ্। আপনার কথা যদি শুনি তাহলে উই হ্যাভ টু রিপেন্ট ফর দ্যা কন্সিকোয়েন্সস।

বিবেকানন্দ একটিপ নস্যি নিলেন মাথা পরিষ্কার করতে। বললেন, আই অ্যাম সো হ্যাপি দ্যাট ইউ আর ভেরি রিজনেবল্। থ্যাঙ্ক উ্য। তুমি হয়তো শোননি আমি শীঘ্রী চলে যাচ্ছি।

এরকম একটা অপ্রত্যাশিত সংবাদে নিবেদিতাকে বিচলিত করল। কথাটা তীরের মত বুকের খাঁচায় বিঁধল। উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠা ভরা দুচোখে স্বামীজির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, এই শরীর নিয়ে আবার কোথায় যাচ্ছেন? অসুস্থ শরীর নিয়ে এখানে ওখানে ছোটাছুটি করতে ভালো লাগে?

উত্তরে নিবেদিতার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, চিকাগো শহরের মত একটা বিরাট ধর্মসভা হবে জাপানে। এশিয়ার সব দেশ থেকে বক্তারা আসবেন। সেখানকার আমন্ত্রণ নিয়ে জাপানি বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষ মিঃ ওডা এবং জাপানি শিল্পী মিঃ ওকাকুরা এসেছেন ভারতে। আমাকে তাঁরা বক্তা হিসেবে চান। এতবড় একটা ধর্মসভায় যোগদানের ইচ্ছে ত্যাগ করা যায়?

নিবেদিতা খুশির বদলে বিরক্ত হয়ে বলল, আশ্চর্য মানুষ বটে। সন্ন্যাসীর এত নামের মোহ কেন? শরীর পারছে না তবু সেখানে যেতে হবে! ধন্য মানুষ বটে!

নিবেদিতার অভিযোগে বিবেকানন্দ একটুও দমলেন না। বললেন, কথায় বলে শরীরের নাম মহাশয়। যা সওয়াবে তাই সইবে। ও নিয়ে কিচ্ছু ভেব না।

অভিমানে নিবেদিতার গলার স্বর ভারী হল। বলল, আপনি আমার কে, যে ভাবতে যাব? আমার বয়ে-ই গেছে। কত যেন আমার কথা শোনেন? মিছে মিছে বসে মুখ ব্যথা করতে যাব কেন? কথায় বলে, পাগলও নিজের ভালো বোঝে। আপনি পাগলেরও বাড়া।

বিবেকানন্দের অধরে কৌতুক হাসি। বললেন, ঠিক বলেছ। পাগলের চেয়ে এক গ্রেড উপরে। যাকে বলে শ্যায়না পাগল।

মুখ ঝামটা দিয়ে নিবেদিতা বলল, আর মশ্করা করতে হবে না। আপনি যতই লঘু

করার চেষ্টা করুন না কেন, ব্যাপারটা মোটেই তুচ্ছ করার নয়। চোখে মুখে যে ক্লান্তির পড়েছে কী দিয়ে ঢাকবেন তাকে? ভালো করে হাঁটাচলা পর্যন্ত করতে পারেন না। একটুতেই হাঁপিয়ে পড়েন। সামান্য পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট হয়। অনাবশ্যক টেনশনও আপনার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। এতৎসত্ত্বেও আপনি জাপানে যাওয়ার কথা ভাবছেন। দিগ্বিজয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। আশ্চর্য মানুষ বটে। যাই হোক জাপানে যাওয়ার এখনও অনেক দেরি আছে। যখন যাবেন তখন ভাবা যাবে। এখন আর কথা নয়। অনেক কথা বলেছি। এবার উঠব। বাগবাজারে ফিরতে আমার রাত হয়ে যাবে।

।। আট ।।

ইংলন্ডে থাকতে নিবেদিতা ম্যাকলাউডের যেসব চিঠি পেত তাতে জাপানের বিশিষ্ট সাংস্কৃতির কর্মী, চিত্রশিল্পী এবং প্রাচ্য ধর্ম মহাসম্মেলনের দূত ওকাকুরা সম্পর্কে অনেক সংবাদ থাকত। ম্যাকলাউডের চিঠি থেকে সে জেনেছিল ওকাকুরা একজন স্বাধীনতার প্রবক্তা। এই মানুষটির সংস্পর্শে এসে ম্যাকলাউডের মনে বিশ্বাস জন্মেছিল যে এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত বৃটিশ শাসিত ঔপনিবেশিক ভূখণ্ডগুলির মধ্যে এক রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন হওয়া কোনো অসম্ভব ঘটনা নয়। জনগণ আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে এশিয়ার বৃটিশ শাসিত সব দেশ ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। জো'র কাছ থেকে পাওয়া এরকম একটা সংবাদ তার আইরিশ রক্তের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিল। নিবেদিতার মন বিপ্লব চিন্তায় অস্থির হল। ইংলন্ডে থাকা তার কাছে নিরর্থক বোধ হল। ভারতে ফেরার জন্য মন চঞ্চল হল।

বাস্তববুদ্ধি দিয়ে নিবেদিতা বুঝল ভারতের জন্য সর্বাগ্রে যা দরকার তা হল রাজনৈতিক বিপ্লব। ধর্মবিপ্লবের পথে এই বিপ্লবের জোয়ার আসবে না। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লে তবেই মরা হাড়ে ভেল্কি লাগবে। জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাবে। আস্তে আস্তে চোখ মেলবে। নিজেকে দেখতে শিখবে। আত্মমর্যাদাবোধ জাগবে। কথাগুলো মনে হতেই নিবেদিতার ভেতরটা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। ব্যাপারটা তখন আর এখানে থেমে থাকবে না। ঢিল ছোড়া হলেই তবে বোঝা যাবে কী কী হতে পারে। সব বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে সাধারণভাবে যা যা হয়ে থাকে নিবেদিতা তার সম্ভাব্য দিকগুলো নিয়ে ভাবল। একবার এ দেশবাসী ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালে এশিয়ার অন্যান্য দেশ সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। ওকাকুরা সেই বার্তা নিয়ে সুদূর জাপান থেকে ভারতে আসছেন। তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তোলার জন্য নিবেদিতার আইরিশ রক্তে দুর্বার স্বাধীনতার স্পৃহা প্রবলবেগে তাকে ভারতবর্ষের দিকে টানতে লাগল।

ওকাকুরার সঙ্গে দেখা করার জন্য নিবেদিতা উন্মুখ হয়ে ছিল। কিন্তু সে যখন কোলকাতায় এল ওকাকুরা তখন স্বামী নিরঞ্জানন্দের সঙ্গে মধ্যভারত ভ্রমণ করছিলেন। ফেব্রুয়ারির শেষে ওকাকুরা কোলকাতায় ফিরে স্বামীজিকে দর্শন করতে বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন। সেখানেই নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। প্রথম দর্শনেই ওকাকুরাকে

নিবেদিতার ভালো লাগল। বেঁটেখাটো মানুষ, সুন্দর চেহারা, টানা টানা চোখ, ধ্যাননিবিষ্ট গম্ভীর মূর্তি। একটা রাজভাব আছে তাঁর চেহারায়।

ওকাকুরা এমনি খুব গম্ভীর। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলেন না। কিন্তু নিবেদিতার সঙ্গে সেদিন অনর্গল কথা বললেন। মনে হল, দু'জন দু'জনের কাছে খুবই পরিচিত। কেবল সাক্ষাৎটুকু ছিল না। তাই সাক্ষাৎ হওয়ামাত্র তারা পরস্পরের খুব কাছের মানুষ হয়ে গেল। নিবেদিতাকে দেখেই ওকাকুরার ভেতরে একটা উথলে ওঠার ভাব হল। বলল, মিস্ ম্যাকলাউডের মুখে আপনার কথা এত শুনেছি যে আপনি আমার চেনা হয়ে গেছেন। নতুন করে আপনার সম্পর্কে কিছু শোনার নেই।

প্রত্যুত্তরে নিবেদিতা বলল, আমারও সেই এক কথা। আমাদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে কোথাও একটা মিল আছে। আমার মনে হয় এশিয়ার দেশগুলির মানুষের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার মধ্যে একটা অন্ত্যমিল আছে। সেই মিলের সূত্র ধরে ভারত ও জাপানের মধ্যে সেতুবন্ধন হওয়া কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয়।

মিস্ নোবল আপনার মত মানুষই এরকম কথা ভাবতে পারে। নিজের দেশ ও জাতির কথা ভুলে এমন অকাতরে প্রাণ দিতে পারার মত মহাপ্রাণ আমি স্বচক্ষে দেখিনি। আপনার প্রতি তাই আমার একটা বিশেষ শ্রদ্ধা আছে।

ওসব কথা বলে লজ্জা দেবেন না। আমার সব কাজের প্রেরণা আমার গুরু। আমি তাঁর ভাবের পতাকাবাহী। ওসব কথা থাকুক। ভারতের অনেক জায়গায় তো ঘুরলেন। কিন্তু ভারতকে কতটুকু জানলেন?

মিসেস নোবল ভারতবর্ষ-সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং এক মহান ঐতিহ্যশালী দেশ। এই দেশ থেকেই বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়েছে সারা পৃথিবীতে। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষে কত ধর্মের, কত দেশের মানুষ এসেছে, তাদের মিলিত ভাবধারায় পুষ্ট ও সমৃদ্ধ ভারতের শিল্প, স্থাপত্য। সর্বত্র একটা গভীর সমন্বয়ের ভাব লক্ষ্য করার মত। এক সময় ভারতে যে অনেক বড় শিল্প যুগ এসেছিল তার রেশ ভারতীয় স্থাপত্য এবং চিত্রকলা আজও ধরে রেখেছে।

নিবেদিতা প্রত্যুত্তরে বলল, কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করার মত। যেখানে শিল্পীরা হিন্দু অথবা মুসলমান, বৌদ্ধ কিংবা কোনো অঞ্চলের সেখানে প্রত্যেক শিল্পী স্ব-স্ব ধর্ম, জাতীয়তা ও সংস্কৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে তাদের শিল্পকর্মে ধরে রেখেছে। কেউ কাউকে অনুকরণ করেনি অথবা অন্যের বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্রকে চাপা দেয়নি। বরং প্রত্যেক শিল্পীই চেষ্টা করেছে নিজের রীতিতে, নিজের ঢঙে ভারতীয়ত্বে পৌঁছতে, যেখানে শিল্পীর সৃষ্টি আধ্যাত্মিকতার এবং রহস্যময়তার অসাধারণত্ব লাভ করে।

ভারতের শিল্প এখনও সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলে এটা হতে পেরেছে। তাতেও একটা ঘরানা হয়তো সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু শিল্পের মধ্যে একধরনের একঘেয়েমি এসেছে। ভারতীয় রীতির সঙ্গে একটু বিদেশী ভাবধারা মেশালে

তা একটা অন্যমাত্রা পাবে। অন্ধ অনুকরণ না করলে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য কিছুই খোয়া যাবে না। প্রাচ্যের সব দেশেই ভারতীয় শিল্পের ভাবধারা রয়েছে। বিশেষ করে ভারত থেকে গৃহীত ঐতিহ্যের অংশ এশীয় শিল্পকে সমৃদ্ধ করছে। তবু ভারত থেকে তা আলাদা। প্রত্যেকেই তা জাতীয়ভাবে পরিবর্তিত ও সমৃদ্ধ করে নিয়ে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। চীন, জাপান কোরিয়া প্রমুখ দেশগুলির বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে ভারতের বুদ্ধমূর্তির তফাত স্পষ্ট। দেবদেবীর মূর্তিতেও অনুরূপ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শিল্পরূপের সত্যতার এটাই হল রহস্য।

অভিভূত গলায় নিবেদিতা বলল, এশিয়ার সব জাতির মধ্যেই আছে ভালোবাসার ঐক্য। ভারতের সঙ্গে সমভ্রাতৃত্বের এই বন্ধনের টানেই সুদুর জাপান থেকে আপনি ছুটে এসেছেন প্রাচ্যের মহাধর্মসম্মেলনে ভারতকে শরিক করার জন্য। তাই তো আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে পরাধীন ভারতের দুরবস্থা ও দুর্দশা দেখলে নিশ্চয়ই প্রতিবেশীর প্রতি মমতায় আপনাদের বুকে ব্যথা বাজবে। শুনেছি আপনার দেশের সম্রাট তাকাকুরার বুকে অনুরূপ এক ব্যথা বেজেছিল এক শীতের রাতে। বাইরে সেদিন প্রবল তুষারপাত হচ্ছিল। সম্রাটের মনে হলো তিনি আরামে লেপের তলায় শুয়ে আছেন আর তাঁর প্রজারা শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। তৎক্ষণাৎ গা থেকে লেপ এবং বস্ত্র সরিয়ে দিয়ে তাদের মতই স্বল্প পোশাক পরলেন। এই সহানুভূতি ভারত আপনার দেশের কাছেই প্রত্যাশা করে।।

ওকাকুরা কথা খুঁজে পান না। অবাক বিস্ময়ে নিবেদিতার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকলেন। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর স্বগতোক্তি করার মত শুকনো গলায় বললেন, নৈতিক, মানবিক সহানুভূতি সমবেদনা জানানো ছাড়া আমরা আর কিই বা করতে পারি?

ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতার মাখামাখিটা বিবেকানন্দর নজর এড়াল না। নিবেদিতা এখন স্বাধীন। তার ওপর তাঁর কোনো অধিকার নেই। সব বন্ধন থেকে একেবারে মুক্ত করে দিয়েছেন তাকে। নিজের ইচ্ছেতে নিজের মত করে চলুক এটাই তো চেয়েছেন। কিন্তু ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ মেলামেশা, এখানে ওখানে যাওয়া, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেওয়া, কিংবা কোনো নিমন্ত্রণে দু'জনের উপস্থিতিটা ইদানীং বিবেকানন্দ ভালো মনে মেনে নিতে পারছেন না। নিবেদিতার জন্য তাঁর ভাবনা হয়। নিবেদিতার বয়স পঁয়ত্রিশ। তবু একটা মুহূর্ত তাঁর স্বস্তিতে কাটে না। সবসময় নিবেদিতার জন্য ভাবনা হয়। অজান্তে মেজাজটাই তিরিক্ষে হয়ে ওঠে। অকারণে সব ব্যাপারে খিট খিট করা তাঁর অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু যেদিন নিবেদিতা দেখতে আসে সেদিন ভীষণ আনন্দে এবং খুশিতে থাকেন। কেন এরকম হয়?

নিজের মনের ভেতর তার জবাব খুঁজতে খুঁজতে একটা গভীর কিছু অনুভব করেন। বুকের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট হয়। এ-কষ্টটা হাঁপানির নয়। অন্যরকম। সর্বক্ষণ জ্বালা ধরা ঈর্ষায় রিন্ রিন্ করার মত। তবে কি রাজার মনে ঈর্ষা জন্মেছে? কিন্তু তা কী করে হয়? তিনি সন্ন্যাসী। আজীবন ব্রহ্মচারী। সাধারণ মানুষের দুর্বলতার ঊর্ধ্বে। সন্ন্যাসীর ভাবাবেগ থাকলেও ঈর্ষা বিদ্বেষের মত অনিষ্টকর কোনো দুর্বলতা নেই। অন্তত তাই মনে হয় তাঁর।

তবে ওকাকুরা এসে সন্ন্যাসীর শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনের মাঝখানে একটি লোষ্ট্রপাত করে এ কোন তরঙ্গবলয় সৃষ্টি করল? এ কি সহজে থামবে না? ঐ তরঙ্গবলয় হঠাৎ তাকে জানিয়ে দিল এতকাল যাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে উপেক্ষা করেছিল সে আছে তার বুকের মধ্যিখানে। তার অস্তিত্বটা প্রবলভাবেই ছিল। কেবল জানা ছিল না তাঁর। ওকাকুরা তাঁর ভেতর সুপ্ত* প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষসত্তাকে বাইরে টেনে এনে প্রমাণ করল সন্ন্যাসীর বুকের মধ্যে একজন চিরন্তন পুরুষ বাস করে। নিবেদিতার রাজা, প্রেমের ভুবনে অন্য কোনো পুরুষের প্রবেশ সইতে পারে না। একটি নারীকে অধিকারের জন্য সে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে। বিবেকানন্দ জীবনে এই প্রথম তাঁর পুরুষত্ব, অহং, আমিত্বের মধ্যে অন্য কিছু সত্তাকে গভীরভাবে অনুভব করল।

নির্জন বড় নির্জন তাঁর খেলার প্রাঙ্গণ। হঠাৎ কোন্ অদৃশ্য রেফারির বাঁশি বেজে উঠল সেখানে। অমনি ধমনীর মধ্যে প্রিয় রক্তের দপদপানি অনুভব করল। হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌পুক্ শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ছায়ার সঙ্গে তাঁকে খেলতে হবে একা। প্রাগৈতিহাসিক ন্যক্কারজনক ভাবাবেগ থেকে একজন সন্ন্যাসীরও কী মুক্তি নেই? অজানিতে বিবেকানন্দের দু'চোখ বুজে ভিতরের আবেগ সামলাল।

গঙ্গার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন বিবেকানন্দ। অনন্ত সময় বয়ে যায়। জীবনের শেষলগ্নে এরকম একটা কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে মনে হয়নি কোনোদিন। পরীক্ষা না দিয়ে কেউ কোনোদিন পাস সার্টিফিকেট পায়নি। কিন্তু মার্গটের বেলায় পরীক্ষা না দিয়েই সার্টিফিকেট পাওয়ার কথা ভেবেছিলেন। মার্গটকে সেদিন ভারতের যেমন দরকার ছিল, তেমনি তার নিজের প্রয়োজন ছিল। নিবেদিতার জীবনে সব কিছু তো তাঁকে ঘিরেই ছিল। তাই বিবেকানন্দ নিজের প্রয়োজনটাকে চোখ মেলে দেখেননি। ওকাকুরা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মার্গট তাঁর মনের মুকুরে তার অস্তিত্ব নিয়ে ভীষণভাবে সজীব ছিল। হিমালয়ের পথে যাকে মন থেকে সম্পূর্ণ বিদায় দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন, হঠাৎ তার এ কোন ছায়া পড়ল মনে। নিবেদিতা তো আভাসে-ইঙ্গিতে তাঁকে রামকৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বলেছিল। গৃহীর সন্ন্যাসী হতে বাধা কোথায়? মানুষ মানুষের সঙ্গ চায়। প্রকৃতির নিয়ম মেনে একজন পুরুষ চায় নারীকে, নারীও চায় পুরুষকে। নারীর কোমলতার স্পর্শ না পেলে পুরুষের জীবন রূক্ষ হয়ে যায়। হৃদয়ের মাধুর্য বিকাশের জন্য একজন নারীর সান্নিধ্য চাই। অরবিন্দ ঘোষও নাকি এরকম কথা

বলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও অনুরূপ কথা বলতেন। ব্রহ্ম যে তিনিও একা নন। দুয়ের জানাজানি, পরিচয় প্রীতি না হলে অন্তরে রসের ধারা বইবে কী করে? রসাস্বাদন করেই তিনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন।

তাই বলে, বিবেকানন্দের কখনও মনে হয়নি, তিনি একা। নরনারী সকলের সঙ্গে মিলে, ঐ তারাভরা আকাশ, ঐ অপূর্ব বহুবর্ণ প্রকৃতির সঙ্গে একত্রে, এক বিরাট জীবন স্রোতের অংশ হয়ে আছেন। তা হলে একা কোথায় তিনি? একাকিত্ব একটা মনের ব্যাপার। বহুজনের ভেতর থেকেও কেউ যদি ভাবে সে একা, তাহলে সে একা হয়ে যায়। নিঃসঙ্গ বোধ করে। একা থাকার কষ্টে ক্লিষ্ট করে নিজেকে। মনের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে পা শক্ত করে যে নিজের পায়ে পথ হেঁটে যাবে বলে সংকল্প করেছে তার কাছে এসব ভাবনায় নিজেকে দুর্বল করার কোনো মানে হয় না।

তবু ওকাকুরার ভাবনা তাঁর মন জুড়ে রইল। ওকাকুরার বৈপ্লবিক মনোভাব নিবেদিতাকে চুম্বকের মত টানত। তার যে একটা কারণ আছে বিবেকানন্দ জানতেন। নিবেদিতা আইরিশ। এককালে আইরিশ আন্দোলনের গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ভারতবর্ষও আয়ারল্যান্ডের মত বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের শিকলে বাঁধা একটা পরাধীন দেশ ও জাতি। আইরিশরা স্বদেশের জন্য বিপ্লব শানিয়ে তুলেছিল। আবেদন-নিবেদনের রাস্তা ত্যাগ করে তারা সরকারকে বিব্রত রাখার জন্য অতর্কিতে চোরাগোপ্তা আক্রমণ করে সরকারের ওপর স্বাধীনতার চাপ সৃষ্টি করত। ওকাকুরা তার মনের আগুন উসকে দিল। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। এদেশের কাপুরুষতা, ভীরুতা, নিয়তিবাদ প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংঘর্ষ থেকে ভারতবাসীকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। বিদেশী শাসকেরা যে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে সেই কথাটাই নিবেদিতা ভারতবাসীকে বোঝাতে চাইল তার বক্তৃতায় এবং লেখায়। চাই দেশব্যাপী সংঘবদ্ধ আন্দোলন। একাজে নিবেদিতার একাগ্রতা এবং উদ্যোগকে ওকাকুরা স্বাগত জানাল। কী করলে বিপ্লবকে গোপনে মানুষের মনের অভ্যন্তরে পৌঁছে দেওয়া যায় তা নিয়ে নিবেদিতা ও ওকাকুরা একসঙ্গে কাজ আরম্ভ করল।

ওকাকুরার সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিবেদিতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়াটা স্বামীজি পছন্দ করলেন না। স্বাধীনতার পক্ষে থেকেও বিবেকানন্দ নিবেদিতার বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম অন্তরের থেকে মেনে নিতে পারলেন না। দেশের বড় বড় মানুষ থাকতে তার প্রস্তুতির শিক্ষা একজন বিদেশীর কাছ থেকে নেওয়াটা ছিল তাঁর কাছে লজ্জার এবং আপত্তির। কয়েকজন বিদেশী কৃপা করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার নেতৃত্ব দিচ্ছে একথা মনে করলে তাঁর ভেতরটা রোষে ক্ষোভে গর্জে ওঠে।

বিবেকানন্দের শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না বলে ইদানীং বাইরে খুব একটা বেরোন না। বড় জোর ঘরের সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা আঙিনায় একটু পায়চারি করে গঙ্গার

তীরে বসে হাওয়া খান। রোজই এটুকু পর্যন্ত আসেন। কিছুক্ষণ থেকে আবার নিজের ঘরে ফিরে যান।

স্বামীজির শরীর ভালো যাচ্ছিল না বলে নিবেদিতা দু'চার দিন অন্তর তাঁকে দেখতে বেলুড়ে আসে। এদিক-ওদিক না করে সোজা স্বামীজির ঘরেই ঢোকে। সেখানে না পেলে গঙ্গার তীরে তাঁর প্রিয় বেলগাছের নিচে অবশ্যই তাঁকে পাওয়া যায়। আজ সেখানেই আবিষ্কার করল তাঁকে। তন্ময় হয়ে স্বামীজি নদী দেখছিলেন। তাঁকে বুঝতে না দিয়ে নিবেদিতা গড় হয়ে প্রণাম করল। বলল, শরীর ভালো আছে তো? এত জলো হাওয়া গায়ে লাগানো কী ভালো?

স্বামীজি ওর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল। বলল, তুমি তো এখন ব্যস্ত মানুষ। স্কুল ছাড়াও আরো অনেক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছ। একসঙ্গে এত কাজে মন দিলে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারবে না।

আপনার আশীর্বাদে সব সম্ভব। কাজকে আমি ভয় পাই না। সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে যে কাজই আমি করি না কেন, তা আমার গুরুর কাজ। আমার গুরুর শিক্ষা ব্যর্থ হতে পারে না! যে আত্মশক্তির ওপর নির্ভর করতে পারলে মানুষ সব কিছু পারে সেই আত্মশক্তির জোরে আমি সব বিপদ বাধা কাটাতে পারব।

নিবেদিতার গুরুভক্তি বিবেকানন্দকে আশ্চর্য করে। শিষ্যাকে কত কী বলে তিরস্কার করবে ভেবেছিলেন। কিন্তু কিছুই করা গেল না। আস্তে আস্তে বললেন, কী জানি, তোমার কথা ভেবে আমি কী যন্ত্রণাই না ভোগ করি। বেশ বুঝতে পারি, কোথাও একটা মহাশক্তি আছে যা নিজেকে নারী প্রকৃতি বলে অনুভব করে। কালী বা মা নামে তাকে আখ্যাত করি। আবার আমি ব্রহ্মেও বিশ্বাসী। ব্রহ্ম ছাড়া কিছুর অস্তিত্ব নেই। শাক্ত মত আর ব্রাহ্ম মতের টানাপোড়েনে আমি ছিন্নভিন্ন হচ্ছি। এই বিশ্বাসের যন্ত্রণা কী কম! কি জানি? মুখের কথা মনের কথা এক করতেও সংশয় হয়। আপনার শরীর অসুস্থ বলেই অনেক কথা গভীর করে ভাবতে পারেন। যখন কাজে ছিলেন তখন কিন্তু মনের ভার ছিল না। সব কিছু ছিল সহজ ও সাবলীল।

প্রসঙ্গের ইতি টেনে বিবেকানন্দ বললেন, থাক ও সব কথা। তোমার গৃহ তো এখন মহামানবের তীর্থক্ষেত্র। ভারতবর্ষের সর্বপ্রান্তের রাজনৈতিক নেতা, সাংস্কৃতিক কর্মী, ধর্মীয় নেতা এবং বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তোমার ওঠাবসা। খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিজের একটা জায়গা করে নিতে পেরেছ। এখন বুঝতে পারছ তো কেন তোমায় স্বাধীন করে দিয়েছিলাম। আমার ছায়ায় থাকলে ভেতরের আগুন কখনও টের পেতে?

নিবেদিতার সারা শরীরে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়ল। থমথমে গম্ভীর গলায় বলল, আমি নতুন করে কিছুই করছি না। একদিন আমার গুরু ভারতকে স্বাধীন করার জন্য বোমা বানানোর স্বপ্ন দেখতেন। একমাত্র তিনিই বুঝেছিলেন এদেশ থেকে ইংরেজকে

তাড়ানোর জন্য অগ্নিগর্ভ বাণী নয়, আগ্নেয়াস্ত্র চাই। আমার গুরুর আগে কে বলেছে আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত করা চাই। এমন কি দেশের জন্য চাই সর্বস্ব ত্যাগ—জীবন বলিদানের মত বড় ত্যাগ। আমার গুরুর গৈরিক বস্ত্র কুরুক্ষেত্রের সমরসজ্জা। আসলে তিনি চান শৌর্যের সাধনা, বীর্যের সাধনা। আমি তো তাঁর সাধ পূর্ণ করছি মাত্র। তিনি যে দীপ জ্বেলে দিয়েছেন আমার কাজ হল সেই দীপাধারটি প্রজ্জ্বলিত রাখা। গুরুর স্বপ্নকে আম জনতার কাছে পৌঁছে দেওয়া একজন ব্রতচারিণীর কাজ। আপনার গৈরিকবাসের অন্তরালে রয়েছে প্রচণ্ড স্বদেশপ্রেম। আপনি শুধু সন্ন্যাসী নন, একজন বিরাট স্বদেশপ্রেমিকও বটে। একথাটা, কে কতটা জানে, জানি না, কিন্তু আমার গুরুর কোনো কথা ভুলিনি আমি। ভুলবও না।

মার্গট ! বলে বিবেকানন্দ একটু ঢোঁক গিললেন। ওকাকুরা সম্পর্কে অনেক কথাই জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হল। কিন্তু সহসা এর দুরন্ত লজ্জার শিহরনে কেমন অবশ হয়ে গেল তাঁর চেতনা। মার্গটের কাছে নিজের সংশয়কে উন্মোচন করতে তাঁর ভীষণ লজ্জা করল। তাই চমকানো বিস্ময়ে ওর নাম উচ্চারণ করে কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে রইল। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের ধক্ ধক্ করে আওয়াজ হচ্ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে কত কী ভাবল। তারপর ভেতরের সব অস্থিরতাকে দমন করে বললেন, ক্লাসিক থিয়েটারে তোমার বক্তৃতা কাগজে পড়লাম। অনেক হাততালি পেয়েছ। পিঠ চাপড়ে তাঁদের থেকে নতুন আর কী বলব আমি? যুগের সঙ্গে জাতীয় জীবনেও নানারকম পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছে। এই পরিবর্ধনের প্রয়োজনীয়তা এবং অতীতের সঙ্গে তার সুসামঞ্জস্য স্থাপনের ব্যাপারটা তুমি যেভাবে অনুভব করেছ তার প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। কিন্তু তা কখনই পরানুকরণের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। তোমাকে নিয়ে আমার খুব ভয়। মাঝে মাঝে এক একটা হুজুগ নিয়ে এতই মেতে থাক যে তার শেষ কোথায় বুঝে উঠতে পারি না। প্রথমে ছিল স্কুলের ঝোঁক, তারপর এল ব্রাহ্মদের সঙ্গে মেলামেশার প্রবণতা। এটা কাটল তো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে মেলামেশার ঝোঁক প্রবল হল। এখন তো নতুন করে পালে হাওয়া এনেছে ওকাকুরা। বলতে পারি ওকাকুরার নেশায় তুমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছ। অন্য সব ঝোঁকের মত এটাও হয়তো একদিন কেটে যাবে। কিন্তু যতদিন তা না কাটছে ততদিন ভাবনাটা থেকে যায়।

স্বামীজির প্রচ্ছন্ন অভিযোগ নিবেদিতার বুকে যেন শেল বিদ্ধ করল। প্রতিমুহূর্তের চিন্তায় আর স্বপ্নে যে অভ্যুত্থানকে সে আহ্বান করেছিল ওকাকুরা সেই স্বপ্নের পৃথিবীতে হাত ধরে পৌঁছে দিল তাকে। ওকাকুরাকে না পেলে এত তাড়াতাড়ি রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের স্বপ্ন দেখা হত না। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে গুরু তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হল কেন? ওকাকুরাকে তো গুরু রসিকতা করে অক্রূর চাচা বলে ডাকেন। কারণ কংসের সাম্রাজ্যবাদী অপশাসন থেকে মথুরাকে মুক্ত করার পরোক্ষ বার্তা নিয়ে অক্রূর যেমন মথুরার দূত হয়ে গোকুলে এসেছিল। তেমনি জাপান সম্রাটের ভাবের

আদানপ্রদানের দূত হয়ে ওকাকুরা ভারতে এসেছিলেন বলেই গুরুজি মজা করে অক্রুরচাচা বলে ডাকেন। তাঁর সঙ্গে গুরুর এত বন্ধুত্বপূর্ণ মিষ্টি সম্পর্ক সত্ত্বেও তাঁকে কটাক্ষ করার হেতুটা কোথায় নিবেদিতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না। নিজের ভেতর অশান্ত অস্থিরতাকে চাপা দিয়ে শান্তভাবে বলল, আমার পিতার দুর্ভাবনা হওয়ার মত কোনো কাজই করিনি। নোশু আপনাকে কিছু বলেছে কি ?

বিস্ময়ে বিবেকানন্দের দু'চোখ কপালে উঠল। ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর বললেন, নোশু কে ?

নিবেদিতা বলল, কেন আপনি জানেন না? নোশু হল ওকাকুরার ঘরোয়া নাম।

সবিস্ময়ে বিবেকানন্দ বললেন, তুমি ও নাম জানলে কী করে?

মায়াবতীতে ছেলেবেলার গল্প বলার সময় ঐ নাম তিনি বলেছিলেন। একজন বন্ধুর ওই নামে ডাকার অধিকার আছে। তাই ওঁকে নোশু বলে ডাকি।

ওঃ। বন্ধুত্ব এত তাড়াতাড়ি হয়? যাক ওটা তোমার ব্যাপার। ও সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। তুমি স্বাধীন এবং মুক্ত। কিন্তু ভারতের মুক্তি আন্দোলনের মত একটি স্পর্শকাতর বিষয় সম্পর্কে আমার নিজের কিছু বক্তব্য আছে। শোনা না শোনা তোমার ব্যাপার।

নিদারুণ অভিমানে নিবেদিতার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল। দুচোখ ভরে সহসা উদ্‌গত অশ্রু নামল। বলল, এভাবে বলছেন কেন? আপনার সব কথা মন থেকে সায় দিতে পারি না বলে ঝগড়া করি। কিন্তু কখনও অবাধ্য হয়েছি এই অপবাদ দিতে পারবেন না।

স্বামীজি বললেন, শোনো মার্গট, ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে ওকাকুরাকে একেবারে প্রকাশ্যে এবং খোলাখুলিভাবে যুক্ত করে দেওয়াটা আমি ভালো মনে করছি না। সমর্থনও করছি না। মাদ্রাজের বক্তৃতায় তুমি বলেছিলে ভারতের যে কোনো পরিবর্তনে বিদেশীর ভূমিকা থাকবে না। সে অধিকার তাদের নেই। তবু ভারতের মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে তাকে টেনে আনা তোমার ঠিক হয়নি।

যে অর্থে আপনি বিদেশী বলছেন, সে অর্থে আমি তাকে বিদেশী বলে মনে করি না। তিনি ইউরোপীয় নন, এশিয়ার লোক। ভারতের খুব কাছের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিনিধি। ভারতের পাশে তাঁর দাঁড়ানোকে দোষ মনে করিনি। ইংরেজ যে অর্থে বিদেশী সে অর্থে ওকাকুরা বিদেশী নন। এশিয়াবাসীর মুক্তির সপক্ষে তিনি। ওকাকুরা আমাদের সঙ্গে থাকলে লাভই হবে। ভারতের মুক্তি আন্দোলন অন্য এক রাজনৈতিক মাত্রা পাবে।

স্বামীজি অদ্ভুত এক ভঙ্গি করে হাসলেন। বললেন, মরীচিকার পেছনে ছোটার চেষ্টা ছাড়ো। লোকটির যত গুণই থাক, দারুণ ভোগস্পৃহা ওঁর সব গুণ নষ্ট করে দিয়েছে। ওঁর মধ্যে ত্যাগ বলে কিছু নেই। ত্যাগ ছাড়া কোনো মহৎ কাজ হয় না। ওকাকুরার

বাইরের চটকে ভুলে যাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু ওর কুহকে ভুলো না।

গুরুর মুখে এসব কী শুনছে নিবেদিতা? নিজের কানকেও তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিছুদিন আগে যে ওকাকুরার প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ ছিলেন তাঁর সম্পর্কে এত আপত্তিকর কথা বলছেন কী করে? নিবেদিতা নিজের প্রশ্নের জবাব খুঁজে পায় না। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর খুব আস্তে বলল, কৈ আগে তো তাঁর সম্পর্কে কোনো অভিযোগ শুনিনি। বরং তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। এত তাড়াতাড়ি তাঁর সম্পর্কে আপনার মনোভাব পাল্টালো কী করে? কী এমন করল যে লোকটা খারাপ হয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে তো অনেক সভা-সমিতি করলাম। এখানে-ওখানে ঘুরলাম। কিন্তু একবারও খারাপ বলার মত কিছু পাইনি তার মধ্যে। এমনকি আপনিও আমায় সতর্ক জন্য কিছু বলেননি।

ভারতকে স্বাধীন করা সম্পর্কে ওকাকুরা কী বুঝিয়েছেন তুমি জান। তোমার কাজ নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা। কিন্তু তুমি সেখান থেকে ক্রমাগত সরে যাচ্ছ।

কে বলল? আমার কর্তব্যে কখনও শৈথিল্য দেখেছেন? ক্রিশ্চিনকে পেয়ে আমার বোঝা একটু হাল্কা করেছি মাত্র।

তোমাকে এদেশে কেন এনেছি সকলেই তা জানে। তুমি রামকৃষ্ণ সংঘের কাজ করবে। সে কাজ যে করছ না এ অভিযোগ আনছি না। কিন্তু নিজের ইচ্ছেয় তোমার কর্মক্ষেত্রের পরিধি বাড়িয়ে যাচ্ছ। তাতে কারো অনুমোদনের ধার ধারছ না। আমার আপত্তি সেখানে। প্রতিবাদের ভাষাটা হয়তো তোমার মনের মত হচ্ছে না। তাই ভালোও লাগছে না। তোমার চোখে-মুখে একটা অসহিষ্ণুভাব ফুটে বেরোচ্ছে।

গুরুর কথার মধ্যে যে তীব্র শ্লেষ ছিল নিবেদিতা তা হৃদয়ঙ্গম করল। কিন্তু মুখ ফুটে তৎক্ষণাৎ কিছু বলল না। কোনোরূপ তর্ক করল না। মুখে মুখে ফটাফট কথা বলাটা অশোভন। তাই মাথা হেঁট করে রইল। বলল, আমি চিরদিনই রাজনৈতিক স্বাধীকার অর্জনের সপক্ষে। আমার কাছে এখন স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করা আরো বড় কাজ। রাজনৈতিক অধিকার লাভ না করা পর্যন্ত দেশের মানুষের কোনো উন্নতি সম্ভব নয়।

বিবেকানন্দের অধরে স্মিত হাসি। বললেন, স্বাধীনতা!

নিবেদিতা এতেই একটু ভরসা পেয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, স্বাধীনতার যুদ্ধে বিদেশী অবিদেশী বলে কিছু নেই। সবাই সমান। স্বাধীনতা এমনই পবিত্র প্রাপ্তি যে তা অর্জনের জন্য কোনো পন্থাই মন্দ নয়। মাতৃপূজাই সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি। পনেরোশো বছরের বেশি এদেশের মানুষ স্বাধীনতা শব্দটির সঙ্গে পরিচিত নয়। স্বাধীনতার স্বাদ কি তারা জানে না। তাই তার সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই। স্বাধীনতা বোধটাই এদেশের মানুষের মধ্যে নেই। পরাধীনতায় তার কিছু যায় আসে না। স্বাধীনতার মানেটা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া একটা বড় কাজ। একাজ যে বা যারা করছে কিংবা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসছে তারা কোন্ দেশের মানুষ তার খোঁজ নিয়ে হবে কী? কোনো কাজকে এগিয়ে

নিয়ে যাওয়ার জন্য বহু মানুষ দরকার হয়, কিন্তু পণ্ড করার জন্য একজনই যথেষ্ট।

স্বামীজি থমকে তাকালেন শিষ্যার উদ্ভাসিত মুখের দিকে। বললেন, তোমার কথা আমি বুঝি। কিন্তু তার জন্য আগে দেশকে তৈরি করতে হবে। অশিক্ষা, কুসংস্কার দূর না হলে স্বাধীনতাবোধ আসবে কোথা থেকে ?

দেড় হাজার বছর ধরে ভারত যা পারেনি তার আশায় থাকলে স্বাধীনতা অধরা থেকে যাবে। তার চেয়ে বরং দুরন্ত ঠেলায় যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্ত দেয়ালকে একবার কাত করে ফেলা যায় তাহলে পনেরোশ' বছরে ভারত যা করেনি পনেরো বছরে তা করবে। স্বাধীনতার পথ ধরেই আসবে আত্মমর্যাদাবোধ। ঐ বোধের আলো পড়ে তার ভেতর জাতীয়তাবোধ ঝলকে উঠবে, আর তখনই অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকার দূর হবে।

শিষ্যা যে কথা দিয়ে আগুন ছোটাতে পারে বিবেকানন্দ তা জানেন। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার শক্তি তার আছে। তবু এ কল্পনা দিবাস্বপ্নের মত। এর মধ্যে কানাকড়ি সত্য নেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধাক্কা দেবার জন্য সেই সাহসী মানুষ কোথা থেকে আসবে? এ দেশের মানুষ ভীরু উদাসীন, নিজের ভালো বোঝে না, যে কোনো মহৎ কাজে তারা অনিচ্ছুক, এমনকি নিজের নাক কেটে যাত্রা পণ্ড করতেও প্রস্তুত। এরা ঘরে বসে বৃটিশের মার খেয়ে জীবন দেবে, তবু দেশের জন্য প্রাণ বলিদান করবে না। এসব জেনেও নিবেদিতা মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছে। কথাগুলো মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল অসহিষ্ণুতায় স্বামীজির ভেতরটা অস্থির হল। তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়ল ওকাকুরার ওপর।

ভর্ৎসনা করে শিষ্যাকে বললেন, এসব ওকাকুরাই শিখিয়েছে তোমায়। অবাস্তব চিন্তা ছাড়।

নিবেদিতার ভেতরটা ফুঁসে উঠল। তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আপত্তি জানিয়ে বলল, আমি যে কারো কথায় নাচি না, সে তো আপনিও জানেন। তবু একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে দোষী করছেন কেন? নিবেদিতার দু'চোখে তার গুরুর স্বপ্নের স্বাধীন ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষের বিশাল জনতার মাঝখানে অগ্নিশিখার মত আগুনরঙের গেরুয়া পরে দাঁড়িয়ে আছে আমার পরম গুরু স্বামী বিবেকানন্দ। নিবেদিতার গুরু ভাষা দিয়ে মানুষের বুকে মুক্তির বন্যা বইয়ে দিতে পারে। তাঁর কথায় জনসমষ্টি উন্মাদ বন্যার মতন ইংরেজ রাজশক্তিকে ধাক্কা মেরে ভেঙে গুঁড়িয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

পাগলামি কর না। এসব কথা বলা মানে পাগলের প্রলাপ বকা। তোমার গুরু কোনোদিন সে দায়িত্ব আর নেবে না। তিনি সন্ন্যাসী। তাঁর কাছে ঈশ্বরপ্রাপ্তিই হল শেষ কথা। একটু থেমে বললেন, আমার কাছে কারো প্রত্যাশার কিছু নেই। তোমার ভালোর জন্য বলা উচিত মনে করেই বলছি, ওকাকুরা তোমার মাথাটা খেয়েছে। এভাবে আগে

কখনও ভাবিনি। মিছেই মরীচিকার পিছনে ছুটছ। সাতমন তেলও পুড়বে না রাধাও নাচবে না। এখনও সময় আছে, ওকাকুরা থেকে দূরে থাক। ওর কুহকশক্তিকে আমি ভয় পাচ্ছি। ওকে আমার চিনতে দেরি হয়েছে।

নিবেদিতা স্তম্ভিত হয়ে গেল। ওকাকুরা সম্পর্কে স্বামীজি এরূপ মতবদলের কারণ কী? ওকাকুরাকে ছোট করতে গিয়ে স্বামীজি নিজেকে কোথায় নামিয়ে আনলেন! শিষ্যার চোখে নিজেকে ছোট করে তিনি কার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছেন? স্বামীজির জন্য নিবেদিতার খুব কষ্ট হল। একজন অসাধারণ সন্ন্যাসীও মাঝে মাঝে কত সাধারণ হয়ে যায়। তখন তাঁর স্বভাব ও জীবনযাত্রার সঙ্গে সাধারণ গৃহী মানুষের স্বভাব ও জীবনযাত্রার কী অদ্ভুত মিল। এক গভীর দুঃখের সঙ্গে মিশে গেল নিবেদিতার গুরু সম্পর্কে আবেগ ও অনুভূতি।

স্বামাজির জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে সে। এইটেই সরল সত্য। ওকাকুরার জন্য সেখানে কোনো জায়গা ছেড়ে দিতে চান না বলে নিজেকে এভাবে হেনস্তা করছেন তার কাছে। বহুকাল পরে নিজেকে নিবেদিতার ভীষণ অসুখী মনে হতে লাগল। প্রচণ্ড ভারসাম্য মানুষেরও কিছু কিছু দুর্বোধ্য দুর্বলতা থাকে। দেবতা থেকে মুনি-ঋষিরা কেউই দুর্বলতা মুক্ত নয়। মানুষ হিসেবে এই দুর্বলতা তাকে হাস্যাস্পদ করলেও একজন মানুষ হিসেবে তাকে পূর্ণতর করে তোলে। অপূর্ণতাই প্রত্যেক মানুষকে পূর্ণতার স্বাদ দেয়।

নিবেদিতার কিছুক্ষণের জন্য বাকরোধ হল। কোনো দুর্বোধ্য কারণে রাজার মন ভালো নেই বলে কী এক জ্বালাধরা অনুভূতি তীব্র অসূয়ার যন্ত্রণায় দৃঢ় হয় তাঁর অবচেতন মনে। নিজের ভাবাবেগকে সামলে নিয়ে স্বামীজিকে সচেতন করার জন্যই নিবেদিতা আস্তে আস্তে বলল, স্বামীজি, রামায়ণে আছে ঋদ্ধিমান পুরুষ কোনো নারীর মুখে অপর পুরুষের প্রশংসা সইতে পারে না। অকারণ ক্রোধে, ক্ষোভে, ঈর্ষায় এক জ্বালাধরা অনুভূতি তাকে ছিন্নভিন্ন করে। রামচন্দ্রের মত ভ্রাতৃপরায়ণ মহাত্মা পুরুষও একই ভুল করেছিলেন। সীতার মুখে অনুজ ভ্রাতার প্রশংসায় অসহিষ্ণু হয়ে জানকীকে তিরস্কার করেছিলেন। আপনিও ওকাকুরার বেলাতে সেই একই ভুল করলেন।

অবচেতনের গভীরে প্রবল ঈর্ষা বোধটা নিবেদিতার চোখে উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় বিবেকানন্দ সহসা একটু বিব্রতবোধ কবলেন। কিন্তু কণ্ঠস্বর ছিল সহজ ও সাবলীল। বললেন, তুমি তো স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছ। কিন্তু লড়াইটা করবে কী দিয়ে? খালি হাতে আর বক্তৃতা করে কি লড়াই হয়? চাই আগ্নেয়াস্ত্র। কোথা থেকে আসবে এসব? কে দেবে তোমাদের? তার টাকা আসবে কোথা থেকে? চাঁদা? এদেশের লোক বড় গরিব। তারা টাকাকড়ি থেকে শত হাত দূরে থাকে। ভিক্ষে করে ঝুলি ভরাতে পারবে না।

ব্যঙ্গ করছেন? টাকার জন্য কী বেলুড় মঠ থেমেছিল? টাকা ঠিকই জোগাড় হয়ে

যায়। সদিচ্ছা থাকলে ভালো কাজের জন্য টাকার অভাব হয় না। আপনার কোন কাজটা টাকার অভাবে হয়নি বলতে পারেন? সত্যি বলতে কি বিদেশিনীরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল বলে তো এই মঠ তৈরি হল। মঠের অর্থ দেশের না বিদেশের এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। মঠটা তৈরি হওয়া ছিল এক বৃহৎ প্রাপ্তি। তেমনি ভারত স্বাধীন হলে কেউ প্রশ্ন করবে না তাতে বিদেশের ভূমিকা কতটা ছিল। বৃহৎ প্রাপ্তির তুলনায় সেটা নিতান্তই গৌণ। যেমন ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা যে একজন ইংরেজ এই পরম সত্যটি আজ চাপা পড়ে গেছে।

বিবেকানন্দ কাষ্ঠ হেসে বললেন, চমৎকার যুক্তি। প্রতিবেশী বিদেশী রাষ্ট্রগুলো সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে কেন? ঘরের খেয়ে বনেব মোষ তাড়িয়ে তাদের লাভ কী? ওকাকুরা বুঝি এসব বোঝাচ্ছে তোমাকে? আর তুমিও তাই বিশ্বাস করছ। কতখানি খপ্পরে পড়লে তবে এইসব যুক্তিহীন অবাস্তব চিন্তা মাথায় আসে নিজেই ভেবে দেখ।

আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন? আমার দোষ কোথায়? অপরাধই বা কি যে এভাবে মনে আঘাত দিতে হবে।

তোমার ভুলটা ধরিয়ে দেওয়া দোষের? শ্বেতাঙ্গিনীর পরিচয়টা ভুলতে পার না বলেই সব ব্যাপারে তোমরা একটা মুরুব্বিয়ানা করে থাক। সব কিছু সহজ করে দ্যাখ। ওদেশে যা মানায় এদেশে তা শোভা পায় না। এই সরল সত্য কথাটা তুমি বোঝার চেষ্টা কর না। সব কিছু তোমার মত করে ভাবাটাই হল তোমার দোষের।

অপমানে নিবেদিতার মুখ আগুনের মত গন গন করতে লাগল। গভীর অভিমানে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। ঢোক গিলে গিলে বলল, গায়ের রঙটাই যা বদলাতে পারিনি। নইলে আর সব বিসর্জন দিয়েছি। এমন কি ব্রিটিশ জাতির গৌরব পর্যন্ত ভুলে গেছি। মনে প্রাণে একজন ভারতীয় হয়ে ওঠেছি। ভারতবর্ষ আমার দেশ, ভারতের সনাতন ধর্ম আমার ধর্ম। আমার অহং, ব্যক্তিত্ব, আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ সব গুরুর পায়ে সমর্পণ করে নিবেদিতা হয়ে গেছি। এর পরেও সংশয়? আরো কিছু চাওয়ার থাকলে তাও দিতে পারি আপনাকে।

।। নয় ।।

ধীরে ধীরে নিবেদিতা আবিষ্কৃত হতে লাগল পল্লীবাসীর চোখে। সাধারণ ইংরেজ মহিলাদের মত সে নয়। ইংরেজের যা কিছু মন্দ তা নিয়ে নিবেদিতা সরব সব সময়। ভারতে সুসভ্য ইংরেজের প্রভুত্ব তার পছন্দ নয়। ইংরেজের কাজকর্মের একজন কড়া সমালোচক। ভারতে ইংরেজ যে অত্যাচার চালায় সেজন্য সেদেশের একজন মানুষ হয়ে ব্যক্তিগতভাবে তার জন্য লজ্জা অনুভব করে। একটা দারুণ অপরাধবোধে তার অন্তঃকরণ পীড়িত হয়। ইংরেজ প্রসঙ্গে কিছু বলতে গেলেই ভেতরটা তার বিদ্রোহে ফুঁসে উঠে। এদেশের মানুষের চোখ ফোটানোর জন্য আক্ষেপ করে একদিন কোলকাতার একটি সাধারণ সভায় বলল, ইংরেজরা সভ্য জাত বলে আত্মশ্লাঘা করে। কিন্তু সত্যি কি সে দাবির অধিকারী তারা? বিশেষ করে এদেশে তাদের হালচাল দেখে কি তাই মনে হয়?

নিবেদিতা কয়েকটা মুহূর্ত থামল। শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে তাদের মনোভাব বুঝে আস্তে আস্তে কথা বলতে লাগল। প্রত্যেকটি কথাকে তাদের হৃদয়ে গেঁথে দিল বড় যত্নে এবং শ্রদ্ধামিশ্রিত সোহাগে।

ভারতে যে ইংরেজ রাজত্ব চালায় তাদের আদৌ সভ্য বলা যায় না। ইংলন্ডের ইংরেজদের সঙ্গে ভারতের ইংরেজদের মিলের চেয়ে অমিল বেশি। আমার দুর্ভাগ্য বর্বর ইংরেজের দেশে আমি বড় হয়েছি। সে দেশের মানুষ তোমাদের দাস করে যে ভয়ানক ক্ষতি করছে তার জন্য আমার লজ্জা হয়। তাই তো নিজেকে এমনভাবে সঁপে দিয়ে ছোট ইংরেজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি। আর তোমরা ভারতীয় হয়ে এই অবিচার অত্যাচারের প্রতিকার করার জন্য কী করছ? তোমরা কি সব ঘুমিয়ে থাকবে?

তোমাদের মধ্যে যারা নির্ভয়ে এগিয়ে চলার মত সাহস রাখ, শত অত্যাচারে যারা ভেঙে পড়বে না, প্রচণ্ড মনোবলে যারা অসমসাহসী, যারা তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন, বিচারপ্রবণ তারা কি টের পাও না প্রতিদিন কত ধরনের কত অপমান সহ্য করতে হচ্ছে তোমাদের। এর প্রতিকার না করে যদি চুপ করে থাক তাহলে অসম্মান, অত্যাচার তারা করতেই থাকবে। কোনোদিন তা বন্ধ হবে না। তোমরা তো ধর্মহীন জাত নও—তাহলে অভিশাপমুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করবে না কেন?

শ্রোতাদের নীরব থাকতে দেখে রোষে ক্ষোভে গর্জে উঠল। বলল, বৃটিশ তোমাদের

দেশের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজের সিন্দুক ভরছে। অথচ তোমাদের প্রতি কোনো কর্তব্য করছে না। এসব জেনেশুনেও তোমরা নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকবে? তাদের অবজ্ঞা, অবহেলা, ঔদাসীন্যের প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করে না তোমাদের? ভারতমাতা শত বিড়ম্বনা এবং দারিদ্র্য সহ্য করেও জগদীশচন্দ্র বসুর মত প্রতিভাবান সন্তানের জন্ম দিচ্ছে। আর বিদেশী শাসক তাদের প্রতিভা স্ফুরণের কোনো সাহায্য করছে না। বরং কী করলে তাদের গবেষণা বাধাপ্রাপ্ত হয়, বিশ্বসভায় গৌরবের আসন থেকে বঞ্চিত হয়, তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এদের কাজ। তাই আজ রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় হয়েছে। আমার ভারতীয় ভাই-বোন তোমরা ওঠ, জাগ, সাহসে বলীয়ান হও। মাতৃমুক্তির আরাধনায় নিজেকে বলি দাও। তুমি যদি নিজেকে নিজে রক্ষা করতে না পার, তাহলে বাইরে থেকে কোনো শক্তি তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। তোমার মুক্তির ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে। এই বিশ্বাসে শক্তিমান হও।

নিবেদিতার বক্তৃতা কোলকাতাবাসীকে মুগ্ধ করল। বৃটিশ শাসকও নড়ে চড়ে বসল। সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল তাকে। নিবেদিতার চলাফেরা, কাজকর্মের ওপর পুলিশ নজর রাখল। পাড়ায় পাড়ায় নিবেদিতাকে নিয়ে আলোচনা চলল। বিবেকানন্দের সঙ্গে আরো অনেক বিদেশিনী এসেছেন কিন্তু তারা নিবেদিতার মত নয়। নিবেদিতা নিজেকে শুধু উজাড় করে দিতে এসেছে। ভারতবর্ষের জন্য কিছু অদেয় নেই তার।

ভারত সম্পর্কে যে সব অপবাদ সুদীর্ঘকাল ধরে এদেশের মানুষকে বিশ্বের কাছে ছোট করে দিয়েছে এবং তার নিজের মধ্যেও যে হীনম্মন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তার বিপক্ষে কোনো ভারতীয় নয়, একজন বিদেশিনী হয়ে নিবেদিতাই সর্বপ্রথম তা খণ্ডন করল। প্রমাণ করল ভারতের মহানুভবতা, মহত্ত্ব, ভব্যতা, ভদ্রতা অনুকরণীয়। ভারতবর্ষের গৃহই মন্দির এর পারিবারিক শুচিতা, হৃদয় মনের উৎকর্ষ, ভারতীয় নারীর মহৎ চরিত্র তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আধুনিক অর্থে নারীরা অজ্ঞ বটে, অর্থাৎ লিখতে পড়তে কেউ পারে না। অক্ষর পরিচয় আছে অল্প স্ত্রীলোকের। কিন্তু তাই বলে কেউ অশিক্ষিত নয় তারা। শিক্ষা-দীক্ষা তাদের জীবন থেকে পাওয়া বলেই তার ধার ও জৌলুস অনেক বেশি। পল্লীবাসীরা নিবেদিতার কথা শুনে আশ্চর্য হয়। ভারত সম্পর্কে এ ধরনের অদ্ভুত কথা কোনো ভারতীয় বলেনি। অপবাদ খণ্ডনের কোনো চেষ্টাও করেনি। একজন বিদেশী হয়ে নিবেদিতা নিজের উদ্যোগে যা করল তা নিয়ে রীতিমত একটা হইহই পড়ে গেল। পাড়ায় পাড়ায় নিবেদিতা সকলেব আলোচ্য হয়ে উঠল।

ঘেরাটোপের মানুষকে একেবারে খোলা আকাশের নিচে এনে মেম দিদি কঠোর বাস্তবকে চেনাল। নিবেদিতা ক্রমেই তাদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠল। তবু তাকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন ও মানুষের মনে ভিড় করল। অনেক সংশয় দানা বাঁধল। পাড়ায় পাড়ায় তাকে নিয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে বিতর্ক শুরু হল।

সেদিন রবিবার। ছুটির সকালে সময় কাটানোর জন্য একদল যুবক নিজেদের মধ্যে

আড্ডা দিচ্ছিল। হরেক রকম প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছিল। পাশের একটি বাড়ি থেকে এক সুদর্শন যুবক এল ওই আড্ডায়। হাতে তার স্টেটস্‌ম্যান। কাগজের পাতায় নিবেদিতার একটা ছবি ছাপা হয়েছিল। সেটি দেখিয়ে বলল, মেমদিদি বক্তৃতা দিয়ে মানুষ টানতে পারে মাইরি। কথা তো নয় আগুনের ফুল্‌কি। আমি ওঁর বক্তৃতা শুনেছি। প্রত্যেকটি কথা মনে গেঁথে যায়।

অমনি বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। অন্য একটি ছেলে ফোঁস করে উঠল তৎক্ষণাৎ। বলল, মানুষ খেপানোর শক্তি আছে মহিলার। সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মানুষ জড়ো করতে পারেন। কিন্তু ইংরেজের মত পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া জাতকে শুধু কথা দিয়ে তাড়ানো যাবে কি ? ওদের তাড়ানোর জন্য চাই কামান, বন্দুক, প্রচুর টাকাকড়ি। কিন্তু কোথা থেকে সে সব আসবে?

তৃতীয় একজন যুবক বলল, এক মন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।

বেশ একটা হাসির রোল পড়ে গেল। সুদর্শন যুবকটি ওদের হাসিতে যোগ দিল না। বলল, এটা নিয়ে রঙ্গ করা কোনো মানে হয় না। যে কাজ আমাদের করা উচিত, যে সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের এগিয়ে আসা উচিত ছিল, সে কাজ আমরা করলাম কৈ ? একজন বিদেশী মহিলা হয়ে সেই কাজ তিনি করলেন তাতেও আমাদের চোখ খুলল না। লজ্জাও হল না। উল্টে তাঁকে নিয়ে রঙ্গ করছি। ছিঃ, পাগলও নিজের ভালো বোঝে। আমরা বুঝি না। আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে আছি। পেঁচার মত অন্ধকারই ভালো লাগে। মেমদিদির কাছে খুব জানতে ইচ্ছে করে কাদের জন্য এত কষ্ট করছ তুমি? এরা নিজের ভালো চায় না। জাতটা গোলামি করে মান মর্যাদা, মনুষ্যত্ব সব খুইয়েছে। শুধু বজ্জাতি করে অন্যের ক্ষতি করে নিজের আখের গোছায়। তুমি মিছেই মরীচিকার পিছনে ছুটে নিজেকে ক্ষয় করে ফেলছ। আমাদের ধ্বংস হতেই দাও।

দ্বিতীয় যুবকটি বলল, সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিচ্ছ বাপ।

সেন্টিমেন্ট বলে কিছু থাকলে তো দেশের জন্য প্রাণ দিতে শিখতাম। নেই বলেই তো এত অধঃপতন।

রোয়াক থেকে একটি তরুণ উঠে বলল, আবেগ জাগানোর নেতৃত্ব কোথায়?

সুদর্শন যুবকটি বলল, ওটা কোনো সমস্যা নয়। স্বাধীনতার ইচ্ছেটা প্রবল হতে হতেই একদিন তার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগবে। পরাধীনতার জ্বালা, যন্ত্রণা, অপমানটা বুঝতে শিখবে। বুকে যত আগুন জ্বলবে ততই মরণ পণ করে আত্মত্রাণের পথ খুঁজবে। তখন নিজের পথ নিজেই খুঁজে পাবে। নেতাও জুটে যাবে। আসলে বাধার মূলে আছে ভীরুতা। এই ভীরুতার অবসান হল যেদিন, মথুরার বসুদেবের বুকে ভয় ছিল না আর। কংসের কারাগারের সব প্রতিবন্ধকতা তুচ্ছ করে এমন কি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত বাধা মাথায় করে শিশুকৃষ্ণকে মথুরার মুক্তির জন্য ঠিক গোকুলে পৌঁছে দিল। আবার দ্যাখ বেথেলহামে সতর্ক পাহারার নিশ্ছিদ্র বেড়ার বেষ্টনীর মধ্যে শিশু

যীশুর আবির্ভাব সম্রাট হেরডও রুখতে পারেননি। মানুষের প্রবল মুক্তির তৃষ্ণা দুই বিপ্লবী শিশুকে রক্ষা করেছে। আসলে সংকল্পই মানুষকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। মেম দিদিও সকলকে সেই গল্প শোনান। আর স্বামীজির মত বলেন, ওঠ, জাগ, সাহস অবলম্বন কর। ঈশ্বর নয়, মানুষই তার ভাগ্যবিধাতা। বলার সময় মৃদু হাসির আভাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল যুবকের মুখখানা।

মুগ্ধ হয়ে শুনল সকলে। কেবল তৃতীয় যুবকটি প্রতিবাদ করার জন্যই বলল, ওসব গল্পে হয়। স্বাধীনতা হাতের মোয়া নয় যে চাইলেই পাওয়া যায়?

দ্বিতীয় যুবকটি বলল, স্বাধীনতা যে ভিক্ষে করে পাওয়ার বস্তু নয় সেটা সকলে জানে। সন্ন্যাসী হওয়ার আগে স্বামীজিও দেশ থেকে ইংরেজ তাড়ানোর জন্য দেশীয় রাজন্যবর্গের সহায়তার বোমা বানানোর কথা ভেবেছিল। স্বামীজির আগে কে বলেছে আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত করার শক্তি যেমন চাই, দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণদানের মত সর্বোচ্চ ত্যাগ চাই।

তৃতীয় তরুণটি বলল, তাহলে দেশের মানুষের কথাটা বাসি হল, আর এক বিদেশিনীর কথা হল অমৃত সমান। কথাগুলো বলে তরুণটি হাসল। বিদ্রূপের হাসি।

নিবেদিতা সম্পর্কে এরকম মন্তব্য শুনে অন্যেরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। রাগে ক্ষোভে দুঃখে সুদর্শন তরুণটির মুখখানা রাঙা হয়ে গেল। বলল, ছিঃ, মেম দিদি মানবী নয়, স্বর্গের দেবী। পরের দেশের জন্য কে কবে এমন করে নিজেকে নিবেদন করেছে? কাদের স্বার্থে নিজের দেশের বিপক্ষে দাঁড়ালেন? এদেশের জন্য কত কী করলেন, তবু তাঁর সম্পর্কে আমরা এত হীন মন্তব্য করি! এত আমাদের লজ্জা। তবে কি মেম দিদি মরীচিকার পিছনে দৌড়চ্ছেন? সত্যিই আমরা অভাগা। একজন মহাপ্রাণা মহিলাকে সামান্য শ্রদ্ধাটুকু আমরা করতে পারি না! বড় মনের, বড় আদর্শের আলো পড়ে আমাদের মনটা বড় হয় না। মনের অন্ধকারও কাটে না।

তর্কে জেতার জন্যই তৃতীয় তরুণটি পুনরায় জোর দিয়ে বলল, সাদা চামড়ার মানুষকে তোয়াজ করা আমাদের চরিত্র। ওরা যা করে সব ভালো। নিজের দেশে থাকলে কল্কে পেত না। এখানে এসে হিরোইন হয়েছে। নিবেদিতা যা করছেন নিজের নামের স্বার্থে করছেন।

সুদর্শন তরুণটি ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, তোমার জ্ঞানের পরিধি অতি সামান্য। নিন্দুকদের কথা চর্বিত চর্বণ করছ। শুধু এটুকু শুনে রাখ নিজের দেশে থাকলেও উনি বিখ্যাত হতে পারতেন। ইংলন্ডের বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিদের তিনি স্নেহধন্যা। এদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিরা পর্যন্ত দূর-দুরান্ত থেকে এসে ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিছুদিন আগে মহাত্মা গান্ধীও মেম দিদির সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন। ওঁর মত বিদূষী মহিলাকে শিষ্যারূপে পাওয়া স্বামীজির ভাগ্য। আমার বাবা বলেন, মেম দিদিকে না পেলে বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছুই জানা হতো না। সারদা মাকে বাংলাদেশের ক'জন লোক চিনত?

বাগবাজারের এঁদো গলিতে কার সাধ্য সাধনায় এবং ত্যাগে মেয়েদের এই স্কুল হল? অন্তঃপুরের ঘেরাটোপ থেকে মেয়েদের বাইরে আনল কে? বাংলাদেশের বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিরা মেম দিদির সাহচর্য, সান্নিধ্য পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করে। মেম দিদির এই অবদান কখনও ভোলা যায়? তোমার মত নিন্দুকে মেমদিদিকে ছোট করলেও করতে পারে, কিন্তু যারা সম্মানীয় এবং আদরণীয় তাঁদের সমাদরে এবং শ্রদ্ধায় তিনি মহিমান্বিত হয়ে ওঠেন। এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি কী আছে জীবনে? তোমার মত চুনোপুঁটিরা কী বলল, আর বলল না, তাতে কী যায় আসে? কোনো সমালোচনাই তাকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। পারবেও না কোনোদিন।

ইদানীং রোগযন্ত্রণার পাষাণ কারাগারে যেন বন্দী হয়ে আছেন বিবেকানন্দ। মঠের বাইরে খুব একটা যান না। গঙ্গার ধারে মাঝে মধ্যে বেড়ান। সব সময়ে নিজের ঘরেই থাকেন। লেখাপড়া করেন। নিজের মত থাকেন। তবু অতিথি, ভক্ত এবং অনুরাগী যারা আসেন তাদের কাউকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না। নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতে তাঁর ভালো লাগে।

বাগবাজার থেকে নিবেদিতা প্রায়ই তাঁকে দেখতে আসে। চোখের দেখা দেখতে পাওয়ার একটা আলাদা সুখ আছে। তাঁকে একটু সেবা করতে পারলে কিংবা দুটো কথা বলতে পারলেই ভেতরটা আনন্দে ভরে ওঠে। তাই ঠাসা কাজের মধ্যে সময় করে নিবেদিতা বেলুড়ে আসে। না এলে মনে কু-গায়। মনটাও অশান্ত হয়। কোনো কিছুতে মন বসে না। এখন তার একমাত্র কাজ যেন তেন প্রকারে একটু সেবা করা। স্বামীজিকে সেবা করে এক অফুরন্ত সুখ, আনন্দ ও শান্তি পায় সে।

নিবেদিতা নিজের মতই বেলুড়ের ঘাটে নেমে সটান স্বামীজির ঘরে যায়। পাছে তার মগ্নতা ভঙ্গ হয়ে যায় তাই বিড়ালের মত নিঃশব্দে আসে। ঘরে গিয়ে দেখবে, ইজি চেয়ারে দেহটা এলিয়ে দিয়ে টুলের ওপর পা দুটো তুলে টান টান হয়ে গঙ্গার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। গঙ্গা থেকে উঠে আসা ফুরফুরে হাওয়ায় ঘরের ভিতরের সব জিনিসপত্তর যে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মনটাকে সব কিছু থেকে যেন গুটিয়ে নিয়েছেন। চোখের সামনে আদিগন্ত নীল আকাশ চাঁদোয়ার মত ঝুলে আছে। পরপারে সারিবাঁধা গাছের সার স্তব্ধ হয়ে আছে। চতুর্দিকে শান্ত, সৌম্য ভাবের মধ্যে বিবেকানন্দ পুরোপুরি সমাহিত হয়ে যান।

নিবেদিতার আগমন তাই টের পেলেন না। নিঃশব্দে তাঁর খুব কাছে বসল। স্বামীজি দেখেও দেখল না তাকে। নিজের মধ্যেই মগ্ন হয়ে রইলেন। অধরে স্মিত হাসি। মুখে এক আশ্চর্য সমর্পণ তন্ময়তা।

হঠাৎই ভিতর থেকে দমকা কাশি উঠে এল। সারা শরীরটাকে আলোড়িত করে

কাশিটা হতে লাগল। মুখচোখ রাঙা হয়ে গেল। হাঁপানির কাশি একবার শুরু হলে থামতে চায় না। নিবেদিতা শান্তভাবে ওঁর বুকটা মালিশের মত করে ঢলে দিতে লাগল। তারপর কাশির বেগ একটু কমলে গ্লাস ভর্তি জল মুখের কাছে ধরল। তখনও হাঁপাচ্ছিলেন তিনি। নিবেদিতা ওঁর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, বড্ড কষ্ট হচ্ছে না। মুখে জল নিয়ে ভালো করে কুলকুচি করুন। হাতে ধরা খালি পাত্রটা দেখিয়ে বলল, উঠতে হবে না। এতে ফেলুন।

বাধ্য ছেলের মত স্বামীজি তাই করল। তারপর কিছুক্ষণ পরে ঢক ঢক করে জলটা খেলেন। নিবেদিতা ওড়নার প্রান্ত দিয়ে ওঁর ঠোঁটের কোণের জলটাকে শুষে নিতে নিতে বলল, এই পাজি অসুখটা আপনাদের মত লোকের হয় কেন? ঠাকুর রামকৃষ্ণও কত কষ্ট পেয়েছেন রোগের যন্ত্রণায়।

স্বামীজি ম্লান হেসে বললেন, তোমাদের যীশুকেও ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মর্মদাহী যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে তীরবিদ্ধ হওয়ার ভয়ংকর যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। আমরা কেউ জাগতিক নিয়মের ঊর্ধ্বে নই।

নিবেদিতা কথা বাড়াল না। চুপ করে ওঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। স্বামীজি চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে রইলেন। একবারও শিষ্যাকে নিষেধ করলেন না। বরং তার ঐ সেবার মধ্যে আত্মনিবেদনের বিনম্র আকুতি এবং ভালোলাগার গভীর গাঢ় নিরুচ্চার অনুভূতি বিন্দু বিন্দু আলোর মত স্পন্দিত হচ্ছিল তাঁর চেতনায়। স্বামীজি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তার আরাত্রিক পবিত্রতা অনুভব করছিলেন। সব আনন্দ ছাপিয়ে সে অনেক বড় হয়ে উঠল। এ এক নতুন অনুভূতি তাঁরও। অন্তরে অন্তরে নিবেদিতার এই সেবাটুকুর জন্য ভিতরটা তাঁর কাঙাল হয়েছিল। এই মুহূর্তে নিবেদিতার মনে হল সে যেন মূর্তিমতী সান্ত্বনা। মমতাময়ী জননীর মত তার স্নেহ কোমল স্পর্শ তাঁকে নবীকৃত করল। নতুন করে প্রাণ পেলেন তিনি। দিব্যভাবের উদ্ভাসিত ঔজ্জ্বল্যে স্থির হয়ে গেল তাঁর ভেতরের রোগযন্ত্রণাজনিত সব চাঞ্চল্য। চোখ বন্ধ করে ইজি চেয়ারে নিশ্চল হয়ে শুয়ে রইলেন। তাঁর ঐ শান্ত সমাহিত ভাবটা নিবেদিতাকে শান্ত থাকতে দেয় না। ভীষণ অস্থির করে তাকে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, আপনার জন্য ভাবনা হয়। নিশ্চিন্তে বসে কাজ করতে পারি না। মনটা এখানেই পড়ে থাকে। আপনি ছাড়া আমার তো কেউ নেই। বুক দিয়ে আপনার মত আগলে রাখার একজন মানুষও নেই। এখানে আমি বিদেশিনী। সমালোচনা করার অনেক লোক আছে। কিন্তু সমাদর করার মানুষ তো একজন। আপনি আমাকে এনেছেন। আমার জন্য অন্তত আপনার শরীরের প্রতি নজর দেওয়া উচিত।

বিবেকানন্দ ওর উদ্বিগ্ন অসহায়তার কথা শুনে হাসল। বিষণ্ণ করুণ হাসি। ধীরে ধীরে বললেন, মঠের কেউ তোমায় অসমাদর করবে না। তুমি নিজের গুণে সকলের আদরণীয় হয়েছ। তোমার ভার নেবার আমি কে? মার কাছে তোমাকে আমি সমর্পণ

করেছি। তিনিই তোমাকে পথ দেখাবেন। অবশ্যই বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন তিনি। আমি কারো ডাকে এখন সাড়া দিতে পারি না। তাই তো, অনেক দিন আগেই সকলের কাছ থেকে ছুটি নিয়েছি। জগতকে আমার দেবার কিছু নেই। আমি এখন মহাপ্রস্থানের পথের দিকে তাকিয়ে আছি। মার কোলে মাথা রেখে লম্বা ঘুম ঘুমোব।

নিবেদিতা ওঁর পায়ে হাত রেখে ক্লান্ত গলায় বলল, এসব কথা বলে আপনি হয়তো মজা পান কিন্তু আমি যে কত কষ্ট পাই তা কি জানেন? আপনার কণ্ঠে এত হতাশার কথা আগে শুনিনি। ইদানীং এত বেশি বলেন যে সত্যিই আমার কান্না পায়। কী অপরাধ করেছি যে এভাবে আমায় শাস্তি দেন?

মার্গট, যেদিকে ফিরছি কেবলই দেখছি মায়ের রূপ। মায়ের অনবদ্য প্রকাশ। ছোট্ট শিশুর মত তিনি আমাকে হাত ধরে নিয়ে চলেছেন। আমি তাঁর স্নেহের দুলাল, তাঁর হাতের পুতুল। তাই তো সব পরিকল্পনার সংকল্প, ইচ্ছে চিরদিনের মত বিসর্জন দিয়েছি। এখন আমি কৌপীন সম্বল সন্ন্যাসীর মত নিঃসঙ্গ কঠোর জীবন যাপন করতে চাই।

গুরুর দিকে মুখখানি তুলে ধরে নিবেদিতা বলল, গুরু আমার, পিতা আমার, নিবেদিতার জীবনব্রত যখন ফুলে ফলে ভরে উঠেছে, চতুর্দিকে সাফল্যের হাওয়া বইছে, সুনাম, সুফল সুগন্ধ পুষ্পের সৌরভের মত বিশ্বময় ছড়িয়ে যাচ্ছে তখন আপনার অনীহা আমাকে নিরুৎসাহ করে। সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে যখন পূজার ডালি সাজিয়ে নিবেদন করছি, তখন আমার দেবতা আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

কে বলল? তুমি মায়ের সন্তান। মার পূজার ডালি সাজিয়েছ। মা দু'হাত ভরে তোমার পুজো গ্রহণ করছেন। তাঁর পুজো আমি নেবার কে?

চমৎকার। আপনার মধ্যে এ আমি কোন রণক্লান্ত সৈনিককে দেখছি? পরাভবের ভয়ে ভীত হয়ে পলায়নপর এ কোন যোদ্ধাকে দেখছি? ইদানীং দীর্ঘশ্বাস, হাহুতাশ ছাড়া আপনার কণ্ঠে আর কোনো উদাত্ত আহ্বান শুনতে পাই না। মানুষ জাগানোর সেই মন্ত্রশক্তি কে কখন হরণ করল আপনার?

তোমার মনের অয়নপথ আমার অজানা নয়। তোমার একমাত্র চিন্তা গুরুর দেশ ভারতবর্ষ। এর সেবার জন্য, উন্নতির জন্য, মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছ। তোমার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ভারতবর্ষ। তুমি আমার সুর ও ঝঙ্কার। তোমাতেই আমি সম্পূর্ণ। সেই তো আমার গর্ব। কিন্তু আজকাল মানুষের ডাকে সাড়া দিতে ভীষণ কষ্ট হয়। একটু হাঁটা চলা করলেই হাঁপিয়ে পড়ি। ক্লান্তি লাগে।

নিবেদিতার হঠাৎই মনে পড়ল স্বামীজির শরীরটা ভালো নেই। বেশি কথা বলা নিষেধ। আর সে কিনা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বকাচ্ছে তাঁকে। ভীষণ আপসোস হল। নিজেকে তার ভীষণ অপরাধী মনে হল। তৎক্ষণাৎ তার ভিতরকার সব প্রশ্নকে চাপা দিয়ে বলল, সত্যি, আমি কী যেন। আপনার এই শরীরে বেশি কথা বলা বারণ। তবু

সেই অন্যায় করছি।

না, না, তোমার অনুতাপ করার মত কিছু হয়নি।

কী জানি? এই ঝগড়া কোনোদিনই শেষ হবে না আমাদের। চলে যাওয়ার জন্য নিবেদিতা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

নিবেদিতা যখন উঠতে যাবে সেই সময় ব্রহ্মানন্দ নরেনের কাছে এলেন। নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল। উভয়ের অধরদ্বয় স্ফুরিত হল। সৌজন্যমূলক হাসি বিনিময় করে পরস্পরের কুশল জিগ্যেস করল। ব্রহ্মানন্দ বললেন, ভালোই হলো তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে। বসে যাও, কিছু কথা আছে।

সকৌতুকে নিবেদিতা বলল, আমায় দেখে মনে পড়ল বুঝি।

ব্রহ্মানন্দ বলল, তা নয়, তবে তোমার জন্যে আসা। মিশন নিয়ে কিছু আলোচনা আছে। বিষয়টা আমার চেপে যাওয়া ঠিক হবে না মনে করেই তোমাকে অবহিত করছি। রামকৃষ্ণ মিশন ও সংঘের তুমিও একজন সভ্যা। তুমি যেমন মা ও নরেনের বিশেষ স্নেহের প্রাত্রী তেমনি আমাদের সকলের সমাদরের পাত্রী। আমরা মিলেমিশে যাতে মঠের উন্নতি করতে পারি তার জন্য প্রত্যেককে মঠের বিধি বিধান, নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়।

ব্রহ্মানন্দের কথায় নিবেদিতার রাগ হল ভীষণ। বলল, আপনার অভিযোগের লক্ষ্য আমি। কিন্তু নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করার মত কোনো গুরুতর অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আছে কি? ঠাকুর রামকৃষ্ণের নামে এই মঠের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন হলেন আমার গুরু। তিনি করুণা করে মঠের সেবিকা করেছেন আমাকে। গুরুর অসম্মান হয় এমন কোনো কাজ করতে কি পারি আমি? তাঁর কৃপা না পেলে ভারতকন্যা নিবেদিতার এই গৌরব কোথায় পেতাম? আমার সব উৎসাহের উৎস আমার গুরু। তাঁর অপযশ হয় এমন কাজ আমি করব না।

ব্রহ্মানন্দ অস্বস্তির ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্য বললেন, আমি বলছিলাম, যে স্বাধীনতার স্বাদ নরেন তোমাকে দিয়েছে তা তুমি কাজে লাগিয়েছ। মুক্ত বিহঙ্গের মত ডানা মেলে দিয়েছ তোমার ভাবনার আকাশে। জননেতা বিবেকানন্দ আর নরেনের মধ্যে বেঁচে নেই। তার ইতি হয়েছে। সে চলে গেছে চিরতরে। স্বাদেশপ্রেমিক বিবেকানন্দের কাজের ধারাটা তুমি ধরে রেখেছ। নরেনের অসম্পূর্ণ কাজ তুমি নিজের কাঁধে নিয়েছ। এর মধ্যেই সর্বত্র একটা প্রাণস্পর্শী উদ্দীপনা সঞ্চার করেছ। নরেনের স্বাদেশিকতার বীজ এ দেশের যুবসমাজের মনে এমন করে অঙ্কুরিত করে দিয়েছ যে তাদের মরতেও ভয় নেই। নরেন যেখানে থেমে গেছে সেখানে তোমার যাত্রা শুরু। সারা ভারতে তার সুফল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন তোমার চোখে। বালগঙ্গাধর তিলক, মহাত্মা গান্ধীর মত রাজনৈতিক নেতা, স্বদেশপ্রেমিক, ওডা ও ওকাকুরার মত সাংস্কৃতিক কর্মী তোমার গৃহে এসেছে। তুমি বোধ হয় ভারতবর্ষকে

একটা জায়গায় পৌঁছে দিতে পেরেছ। সেজন্য মঠবাসী গর্বিত। তোমার সাফল্যে আমিও খুশি। তোমার কাজের ভালোমন্দ এবং তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার কথা বলার কোনো ইচ্ছে নেই।

নিবেদিতা অসহিষ্ণু হয়ে বলল, তাহলে দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন কী? যা বলতে চান অসংকোচে বলুন। কোনো প্রতিকূলতাকে আমি ভয় পাই না।

বিবেকানন্দ নিবেদিতার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, পৃথিবীতে কাজ করে দু'চারজন। তাদের কাজের পথ মসৃণ নয়। তবু ওই বাধা-বিপত্তি ঠেলে সাফল্যের স্বর্ণতোরণে পৌঁছতে তারা একটুও ক্লেশ বোধ করে না। এই জনকয়েক সাহসী উদ্যোগী পুরুষ ইতিহাস সৃষ্টি করে। তাঁরাই সভ্যতার ধারক ও বাহক। তুমিও প্রাণ ঢেলে কাজ করে যাও। কাজই তোমার দেবার্চনা।

ব্রহ্মানন্দ থমথমে গম্ভীর গলায় বলল, ওকাকুরা আসার পর থেকে তোমার কাজের ধারা পাল্টেছে। তোমার চিন্তায় বিপ্লবের রঙ লেগেছে। রাজনৈতিক বিপ্লব বিদ্রোহের দিকে ঝুঁকেছ। ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে তোমার জেহাদ আজ আর গোপন নেই। পুলিশ তোমার ওপর নজর রাখছে। তোমার চিঠিপত্তর খুলে দেখছে। পোস্টমাস্টার জেনারেলের কাছে তুমি তার প্রতিবাদ করেছ। পুলিশ তোমার খোঁজে মঠে আসে। তোমার গতিবিধি চোখে চোখে রাখে। একটু আগেই দুজন সাদা পুলিশের লোক এসেছিল। নরেনের বাঘা তাদের গার্ড অব্ অনার দিয়ে অফিস পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। সেকথাই নরেনকে বলতে এসেছিলাম। তোমার সঙ্গে আচমকা দেখা হল বলেই কথাটা সূত্রপাত করে রাখলাম। মঠ একটা প্রতিষ্ঠান। তার একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। সেগুলো একজন ব্যক্তির মনঃপূত নাও হতে পারে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ব্যক্তি বড় নয়। মঠের আদর্শ ও পরিকল্পনার সঙ্গে তোমার নিজস্ব ভাবনা-চিন্তার সংঘর্ষ হয় এমন কাজ কর না। বিরোধ এড়িয়ে চল।

ব্রহ্মানন্দের কথাটা নিবেদিতার মনে ধরল না। বরং ক্ষুণ্ণ করল তাকে। কথা বলার সময় লজ্জায়, অপমানে তার ভুরু কোঁচকাল। বলল, পুলিশের কথা জানি না। আমার কথা বলতে পারি। ভারতের জন্য কিছু করছি এ অহংকার আমার নেই। বরং বলা ভালো, আমি শিখছি। চারাগাছ কেমন করে বেড়ে ওঠে তা পর্যবেক্ষণ করছি। ওটিকে রক্ষা ও যত্ন করা ছাড়া আমার কোনো কাজ নেই। ভারতবাসীর নির্বিকার ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্ত স্বভাবের জন্য একদিন দস্যুদল ভারতের জমি জমা-সম্পদ সম্পত্তি দখল করে নিয়ে নিজ গৃহে তাকে পরবাসী করেছিল। ভারতবর্ষকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনার জন্য অনুপ্রবেশকারী বিদেশীদের তাড়াতে হবে। আমি সেই বিদেশীদের অপশাসনের বিরুদ্ধে, তাদের দালালদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে সতর্ক ও সাবধান করার ব্রত নিয়েছি। লেখাপড়া শিখিয়ে নিজের অধিকার বোঝানোর জন্য সময় দরকার। রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করলে সব অধিকার দ্রুত অর্জন করবে। নিজের অধিকার নিজে বুঝে

নিলে সে দ্রুত স্বাবলম্বী হবে। কর্মের জোয়ার আসবে। নিজের ঘর তারা নিজেই গুছিয়ে তুলতে পারবে। তাই ভারতের পক্ষে যা কিছু ভারতীয় তা আমার কাছে নমস্য। আমার কাজ দেশের লোকদের পক্ষে প্রাণের জিনিস হয়ে উঠবে। এজন্য ছোট ক্ষতি যেটুকু হবে তা বৃহত্তর কল্যাণের তুলনায় নগণ্য। ওইটুকু তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত। আমার কাজ হল মানুষকে স্বপ্ন দেখানো। আমাকে ভুল বুঝবেন না। ভারতবাসী নিজের অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ বলে তাদের এত দুরবস্থা। অধিকারের স্বাদ পেলে সে জীবন দিয়ে লড়বে। মানে হুঁশ হলে সে মানুষ হয়ে উঠবে। আপনাদের নরেন একদিন মানুষের হৃদয়ে তার দীপ জ্বেলে দেবার কাজ শুরু করেছিল। আমার গুরুর সেই অম্লান শিখাটি এদেশবাসীর প্রাণে প্রদীপ করে জ্বালানোর ব্রত নিয়েছি। আমার গুরুর স্বপ্নকে রূপ দিতে হবে। আশা করব আপনার বিশাল হৃদয়ে আমার এ-সব ভাবনা আশ্রয় পাবে।

ব্রহ্মানন্দ কথা বলতে পারল না। যে নিবেদিতা ইংরেজ জাতির পতাকাকে ইষ্টদেবতার মত প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা করত বলে নরেন তাকে একদা তীব্র ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করেছিল তার প্রাণে আজ একোন উল্টোস্রোত বইছে। তার বিদেশিনী পরিচয়টা একেবারে মুছে গেছে। ব্রহ্মানন্দ এক আশ্চর্য মুগ্ধতা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কারণ, দেশ নামক কোনো ভাবমূর্তির কাছে নরেন তাকে নিবেদন করেনি। তবু নরেনের স্বদেশচেতনার পথ ধরে ভারতকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য যুবশক্তিকে উদ্দীপিত করার ব্রত নিয়েছে। দেশকে বিদেশী শাসকের অমানবিক অত্যাচার, লাঞ্ছনা এবং কার্যকলাপ থেকে মুক্ত করার সংগ্রামও এক ধরনের মানবসেবা। একজন বিদেশিনী হয়ে ভারতের হিতার্থে যে কাজ করছে কোনো ভারতীয় তা করেনি। সেজন্য মার্গটের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ব্রহ্মানন্দের মনটা নুয়ে গেল।

শিষ্যার বাক্যে আপ্লুত হল বিবেকানন্দ। এক অদ্ভুত অপার্থিব মুগ্ধতার ভার নেমে এল তাঁর মুখমণ্ডলে। প্রশান্তির অনুভূতিতে তাঁর দু'চোখ বুজে ছিল। কয়েকটা মুহূর্ত কাটার পর বিবেকানন্দ মৃদু কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন, মার্গট, তুমি এখন স্বাধীন। তোমার কোনো কাজে আমার বাধা দেবার অধিকার নেই। রামকৃষ্ণ সংঘ সন্ন্যাসীদের সংঘ। এখানে তোমাকে আমি এনেছি। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। তাই রাজনীতিতে তুমি জড়িয়ে পড়লে তার সব দায় আমার ওপর বর্তাবে। যদিও তোমার স্বাধীনতার লড়াই এখনো রাজনৈতিক রূপ পায়নি, আলোচনা পর্যায়ে রয়েছে তবু এখন থেকে সামলে চললে সবদিক রক্ষে পায়। এরা জানে না, কিন্তু আমি জানি, মাঝে মাঝে একটা হুজুক তোমাকে পেয়ে বসে। প্রথম হুজুগ ছিল ব্রাহ্মদের নিয়ে মেতে ওঠা, দ্বিতীয় হুজুগ হলো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে মেলামেশা করা, এখন হয়েছে ওকাকুরার রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে তোলা। মনে হয়, অন্য সবের মত এটিও একদিন কেটে যাবে। তুমি আবার নিজের জায়গায় ফিরবে।

আকস্মিক অপ্রিয় প্রসঙ্গে নিবেদিতা কথার খেই হারিয়ে গেল। জবাব দিতে পারল

না। শুধু অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর বারান্দায় এসে দাঁড়াল। গ্রীষ্মের বেলা। চট করে পড়ে না। তখনো রোদ রয়েছে গাছের মাথায় মাথায়।

স্বামীজি অনুভব করলেন, প্রিয় শিষ্যার ওপর বড় বেশি কঠোর হয়েছেন। এতখানি রূঢ় না হলেও চলত। তবু তার রাজনীতি চর্চা নিয়ে মঠের সন্ন্যাসীদের একটা চাপা গুঞ্জন চলছিল। সেটা নস্যাৎ করার জন্যই এই শাসনটুকু করলেন। কিন্তু করেও নিজে শান্তি পেলেন না। মনটা তার জন্য আর্ত হল। সস্নেহে ডাকলেন, মার্গট, কাছে এস। আমাকে একটু তামাক সেজে দেবে? সারাদিন হুঁকোতে মুখ দিইনি। কথাটা শেষ করে খুব কাশলেন বিবেকানন্দ। কাশির দমকে মুখ চোখ রাঙা হয়ে গেল।

অভিমানে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারল না নিবেদিতা। বুক ভাসিয়ে এল তার করুণা, মায়া, গভীর এক ভালোবাসা। সেই দুকূল ছাপানো ভালোবাসা নিয়ে নিবেদিতা দৌড়ে এল তাঁর কাছে। কাশি থামলে বলল, এত কাশি নিয়ে তামাকটা নাই-বা খেলেন?

বিবেকানন্দ একটু ম্লান হেসে বাধ্য ছেলের মত ওর চোখের ওপর চোখ রেখে বললেন, তুমি যখন বারণ করছ তখন থাক।

।। দশ।।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত বিবেকানন্দের ঘুম হল না। ইদানীং ঘুমটা তাঁর ভীষণ কমে গেছে। রাতে ঘুম ভাঙলে ঘুম আসে না। তখন ধ্যান করতে বসেন। একটুতে সমাধিমগ্ন হয়ে পড়েন। সে সময় বাহ্যজ্ঞান থাকে না। রাত কখন শেষ হয় জানতে পারেন না। সকালে বাঘার ডাকে ধ্যান ভাঙে। পোষা হাঁস ও সারসের কণ্ঠ ভোর হওয়ার সাথে সাথে কলকলিয়ে ওঠে।

খোলা জানলা দিয়ে শেষরাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথা ভার হয়। একটু যন্ত্রণাও টের পান। সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট হয়। খুশখুশ কাশি হয়। নিস্তেজ শরীরে প্রাতঃকৃত্যাদি করলেন। তারপর প্রাতঃভ্রমণ করতে গঙ্গাল তীর ধরে একটু হাঁটেন। বাঘা ওঁর পিছনে পিছনে যায়। একটুখানি হেঁটেই ক্লান্ত হয়ে সানবাঁধানো ঘাটের ধাপে বসে পড়েন। বাঘা কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঁর পাশেই শুয়ে প্যাট্ প্যাট্ করে চেয়ে থাকে। বাঘার কাণ্ড দেখে বিবেকানন্দ হাসে আর বলে এভাবে আর কতকাল আমায় পাহারা দিবি? দিন ফুরিয়ে আসছে। তারপর তোর ছুটি।

বাঘা কী বুঝল সেই জানে। মুখ ব্যাজার করে স্বামীজির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে গলাটা টান টান করে শুলো।

রোদ উঠার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে ঠাণ্ডা ভাবটা কমল। গাছের ডালে হরেক রকম পাখি আপন খুশিতে কিচিরমিচির করছে। আমগাছের ডালে আমগুলো হাজার হাজার চোখ হয়ে যেন তাঁর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। ভগ্নস্বাস্থ্য বিবেকানন্দ হতাশ চোখে লোভীর মত চেয়ে থাকেন আম্রকুঞ্জের দিকে। গাছের পাতায় পাতায় প্রিয় আম ঝুলে আছে। স্বাস্থ্যের কারণে ওই সুমিষ্ট আমের এক চাকলাও মুখে দিতে পারেন না। মনের কষ্টে বললেন, এভাবেই তোরা মুখ বুজে দেখবি অনন্তকাল। আমার জীবনের অনেক বেদনা, দুঃখ, যন্ত্রণার সাক্ষী হয়ে থাকবি তোরা। যখন থাকব না তখন তোদের দিকে তাকিয়ে লোকে আমার কথা বলবে। পাতায় পাতায় দীর্ঘশ্বাস মর্মরিত হবে। কথাগুলো তাঁর বক্ষস্থল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল। চোখটা হঠাৎ ছল ছল হল। নিজেই হাসলেন। বললেন, মায়বদ্ধ জীবের মায়া কাটল কৈ ?

বিবেকানন্দ ঘাট থেকে উঠে ঘরে ফিরলেন। একটা চেয়ার নিয়ে বারান্দায় বসলেন। মনটা ভার হয়ে আছে। কিছুতে স্বস্তি পাচ্ছেন না। কোথায়, কী যেন একটা দুর্ঘটনা ঘটে

গেছে তাঁর। গতকাল নিবেদিতাকে তিরস্কার করা থেকে মনটা ভালো যাচ্ছিল না। নিবেদিতাই ঠিক বুঝেছে ভারতবাসীর মুক্তির জন্য সর্বাগ্রে চাই রাজনৈতিক মুক্তি। ইংরেজ চোখ রাঙাচ্ছে, পেটাচ্ছে, যা খুশি দৌরাত্ম্য করছে তবু তার কাজের প্রতিবাদ করার জন্য রাগে একজনও ফেটে পড়ছে না। ভিতরে ভিতরে ছটফট করে তবু মুখ বুজে সহে যায়। মিন মিন করছে বলেই সেন্টিমেন্ট তৈরি হচ্ছে না। নিবেদিতা সেই আবেগ সঞ্চারিত করার জন্য বলছে, তোমাদের চোখ, কান, মগজ তো কারও কাছে বাধা দাওনি। বরং চুপ করে থেকে, অত্যাচার মেনে নিয়ে একজন মারাত্মক অপরাধীকে যেভাবে আড়াল করে রাখছ তা মোটেই ভালো ব্যাপার নয়। আমি কিছুই করতে পারি না। আপনাদের বেঁচে ওঠার জন্য একটা সেন্টিমেন্ট তৈরি করতে পারি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, প্রতিরোধ করা মানুষের ধর্ম। এদেশের মানুষ শুধু মানুষ হয়ে উঠুক। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'মানে' হুঁশ হলেই সে মানুষ হয়ে উঠবে। কাজটা শক্ত মনে হলেও অসম্ভব কিছু নয়। আপনারা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে মাথা ঘামান। নিজের জন্য, দেশের জন্য কিছু চাওয়া রাজদ্রোহিতা হতে পারে কিন্তু দেশদ্রোহিতা নয়। এরকম তেজী ও প্রাণভয়হীন যুবকের আত্মদানের কথা, দেশপ্রেমের কথা আগুনের অক্ষরে লেখা থাকে।

নিবেদিতার কথাগুলো অজান্তে তাঁর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল। অমনি তার জন্য মন কেমন করে উঠল। মেয়েটা তাঁর জন্য অনেক সইছে। নিবেদিতার জন্য সত্যি তাঁর কষ্ট হয়। শ্বাসটা দ্রুত হয়। হাঁফ ধরে। ইজি চেয়ারে এক আচ্ছন্নতার সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করতে করতে নিজের মনে নিরুচ্চারে বললেন, সব সময় তোমায় আমি আশীর্বাদ করছি। অফুরন্ত শক্তির আধার হও। স্বয়ং জগদম্বা তোমার দেহমনে আবিষ্ট হোন। তোমার মাঝে চাই দুর্নিবার বিপুল শক্তির উদ্বোধন। আর সেই সঙ্গে অসীম শান্তিও। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি সত্যের ঠাকুর হন তাহলে আমায় যেমন তিনি চালিয়ে নিয়েছেন, তেমনি করে তোমায়ও চালিয়ে নিন। কিংবা তার চাইতেও হাজারগুণে সার্থক করুন তোমায়।

এর পরের দিনগুলো ভারি কষ্টের। মনকে কিছুতে প্রবোধ দিতে পারেন না। ব্রহ্মানন্দকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে নিবেদিতার ওপর অবিচার করার জন্য একধরনের অপরাধবোধ তাঁকে কুরে কুরে খায়। নিজের জন্য তার কোনো চাওয়া নেই। স্বার্থহীন দানের ডালি নিয়ে যে দেশমাতৃকার পূজোর অর্ঘ্য সাজিয়েছে, সে তিরস্কারের উর্ধ্বে। তার অপমানটা কাঁটার মত বিঁধছিল তাঁকে।

দিনগুলো নানা কারণে তাঁর কাছে দুঃসহ হয়ে উঠছিল। ভগ্নস্বাস্থ্য, কর্মক্লান্ত দেহটি তাঁর কাছে বোঝা বোধ হয়। এথেকে মুক্তি পাওয়াই ছিল তাঁর কাম্য। কিন্তু চাইলে তো সব পাওয়া যায় না। সব কিছুর জন্য একটা সময় থাকে। সেই সময় পর্যন্ত এভাবেই কাটাতে হবে। কিন্তু এভাবে অস্তিত্বের দাস হয়ে টিকে থাকার যন্ত্রণা প্রতিমুহূর্ত ক্লান্ত

করে তাঁকে। নিজেকে মনে হল এক স্থবির বৃক্ষ। তার স্নিগ্ধ ছায়া আছে, নিশ্চিত আশ্রয় আছে। ঐটুকু ছাড়া দেবার আর কিছু নেই। থমথমে মুখ করে সামনের দেয়ালের দিকে মুখ করে চেয়ে রইলেন। উন্মুক্ত গঙ্গা থেকে উন্মাদ বাতাস ছুটে আসছে। লয় করে দিচ্ছে তাঁর সত্তা। হারিয়ে যাচ্ছে চিন্তাশক্তি। এমন কি অহংবোধ পর্যন্ত।

সকাল থেকে মেঘ করেছিল। আচমকা ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামল। বড় বড় ফোঁটা মাটির ওপর দাপাদাপি করছিল। খৈ ফোটার মত উন্মাদ বৃষ্টির শব্দ, তবু নজর কেড়ে নিল না তাঁর। নিজের মধ্যে সমাহিত হয়ে রইলেন তিনি। বেশ বুঝতে পারছিলেন, নিবেদিতার ভাবনাটা এক উপচানো আনন্দ হয়ে তাঁর মনে বিরাজ করছিল। সেই অসহনীয় সুখবোধের সঙ্গে নিঃসঙ্গতার বেদনা মিশে ছিল। বৃষ্টির শ্বাসের সঙ্গে টের পেলেন বিবেকানন্দ কারো জীবন্ সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক নয়। মনই নব নব সমস্যার জট পাকিয়ে তোলে। নইলে মনের অভ্যন্তরে কেন এত প্রদোষের রহস্যময় আলো আঁধারি।

তলব পেয়ে সদানন্দ এল তাঁর ঘরে। বিবেকানন্দ টের পেল না তার আগমন। সদানন্দ তাঁর অন্যমনস্ক দেখে রঙ্গ করে বলল, এমন সুন্দর বৃষ্টির দিনেও মন ভালো নেই।

একটা অদ্ভুত বোবা ভাব নিয়ে বিবেকানন্দ চোখ তুলে তাকালেন। বললেন, মনের আর দোষ কি, ছোটো মনের ছোটো স্বার্থের মানুষজনের মধ্যে অহরহ বাস করতে করতে আচমকা হাওয়ায় ভেসে আসা সুগন্ধের মত সৌরভযুক্ত মানুষকে পেলে জীবনটা অন্যরকম হয়ে যেতে চায়। তখন স্পর্শকাতর মনটিই সবচেয়ে কষ্ট পায়। সেকথা পাঁচজনকেও বলার নয়। একা একা মনের মধ্যে তার রোমন্থন করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

সদানন্দ চুপ করে রইল। মানুষ মাত্রেই হৃদয়ের কথা বলার জন্য সঙ্গী খোঁজে। বোধ হয় সব কথা একান্ত মনের মানুষকেও বলা যায় না। মনের মধ্যে করতকমের দুর্বলতা থাকে সে সব কথা বলা মানে নিজেকে ছোট করা। তাই তো মানুষ নিজের কাছে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। বিবেকানন্দও নিজের কাছে নিজেকে লুকোচ্ছে। কিন্তু সত্যি কী লুকোনো যায়? মুখের ডৌল রেখাগুলি, চোখের দৃষ্টি বলে দেবে কী যেন গোপন করছে। মনের কথা বলতে না পারার শূন্যতা কতখানি হৃদয় থাকলে সে বুঝে নেবে। বিবেকানন্দও সদানন্দকে ফাঁকি দিতে পারল না। যে এত শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে তাকে কি ফাঁকি দেওয়া যায়? সদানন্দ কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বলল, বিকেলে বাগবাজারে গেলে কেমন হয়। নিবেদিতার স্কুলের কাজকর্ম কেমন হচ্ছে দেখা হবে, মায়ের বাড়ি ঘোরা হবে। বাইরের অফুরন্ত আলো-হাওয়ার সংস্পর্শে মনটাও চাঙ্গা হবে। একঘেয়ে ক্লান্তিকর বিষণ্ন ভাবটা গেলে শরীরটাও ভালো লাগবে। আমি বরং একটা নৌকোর ব্যবস্থা করি।

বিবেকানন্দ অবাক হল। সদানন্দের দিকে দুই চোখ বিস্ফারিত করে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। মনে হল, সদানন্দ ভালোবাসার চোখ দিয়ে তাঁর অন্তরটা দেখে ফেলেছে। হাতে নাতে তার কাছে ধরা পড়ে গেছেন। নিজেকে আড়াল করার চেষ্টায় বললেন, হাঁপানির টানটা আছে। রোগা শরীরে ঠাণ্ডা হাওয়া বাতাস সহ্য হয় না। এমনিতে রোগে ভুগে তোমাদের বোঝা হয়ে উঠেছি। এটা করা কি ঠিক হবে?

সদানন্দ প্রত্যুত্তরে বলল, না হওয়ার কী আছে? বাইরে না বেরিয়ে বেরিয়ে আপনার ভয় ধরে গেছে। সব মানুষের রোগটা যতটা শরীরে তার চেয়ে বেশি মনে। মনের কারণে একজন মানুষ বেশি রুগ্‌ণ হয়। নিজেকে রুগী ভাবলেই রুগী, নইলে তার কোনো রোগ নেই। থাকলেও কাবু করে না। রুগ্‌ণতা অসুস্থ মানুষের মনের বিনাশ। আমি এই জীবনে তা বহুবার বহুলোকের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি। আপনার কিচ্ছু হয়নি। ইদানীং মৃত্যুচিন্তাই আপনাকে দেহে মনে জড়বৎ করে রেখেছে। নিজেই স্থবিরতার শিকার হচ্ছেন।

স্বামীজি থমকে তাকালেন সদানন্দের দিকে। সদানন্দ ধ্যানের আসন থেকে তাঁকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে এনে প্রমাণ করতে চাইল আর পাঁচজনের মত তিনিও ভীষণভাবে সুস্থ। এ'হল তাঁর শোধরানোর কথা। মনে মনে বিবেকানন্দ তার কথাগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে বললেন, তোমার কথাগুলো আমার মনে ধরেছে। কিন্তু জোর করে সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করলে কিংবা রোগ থেকে দূরে সরে থাকার চেষ্টা করলে কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? জানি না। তবে চেষ্টা করেদেখতে দোষ কী? শুভস্য শীঘ্রম। আজই বাগবাজার যাওয়ার সব ব্যবস্থা কর। তুমিও আমার সঙ্গে থাকবে।

কার্যোপলক্ষে নিবেদিতা স্কুল থেকে বাইরে যাচ্ছিল। বেরোনোর পথেই আচমকা বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এভাবে অসময়ে স্বামীজির সঙ্গে বাগবাজারের গলিতে সাক্ষাৎ হতে পারে আদৌ ভাবেনি সে। তাই প্রাথমিক বিস্ময়টা কাটিয়ে উঠতে তার কিছু সময় লাগল। সেই মুহূর্তে কথা বলার অবস্থা ছিল না তার। আনন্দে মুখচোখ উদ্ভাসিত হল। বুকের ভেতর একটা আশ্চর্য সুখানুভূতি ঢেউ দিয়ে গেল।

নিবেদিতার দুই চোখ বিবেকানন্দের চোখের ওপর স্থির হয়ে রইল। একবারও পলক পড়ল না। বিবেকানন্দই একটু হাসলেন। অত্যন্ত সরল হাসি। কোথাও তাঁর মধ্যে অপ্রতিভভাব ছিল না। সহজভাবে বললেন, তোমার স্কুল দেখতে এসেছিলাম। কথাটা এমনভাবে বললেন যেন তাঁর অপরাধ রাখার জায়গা নেই। তারপরে একটু অবাক হওয়ার ভান করে জিগ্যেস করলেন, মনে হচ্ছে তুমি কোথাও যাবে?

অভিভূত ভাবটা তখনও কাটেনি নিবেদিতার। বলল, নিজে থেকে আমার স্কুল

দেখতে এসেছেন এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। কী যে আনন্দ হচ্ছে তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু, একটা খবর দিয়ে তো আসতে পারতেন। আর একটু দেরি হলেই তো বেরিয়ে পড়তাম। ভাগ্যিস তা হয়নি। যদি হতো তা হলে ভীষণ বিশ্রী লাগত। অসুস্থ শরীরে এত পথ এসে যদি ফিরে যেতেন তাহলে ক্ষমা করতে পারতাম না নিজেকে। কিন্তু ঈশ্বর যে তা করেননি সেজন্য কোটি কোটি প্রণাম তাঁকে।

বিবেকানন্দ নিস্পৃহভাবে বললেন, কিছু আশা করা অন্যায়।

নিবেদিতার গনগনে অভিমানের গায়ে রাগের বাতাস লাগল। বলল, আপনি তে' বলবেন। স্কুল দেখতে এসে স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভেতরে চলুন। হলোই বা মেয়েদের স্কুল? আশ্রমের পিতার প্রবেশের তো কোনো মানা নেই। ভাগ্যিস বাইরে এসেছিলাম, নইলে এখান থেকেই হয়তো বেলুড়ে ফিরে যেতেন। কী সাংঘাতিক মানুষ আপনি! মার্গট, জানতেও পারত না, দ্বার থেকে তার প্রভু ফিরে গেছেন। আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন কেন, বলুন তো? আমি কী করেছি আপনার? যদি দোষ করে থাকি তাহলে তিরস্কার করুন, ভর্ৎসনা করুন, শাস্তি দিন। দয়া করে অবহেলা করে, অবজ্ঞা করে অপমান করবেন না। বলতে বলতে তার দু-চোখ ছলছল করে উঠল।

স্বামীজির অধরপ্রান্তে স্মিত হাসি। একটু মজা করার জন্য বললেন, তুমি কি আমার সঙ্গে শুধু ঝগড়া করবে।

অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে নিবেদিতা বলল, আপনি শুধু ঝগড়া করতে দেখেন আমায়। কিন্তু ঝগড়াটা হলো কৈ? যদি হয়েই থাকে তবে নারী-পুরুষের সুস্থ সম্পর্ক ঝগড়াতেই তৈরি হয়।

বিবেকানন্দ ওর কথাশুনে আবার হাসলেন। বললেন, এভাবে দাঁড়িয়েই থাকব? কেমন আছি জিগ্যেস করলে না তো?

নিবেদিতা হঠাৎই চুপসে গেল। রাগ-অভিমান নিমেষে এক গভীর অপরাধবোধে আক্রান্ত হয়ে তাকে পীড়া দিতে লাগল। আপন অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে বলল, সত্যি ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে। আমি যেন কী। আসলে সব দোষ আপনার। মেয়েদের স্কুল বলে ভেতরে ঢুকতে যদি সংকোচ হয় তাহলে আমাকে তো খবর দিতে পারতেন। নিজেকে এভাবে ধরা ছোঁয়ার বাইরে রাখলেন কেন? আপনাকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই তো মাথাটা গরম হয়ে গেল।

নিরীহভাবে বিবেকানন্দ বললেন, চুপি চুপি স্কুলের কাজকর্ম দেখে চলে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু গোয়েন্দাগিরি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়ব ভাবিনি।

ওঁর কথা বলার ভেতর এমন একটা সরস কৌতুক ছিল যে নিবেদিতা ফিক্ করে হেসে ফেলল। বলল, খুব হয়েছে। আর রসিকতা করতে হবে না। স্কুল দেখবেন চলুন।

যেতে যেতে নিবেদিতা বলল, কতদিন পর বাগবাজারে এলেন বলুন তো?

তা ঠিক। মন চাইলেও শরীর পারে না। তুমি তো আছ, আমার সাহায্যের তো দরকার নেই। আপনা থেকে সব হয়ে যাবে। মা তোমাকে সেবায়েত করে নিয়েছেন। কোনো বিপদ, বাধা, অশুভ তোমাকে স্পর্শ করবে না।

স্বামীজিকে ঘুরে ঘুরে বিদ্যালয় দেখাল নিবেদিতা। স্বামীজিও কী এক গভীর মমতায়, স্নেহে, ভালোবাসায়, শ্রদ্ধায় ঘরের দেয়ালে, খিলানের থামে, জানলা-দরজার কপাটের গায়ে হাত দিয়ে তার স্পর্শ নিলেন। উঠোনের ডুমুরগাছটির পাতায় গায়ে হাত বোলান। নিবিড় এক স্পর্শসুখে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললেন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এইসব জিনিসগুলো অনেককাল ধরে ঠিকঠিক থাকে, কেবল মানুষ থাকে না।

বিবেকানন্দের কথার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা নিবেদিতার অন্তরকে স্পর্শ করল। স্বামীজি আগে কখনও এত উতলা হননি, বা এমন করে হারিয়ে ফেলেননি নিজেকে। তাই প্রশ্নয় ভরা এক অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল নিবেদিতা।

স্বামীজির ভাবান্তর নিবেদিতাকে ভিতরে ভিতরে ভীষণ যন্ত্রণা দেয়। প্রতিকারহীন এক যন্ত্রণায় তার বুকটা টাটায়। তাই কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। তারপর থমথমে গলায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, আমার স্কুল যে কত ভালোবাসার ধন সমস্ত ইন্দ্রিয় চিংড়ে আপনি যেভাবে অনুভব করলেন তা দেখাও পরম সৌভাগ্য। আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই।

বিবেকানন্দ একটু মৃদু হেসে বললেন, অনুভূতি না থাকলে মানুষ বড় কিছু করতে পারে না। অন্যের অনুভূতিকে নিজে উপলব্ধি করা শুধু নয়, নিজের অনুভূতি বলে বোধ হলে তবেই সমত্ব প্রাপ্ত হয়। দুর্ভাগ্য আমাদের দেশে কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না। এটা আমাদের চরিত্রের দোষ। ভালোকে সমাদর করতে শিখল না বলেই খেসারত দিতে দিতে জাতটা দেউলে হয়ে গেল। শুধুমাত্র একটু সৎ অনুভূতির অভাবেই আমাদের দেশটা সুন্দর হতে পারল না।

বিগলিত এক খুশি খুশিভাব নিবেদিতার মুখখানি শ্রীময় করে তুলল। মুখখানা ভরে এক লাজুক অপ্রতিভ হাসি। বিবেকানন্দের পাশে দাঁড়িয়ে সে অনেক বড় একটা কিছুকে অনুভব করে। রক্তের কলধ্বনিতে স্বামীজির আহ্বান টের পায়। প্রেমপ্রদীপ্ত জীবন চাই, স্বার্থহীন মানুষ চাই, চাই জ্বালাময়ী বাণী, আর জ্বলন্ত জীবন্ত কর্মসাধনা। কথাগুলো মনে হতে তার গায়ে কাঁটা দিল। ভিতরে ভিতরে এক অদ্ভুত অকারণ আনন্দ ঢেউ দিতে থাকে। সে কোথাও বাধা থাকবে না। সামান্য নারী হয়েও বেঁচে থাকবে না। গুরুর ইচ্ছে পূরণের জন্য তার কিছু করার আছে। গুরুকেই সে তার কাজের ভেতর মূর্ত করে তুলতে চায়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিবেকানন্দ বললেন, স্কুলটি তোমার ভালোবাসা দিয়ে মোড়া। রুচিশীল অনুভূতিপ্রবণ মনের ছাপ রয়েছে সর্বত্র। ভালোবাসা, দরদ, মমতা, দিয়ে সাজিয়েছ প্রতিটি কক্ষ। স্কুলে পা রাখলেই সেটা টের পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দকে দেখে মেয়েরা গুরু মহারাজ কী জয় বলে জয়ধ্বনি দিল। অমনি এক অনাবিল আনন্দে ও গৌরবে তাঁর বুক ফুলে উঠল। নিজের শ্বাসে মৃদুকম্পনে তা টের পান। নিবেদিতার ত্যাগ ও নিষ্ঠার প্রতি তাঁর অটুট বিশ্বাসের ফলশ্রুতি এই বিদ্যালয়। মুখে চোখে তাঁর এক অদ্ভুত কৃতজ্ঞতার ভাব নেমে এল। নিরুচ্চারে বললেন, মার্গট, এ তোমার গুরুদক্ষিণা। গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়। তারপর মার্গটের চোখে চোখ রেখে বললেন, উদ্যোগী মানুষ কোথাও হেরে যায় না। থেমেও থাকে না তার কাজ। কাজের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা সব কিছুকে স্বর্গ করে তোলে। প্রতি শ্রেণীকক্ষের দেয়ালের গায় এবং মেঝেতে আলপনা আঁকা। শেখানোর জন্য দেয়ালে কত রকম চার্ট টাঙানো। বাচ্চাদের মন আকর্ষণের জন্য শিক্ষামূলক মাটির খেলনা দিয়ে আলমারি ভরেছ। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মত বিস্ময়কর একটা বস্তুও তুমি সংগ্রহে রেখেছ। লেখাপড়া করার আদর্শ পরিবেশ তোমার কল্পনা দিয়ে রচনা করেছ। অন্তঃপুরের বন্দিনী বালিকাদের কাছে এক নতুন জগতের দরজা খুলে দিয়েছ। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোয় ঘর ভরে গেছে। কত অনায়াসে ওদের মনের বেড়াগুলো টপকে এক অসম্ভব রূপময় জগতে প্রবেশ করার তীব্র তৃষ্ণা সৃষ্টি করেছ। তোমার বিদ্যামন্দিরে মনে হচ্ছে আর্যঋষির তপোবন। বৃক্ষমূলের বেদিতে আচার্যের পাশে বসে শিষ্যরা পাঠ নিচ্ছে। জ্ঞান ও উপলব্ধি মহিমা তাদের মুখমণ্ডলে স্নিগ্ধ আভা ছড়াচ্ছে। ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, শ্রীরামকৃষ্ণ তোমার কাছে এই দেশসেবাই প্রত্যাশা করছেন। এটাই তোমার স্বক্ষেত্র। এদেশের হতভাগ্য মেয়েদের একাধারে তুমি জননী, ভগিনী, শিক্ষিকা। এই কাজেই তুমি অমর হয়ে থাকবে। মরেও স্বর্গলাভ করবে।

স্বামীজির প্রত্যেকটি বাক্য মালার মত গাঁথা হয়ে তার মনে সৌরভ ছড়াতে লাগল। মনে হল, স্বামীজির মধ্যে গুরু আর নেই, তিনি শূন্যে মিলিয়ে গেছেন। যিনি আছেন তিনি তার গুণগ্রাহী, ভক্ত ও অনুরাগী।

গুরুকে দোতলায় নিয়ে গেল নিবেদিতা। সেখানে একটি মৃগচর্ম পাতা ছিল। এই অজিনাসনটি স্বামীজি এককালে তাকে দিয়েছিল। এই আসনে বসে রোজ ধ্যান করে সে। সেই আসনে ধ্যানের দেবতাকে বসিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

গভীর এক ভালোলাগার আবেশে বিবেকানন্দের দুই চোখ বুজে গেল। পরিপূর্ণ আনন্দে তাঁর হৃদয় মথিত ও ব্যথিত হতে লাগল। ব্যথিত হতে লাগল কারণ পরপারের ডাক শুনতে পাচ্ছেন তিনি। হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি আর। হঠাৎই সংসার উদাসীন মনটা একটু দুর্বল হল। ভেতরটা তৃষ্ণার্ত হল একটু স্নেহ, প্রেম মমতার জন্য। কাঙাল মনটা একটু ভালোবাসা দাবি করে। নিজেকে একটু প্রকাশ করতে ব্যগ্র হয়। এই

অনুভূতিটা কোনোদিন তিনি কামনা করেননি। এর দ্বারা পীড়িতও হননি। তবু মনের গহনে তার চোরাস্রোত অবশ্যই ছিল। নইলে, এমনভাবে বুক-কাঁপানো দীর্ঘশ্বাস পড়ল কেন? ছায়াস্নিগ্ধ ঘরে চুপ করে কয়েকটা মুহূর্ত কাটল।

শ্রীচরণ থেকে মাথা তুলতেই নিবেদিতা দেখল, ঋষির মত বসে আছেন তিনি। শিরদাঁড়া সোজা, চোখ দুটি বোজা, মুখে একটা তদগতভাব যা সাধকদের থাকে। দু'একটা মাছি গায়ে চরে বেড়াচ্ছে। কোনো হুঁশ নেই। হয়তো টের পাচ্ছেন না। মৃদুস্বরে ডাকল নিবেদিতা, পিতা!

চমৎকার একটু হেসে বললেন, মার্গট বার বার বলতে ইচ্ছে করছে তোমার ক্ষমতা আছে। তোমার ভেতর একটা দুরন্ত ইচ্ছাশক্তি আছে। তাকে বিমুখ করার ক্ষমতা কারো নেই। অন্য ধাতুতে তুমি গড়া।

লজ্জায় নিবেদিতা মরে যেতে লাগল। বুকের ধকধকানিটা শুরু হয় এইসময়। কারণ সে বুঝতে পারছিল গুরু তাকে কঠিন কিছু বলতে চান। এ হল তার ভূমিকা। সেই চরম কথাটা কী আভাসে আন্দাজ করতে পারে। তাই বোধ হয় একই সঙ্গে বুকের মধ্যে তার তীব্র চিনচিনে আনন্দ ও ভয় হচ্ছিল। অসহায়ের মত স্বপ্নাতুর চোখে গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার কাছে তিরস্কার শুনতে অভ্যস্ত। আপনার ভর্ৎসনাই ভালো লাগে, তাতে আমার দোষ ত্রুটি, ফাঁক-ফাঁকি দেখতে পাই। কিন্তু আপনার প্রশংসাতে আমার ধমনীতে অহংকারের রক্তস্রোত কিছুটা উদ্দাম হল।

মার্গট ! একটু মলিন হেসে বললেন, এখন এসব ভাবার মত সময় আর নেই। সময় জিনিসটা বড় অদ্ভুত। কখন যে একজন মানুষ যুবক অবস্থা থেকে টপ্ করে বার্ধক্যে পৌঁছয় সে নিজেও জানতে পারে না। আমারও সেইরকম কিছু একটা হবে।

হঠাৎ একথা কেন? আপনার কি সে অবস্থা হয়েছে?

হতে কতক্ষণ? তবে কথাটা মনে রাখতে হয় বৈকি। হাঁ, যে কথা বলছিলাম। তোমার বুদ্ধি, মেধা, ব্যক্তিত্ব, সাফল্যকে আমি চিরদিন শ্রদ্ধা করি। আজও করি। ব্যক্তিত্ববান তাকেই বলি যে মিথ্যেকে মিথ্যে, সত্যকে, সুন্দরকে, শুভকে অভিনন্দন জানাতে কুণ্ঠিত হয় না। যে লক্ষ লোকের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সত্যকে সত্য বলতে ভয় পায় না তাকে শ্রদ্ধা না করে থাকা যায়। আমার সৌভাগ্য সেরকম ব্যক্তিত্বপূর্ণ শিষ্যা আমি পেয়েছি। তাই তোমাকে কিছু বলার আছে আমার। বলতে হবেও। কিন্তু আজ এসেছি তোমাকে আমন্ত্রণ করতে। কাল একবার বেলুড়ে এস। কালীপুজো ছাড়াও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আছে। তোমাকে উপহার দিতে হবে।

বিবেকানন্দের আহ্বানে সাড়া দিতে নিবেদিতা পরের দিন সকালেই বেলুড়ে রওনা হলো। তার সমস্ত মনটা পড়েছিল সেখানে। নৌকোতে যেতে যেতে বারংবার তাঁর

কথাই মনে হতে লাগল। স্বামীজির আচরণে এমন একটা সারল্য এবং বালসুলভ চাপল্য ছিল যা আগে এবং পরে দেখেনি নিবেদিতা। তাছাড়া এমন অন্তরঙ্গ ভাবে কথা তার সঙ্গে আগে বলেননি। স্বামীজি যেন তাঁর সেই চেনা মানুষই ছিলেন না। তাঁর আকস্মিক পরিবর্তনের উৎস কোথায়? সংশয়ে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল, তবে কি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন তিনি? এটা কি প্রেমিক পুরুষের কোনো লক্ষণ? ঠিক বুঝতে পারছিল না নিবেদিতা। তবে তাঁর দুটো বড় বড় চোখের নিষ্পলক দৃষ্টি কেমন বিভোর, শান্ত, স্থির। ভিতর ভিতর তাঁর যে বিরাট একটা ওলোট-পালোট হয়ে গেছে সেটা নিবেদিতা আন্দাজ করতে পারে। গতকাল স্বামীজির ভাবান্তর তাকে ভীত করল। ভয়টা তার শরীর সম্পর্কে। স্বামীজির শরীর ভালো নেই, তবু বেলুড় থেকে হঠাৎই বাগবাজারে তাকে দেখতে এল। কেন? এই আসার ভেতর কোথায় কি কোনো রহস্য আছে?

•

মৃগচর্মের ওপর পাথরের মূর্তির মত বসে থাকা দৃশ্যটি তার চোখের ওপর ভাসছিল। ধ্যান সমাহিত জীবন্ত বুদ্ধের মত তাঁকে লাগছিল। মনে হচ্ছিল ঐ পাথরের বিগ্রহের মত তাঁর শরীর প্রাণহীন, স্পন্দনহীন, সংজ্ঞাহীন। তবু তাঁর মুদিত চোখে চোখ রাখতে গিয়ে আঁখিপল্লব বারংবার কেঁপে যাচ্ছিল। হৃৎপিণ্ড আলোড়িত হচ্ছিল। কিছু ভয়, কিছু চোরা আনন্দ, কিছু শিহরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া যা দৈনন্দিন ও স্বাভাবিক নয় তা তার চিত্তকে আচ্ছন্ন করে রাখল। তবে কি অন্য এক জগতের আলো এসে পড়ল তাঁর জীবনের ওপর? সেই আলো কি পরিস্ফুট করল তাঁর দিব্য সত্তাকে? প্রশ্নটা তার মনেই রয়ে গেল।

গঙ্গার মাঝখান দিয়ে নৌকো চলেছে। মাথার ওপর নীল আকাশ। খণ্ড খণ্ড মেঘের মত কত রকমের চিন্তা ভেসে যায়। কোনোটাই থামে না। আকাশ ভরে ওঠে না। ঘটে না কোনো বৃষ্টিপাত। নিজেও ভালো বুঝতে পারে না কী চায় সে! সর্বক্ষণ রাজার মুখ মনে পড়ে। তার জন্যই বড় ভাবনা হয়। হৃদয় জুড়ে সম্রাটের মত বিরাজ করছে সে। দূরে থাকলেও স্বপ্নে ও কল্পনায় রয়েছে। সেখানে খুব গভীর করে অনুভব করে তাকে।

মুগ্ধ বিভোর নিবেদিতা গঙ্গাবক্ষের চারপাশের নির্জনতাকে গভীরভাবে অনুভব করল। নদীর স্রোত জিনিসটাই ভারি অদ্ভুত। এ যেন সময় ও জল একসঙ্গে মিশে চলেছে অনন্তের অভিমুখে। কোথায় চলেছে, কেন চলেছে, কিভাবে চলেছে কিছু জানা নেই। তবু শান্ত নদী, নির্জন তটভূমি, নীল ও গভীর আকাশ, দিগ্‌বলয়ের সবুজিমা, রৌদ্রকরোজ্জ্বল আলোয় নৌকো করে জলবিহার করার একটা সুখ ও আনন্দ আছে। সে হলো বাধা জয়ের আনন্দ, অভিযানের উন্মাদনার সুখ।

মাঝে মাঝে গাঙ-চিল নদী বরাবর শূন্যে গা ভাসিয়ে ওড়ে আর নাকে সুরে ডাকে। কতরকমের পাখি ডানা ঝাপ্টাতে ঝাপ্টাতে নদী পেরিয়ে যায়। নির্জন নীল নদীতীরে পাখির ডানার শব্দ, বৈঠার ছপ্‌ছপ্ শব্দ এবং তরঙ্গের মৃদু মন্দ শব্দ বুকের মধ্যে যেন

বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। নিস্তব্ধতার মধ্যে সমাকীর্ণ হয়ে নিজের বুকের কলধ্বনি শুনতে পায় যেন।

হু-হু করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। ঝিম ঝিম করছে রোদ। বাহ্যিক কোনো নড়াচড়া ছিল না তার। উদাস দৃষ্টি, বহমান লীলায়িত তরঙ্গমালার দিকে চেয়ে থাকে নিবেদিতা। শান্তসুন্দর, মুক্ত নদীর মাঝখানে বসে মনের বিষণ্ণ রেশটুকু খুঁজতে থাকল।

চিত্রার্পিতের মত নৌকোয় বসে থাকতে থাকতে তার কেবলই মনে হতে লাগল তাঁর জীবনের সব। তাঁকে ছাড়া কিছু ভাবতে পারে না সে। তার নিজের কোনো পরিচয় তৈরি হয়নি। মাইনাস্ বিবেকানন্দ মানে মাইনাস নিবেদিতা। নিবেদিতার প্রসঙ্গে কিছু বলতে গেলে বিবেকানন্দর কথা অপরিহার্যভাবে এসে পড়বেই। কায়া ছাড়া যেমন ছায়া নেই, তেমনি বিবেকানন্দ ছাড়া নিবেদিতা নেই। এটা শুধু গুরুগত প্রাণ হওয়া নয়, গুরুর ছায়ায় পরিবৃত হয়ে থাকা।

কিন্তু নিবেদিতার আচার্য কখনও তা চাননি। তাই লন্ডন থেকে কোলকাতা প্রত্যাবর্তনের আগেই তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। পায়ের শিকল কেটে বন্ধনমুক্ত বিহঙ্গের মত তার মনের আকাশে ওড়ার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কোনো রাগ, অভিমান করে নয়, বরং কিছুটা আত্মানুশোচনা ছিল তাঁর অন্তরে।

অনুশোচনা ছাড়া কী? নিজের দায়-দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা এবং নিজের কর্মক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্তে চলার শক্তি ও প্রাণাবেগ তার ভেতর এত বেশি যে তাকে মুক্ত করে না দিলে তার বিকাশ পরিপূর্ণ হয় না। বিশাল পৃথিবীর দিকে যে অবারিত পথ চলে গেছে সেখানে নিজের মত বিহার করার স্বাধীনতা দিয়ে গুরু নিজের দোষ স্খালন করেছেন। নিবেদিতার সঙ্গে গুরুর ব্যক্তিত্বের একটা সংঘাত ছিলই। নির্বিচারে অন্ধের মত গুরুবাক্য সে মানেনি। অকপটে নিজের মনের কথা বলতে কোনোদিন পিছপা হয়নি। তথাপি কার্যক্ষেত্রে নেতৃত্বের আদেশ শিরোধার্য করে গুরুকেই অনুসরণ করেছে। তাই তার মুক্তিদানের সময় স্বামীজি অকপটে বললেন, মার্গট! তোমার শ্রদ্ধা ভালোবাসার ওপর আমার কোনো সন্দেহ নেই। এখানে তোমার আপন বলতে কেউ নেই। আমি তোমার একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কাঙালের মত আমাকে আঁকড়ে ধরে আছ। কিন্তু তুমি এত অসহায় নও। কোলকাতাতেও আর একা মনে হবে না তোমার। ওদেশের মানুষের সঙ্গে তোমার একটা অন্তরঙ্গতা এবং আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। নিজেকে তোমার একা মনে ভাবার কারণ নেই। এবার আমার ওপর তোমার নির্ভরতা কমাতে হবে। সর্বব্যাপারে তুমি নিজের মত, নিজের ভাবে কাজ কর। তা-হলেই আমি বেশি শান্তি পাব। একথা বলার সময় হয়েছে বলেই কথাগুলো বললাম। মানুষের ওপর আমার বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং কর্মক্ষমতা দেখে তোমার ধারণা হয়েছে আমাকে ছাড়া তোমার চলবে না। কিন্তু সত্যি কি তাই? তোমার নিজের শক্তিও কম নয়। আমার জন্যই হয়তো সে শক্তি স্ফূরণ হচ্ছে না। নিজেকে নিজে তুমি দেখতে পাচ্ছ না। আমার

খ্যাতি, গৌরব, বিশাল প্রভাবের আড়ালে তুমি চাপা পড়ে আছ। বিখ্যাত, প্রভাবশালী ব্যক্তির পুত্র-কন্যারা বড় হতভাগ্য। বাবার পাশে দূরের তারার মত মিট মিট করে। তাদের নিজস্ব ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তারা কোনো আমল পায় না। তাদের কৃতিত্বের কোনো কদর নেই। এই সত্য আমার নিজের জীবনে টের পেয়েছি।

স্বামীজির কাছে কথাগুলো শোনার পরেই শুরু হয় তার মধ্যে বিচার-বিশ্লেষণ। সত্যিই আলাদা সম্মান এবং স্বীকৃতির অভাবে সে নিজের মত করে গড়ে উঠতে পারেনি। স্বামীজি তাকে মুক্ত করে দেওয়ার পরেই কোলকাতাতেই তার বিশাল কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হল। মাত্র ক'টা মাস কলকাতা এসেছে। এই অল্প সময়ের ভেতর কত খ্যাতি হয়েছে তার। একটা আলাদা পৃথিবী হাতছানি দিচ্ছে তাকে। এখানেও বিবেকানন্দ আছেন কিন্তু তাঁর প্রত্যক্ষ কোনো তদারকি কিংবা নিয়ন্ত্রণ নেই। নিজেকে নিজের মত করে চালাচ্ছে। নিবেদিতা টের পায় ভিতরের বিস্ময়কর বহুমুখী শক্তিগুলো স্ফুলিঙ্গের মত ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। এ শক্তি কোথা থেকে কিভাবে তার মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে জানে না। তবে স্বামীজি জানতেন।

কিছুদিন আগে তার মাথায় কোমল, স্নেহময় হাত রেখে গঙ্গার দিকে চেয়ে বলেছিলেন, নিবেদিতা, একদিন কাজ করার জন্য পাগল হতে, এখন কাজই তোমাকে পাগল করে তুলছে। সেই অস্থির ভাবটা আর নেই। মন প্রশান্ত হলেই কাজে নিবিষ্ট হওয়া যায়। কাজে ডুবে থাকতেও ক্লান্তি লাগে না। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর এই মজা। কারো মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। নির্ভয়ে কাজ করে যাও। একদিন বিশাল পৃথিবী তোমাকে ডেকে নেবে। তখন কতদিকে কত ভাবে ছড়িয়ে পড়বে তুমি। তখন আমি আর থাকব না।

কথাটা মনে হতে নিবেদিতার বুকের ভেতরটা ঝাঁৎ করে উঠল। বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বুড়ো মাঝি ঠিক এই সময় বলল, মা সামনেই ঘাট। এবার আপনাকে নামতে হবে।

নিবেদিতা টান টান হয়ে উঠে দাঁড়ালো। কম্পিত বুক ও উদ্দীপ্ত এক আনন্দ নিয়ে তরতর করে ঘাটে ওঠার সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। চাতাল পর্যন্ত এসে মুখ তুলে সামনে তাকাতেই দেখল আমগাছের নিচে বিবেকানন্দ তার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে লুঙ্গির মত করে পরা গেরুয়া বস্ত্র। কাঁধের ওপর একখণ্ড গেরুয়া রঙের চাদর। গভীর চোখ দুটি দেখেই চেনা যায় তাঁকে। কে বলবে, এই মানুষ শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। মুখেই যা অবসাদজনিত ক্লান্তির ছাপ লেগেছিল নইলে বোঝবার উপায় নেই তিনি রোগে ভুগছেন।

নিবেদিতাকে দেখে তাঁর মুখখানা খুশিতে হেসে উঠল। দু'চোখের চাহনিতে জীবন রহস্য বোঝার কৌতুক। অথচ, কী আশ্চর্য, নিবেদিতারই তাঁর কাছে যাওয়ার কথা, কিন্তু তা না হয়ে তিনিই এসেছেন নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করতে। শরীরে রোগজনিত

ক্লান্তির কোনো চিহ্ন নেই। তাঁকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। নিবেদিতার কিছু বলার আগে তিনি বললেন, নৌকোয় তোমায় আসতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। তুমি আমার অতিথি, আমার নারায়ণ। নারায়ণ সেবার অধিকার দিয়ে আমাকে ধন্য করলে। তোমার জয় হোক। মা তোমার সহায় হোন।

বিবেকানন্দের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকল নিবেদিতা। তারপর অভিভূত গলায় বলল, এ কিন্তু ভারি অন্যায়। কোথায় আমি যাব আপনার কাছে, তা না হয়ে উল্টোটা হল, কী খারাপ যে লাগছে।

বিবেকানন্দের অধরে কৌতুক হাসি। ডান হাতখানা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, চল, আমরা ঘরে গিয়ে বসি।

পথে যেতে নিবেদিতা বলল, আজ আপনাকে ভীষণ সুস্থ মনে হচ্ছে।

বিবেকানন্দ হাসছেন। বললেন, মুক্তির দিন যত এগিয়ে আসছে ততই একটা অদ্ভুত উৎফুল্লভাব আমাকে মহাখুশিতে রেখেছে।

গুরুর ওপর অভিমান হল নিবেদিতার। বলল, এসব কথা শুনতে এখানে আসিনি।

মার্গট আমার ওপর কারো রাগ হয়? কেন উৎফুল্ল, সে কথা তো শুনবে। যখন মৃত্যুর কথা ভাবি তখনই সব দুর্বলতা চলে যায়। বুকের ভেতর একটা জ্যোতির্ময় সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করি। সুস্থ দেহ তখন তার একটা ছায়া বা প্রতীক মাত্র বোধ হয়। দেহটা সমস্ত প্রকৃতির মতই অনিত্য।

নিবেদিতার মনটা এমনিতে ভারাক্রান্ত ছিল। এসব আলোচনা তার ভালো লাগল না। বলল, আপনি সত্যিই ভালো বোধ করছেন তো? জোর করে নিজেকে সুস্থ প্রমাণ করার কসরত করছেন না তো। ভারতীয় যোগীরা যৌগিক প্রক্রিয়ায় অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। আপনার শরীরের কথা আপনিই ভালো বোঝেন। তবু দেহে মনে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হোন্ এটা ভীষণভাবে চাই।

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নিবেদিতার দিকে চেয়ে থেকে বিবেকানন্দ মৃদু হাসলেন। বললেন, দেহের ক্ষয় হয়, বিনাশ হয়। দেহ অনিত্য। শরীর থাকলে ব্যাধি থাকবে। শরীরের মধ্যে যে প্রাণ আছে তা অন্তর্ধান করলে এত আদরের দেহও অস্পৃশ্য হয়ে যায়। তার কোনো কদর থাকে না। নিষ্প্রাণ শবটাকে ফেলে দিতেই তখন সবাই ব্যস্ত। যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ আমরা দেখি, অনুভব করি, শুনি, কল্পনা করি, স্বপ্ন দেখি। দেহ যেই নিস্প্রাণ হয়ে গেল অমনি এগুলোও অন্তর্হিত হল। প্রাণের আধার দেহ। প্রকৃতিব নিয়মে এই দেহ একদিন ধ্বংস হবে।

প্রসঙ্গ তাড়াতাড়ি চাপা দেওয়ার জন্য নিবেদিতা বলল, এই পর্যন্ত বুঝতে পারি, তারপরে সব অনুমান, কল্পনা, উপলব্ধি। কথার পর কথা সাজানো এক অধরা মায়াময় পৃথিবী—যাকে অস্ত্র ছিন্ন করতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না, জল বিগলিত করতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করতে পারে না। কথার এই চাপান-উতোরের শেষ নেই।

বিবেকানন্দ নিবেদিতার আগে আগে যাচ্ছিলেন আর উপনিষদ থেকে উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করছিলেন শ্লোকের পর শ্লোক। কী মধুর সেই কণ্ঠস্বর। জীবন যেন মহাসঙ্গীত হয়ে সুরের ভেলায় ভাসতে ভাসতে চলেছে সুরলোকের দিকে। কী মনোরম সে অনুভূতি।

দর্শনার্থীদের ঘরেই বসল ওরা। বিবেকানন্দ বললেন, আমার আর উদ্বেগ নেই। চিরদিন আমি থাকবও না। ইহলোক থেকে বিদায় নিলে জগৎকে আমার বাণী শোনানোর ভার তোমার। আমার ভাবের পতাকা বহন করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা তোমার আছে। অনেক বাধা-বিপত্তি, ঝড় মাথায় করে দুর্যোগের রাত্রিতে উত্তাল যমুনা পার হয়ে বসুদেব যেমন আগামী দিনের মথুরার মুক্তিসূর্য শিশু কৃষ্ণকে কংসের কারাগার থেকে নন্দের গৃহে নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছিল তেমনি তোমার ওপর দায়িত্ব রইল আমার ভাবনা-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আমার অসম্পূর্ণ কাজ সকলের কাছে মূর্ত করে তোলা। সেই হবে তোমার যথার্থ গুরুদক্ষিণা।

দীপশিখার মত কেঁপে গেল নিবেদিতার ভেতরটা। চমকেও উঠেছিল একটু। বিস্ময়ে কয়েকমুহূর্ত চেয়ে রইল বিবেকানন্দের দিকে। উজ্জ্বল চোখে নীলবর্ণের দুটি তারা যেন ঝিক্ করে হেসে উঠল। আর তাতেই অপরূপ দেখাল তাকে। বলল, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।

বিবেকানন্দের দুই চোখ আনন্দে জ্বল জ্বল করে উঠল। বুকও তোলপাড় করল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর থমথমে গম্ভীর গলায় বলল, জান মার্গট, কতদিন রাত্রে গুরুর প্রতিকৃতির সামনে চুপটি করে বসে থেকে বলতাম, তোমার পতাকা বহনের জন্য এমন লোক চাই যার পেশী লোহার মত দৃঢ়, স্নায়ু ইস্পাত দিয়ে তৈরি, আর তার মধ্যে চাই এমন একটা মন যা বজ্রের উপকরণ দিয়ে গড়া। চাই বীর্য, তেজ, মনুষ্যত্ব-ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজ। তোমার মধ্যে তার সব গুণ, সব শক্তি আছে। তুমি পারবে আমার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে।

নিবেদিতা স্তব্ধ। তার চেতনা জুড়ে নামল বিহ্বলতা। কী মধুর, কী মনোরম সেই মুহূর্তের অনুভূতি। অনাস্বাদিত আনন্দের তৃপ্তিতে ভরে যেতে লাগল তার ভেতরটা। গভীর ভাবাবেগে দুই চোখ বুজে গেল। বলল, আপনার প্রত্যাশা পূরণের জন্য যথাসাধ্য করব। যে স্বপ্ন আমার গুরুর চোখে সে স্বপ্ন আমারও। এক নতুন ভারতের অভ্যুদয়ের সূচনার জন্য আমার উদ্যোগের অভাব হবে না। বলতে পারেন তার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এখন তাকে আরো ভীষণ কঠোর ও গভীরতায় করা। বিদেশী শাসকের হাত থেকে এদেশ মুক্ত না হলে প্রকৃত কল্যাণ কখনও সম্ভব নয়। এই সত্য কথাটা জেনেও আপনি যে কোন্ অদৃশ্য কারণে রাজনৈতিক সংগ্রামকে জাতির মুক্তি-পন্থা রূপে গ্রহণ করলেন না তার রহস্য জানা না থাকলেও এটুকু বুঝেছি আমাকে সন্ন্যাসিনী না করে চির ব্রহ্মচারিণী করলেন শুধু সেই অসমাপ্ত কাজ করার জন্য।

নিবেদিতার নাভিমূল থেকে গভীর শ্বাস উঠে এসে বাতাসে মিলিয়ে গেল। সেই সঙ্গে বহুদিনের জমা করা ভারও নেমে গেল বুক থেকে। একটু হেসে বলল, একে বলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। একদিন মনের আবেগে যে বৃটিশের পতাকাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছিলাম আজ তার প্রতি তীব্র বিরাগ ও বিতৃষ্ণাকে মূলধন করে এক নতুন কাজে আমাকে ব্রতী করলেন। এর চেয়ে আমার কাছে অধিকতর আনন্দ কী হতে পারে?

বিবেকানন্দের অধরে অনির্বচনীয় হাসির দ্যুতি। গম্ভীর প্রশান্ত সে হাসি। মহৎ বোধে হৃদয় ভরে ওঠে। বললেন, তোমাকে সন্ন্যাসিনী করিনি বলে আমার ওপর তোমার খুব রাগ। কেন সন্ন্যাসিনী করিনি জান? সন্ন্যাসীর বুকে প্রেম নেই। তারা পৃথিবীকে ভালোবাসে না। সমাজ থেকে লোকালয় থেকে পালিয়ে নিজেদের নিয়ে মগ্ন তারা। তারা বড় স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর। এই প্রেমহীন সমাজে কারো বুকে যদি বুদ্ধের প্রেম, করুণা, মমতা, ভালোবাসা থেকে থাকে তা রয়েছে তোমার বুকে। তোমার সুন্দর একটা মানবিক মন আছে। তাই বোধ হয় জীবন সম্বন্ধে ধারণাগুলো এত স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। মাঝে মাঝে বিস্ময় লাগে আমার তো আরো শিষ্য আছে, তাদের কারো ওপর এ দায়িত্ব না দিয়ে তোমায় দিলাম কেন? এই কেন'র কোনো উত্তর হয় না। বোধ হয়, ভারতবর্ষের প্রতি তোমার গভীর টান, এদেশের প্রতি তোমার অনেক শ্রদ্ধা, ভারতীয়দের প্রতি তোমার ভালোবাসা, এখানকার ধর্ম-শাস্ত্র, প্রথা-বিশ্বাসের প্রতি তোমার আনুগত্য, নিজস্ব ভালোলাগা, ভক্তি ও বিশ্বাস এত বেশি তোমার যে, সেখানে হাত পাতলে বিমুখ হয়ে ফিরতে হবে না। ভালোবাসার বোঝা নিয়ে প্রেমের ভিখারী হয়ে এদেশের মানুষের দরজায় দরজায় প্রেম বিলিয়েছ। মানুষের অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য, বিদ্রূপও পারেনি তোমাকে বিচ্যুত করতে। তোমার ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, নিষ্ঠা দেখে তারাই লজ্জা পেয়ে পরে শুধরে নিয়েছে নিজেদের। একজন ভারতীয়র চেয়ে তুমিই বেশি জান আমাদের সমাজদেহ কুষ্ঠব্যাধির মত গলে গলে খসে পড়ছে। একমাত্র ভালোবাসার অমৃতধারায় তুমিই ধুয়ে দিতে পার সেই পঙ্কিলতা। তুমি পার অজ্ঞতার লজ্জা, অপরাধ ক্ষমা করে বুকে টেনে নিতে। মানুষ টানার ক্ষমতা আছে তোমার। আদর্শের আলোয় তোমার জীবন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাই তোমার কাছেই হাত পেতে আমি ভিক্ষা চেয়েছি। অন্নপূর্ণার কাছে শিবের ভিক্ষে চাইতে কোনো লজ্জা ছিল না। বরং এক গভীর আনন্দের গৌরবে বুকখানা বড় হয়ে গিয়েছিল। অনুরূপ গৌরবের তৃপ্তিতে আমার বুক ভরে যাচ্ছে।

কথাগুলো নিবেদিতার বুকের ভেতর মৃদঙ্গের মত বেজে যেতে লাগল। গায়ে কাঁটা দিল। বহুদিন পরে ডাকল, রাজা। স্বপ্ন কখনো সত্য হয়? স্বপ্নে মানুষ সাত রাজার ধন পায়। স্বপ্ন হল মানুষের নিজের সাম্রাজ্য। একজন ভিখারীও রাজা উজীর বনে যায়। আপনি আমার স্বপ্নের রাজা। একোন সাম্রাজ্যের ভার আমাকে দিলেন? আমার রাজার হাতের পারিজাত গলার হার করে বুকে রাখব।

নিবেদিতার বুক নিঙড়ানো গভীর ভালোলাগার আবেগ বিবেকানন্দকে বিহ্বল

করল। নিজের থুতনিতে হাত বোলাতে বোলাতে কয়েকটা মুহূর্ত নিবেদিতার উৎসুক দুটি চোখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বললেন, স্কুল ছাড়াও রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে আরো কিছু সেবামূলক প্রতিষ্ঠান করার কথা চিন্তা করছ। তোমার উদ্দেশ্যটা ভালো। কিন্তু তার ঝক্কি সামলাতে পারবে তো? খাল কেটে কুমির অনার মতই অশান্তি বয়ে বেড়াতে হবে। তার চেয়ে বরং শুরুতেই দূরে থাক। আমাদের এ পোড়ার দেশে স্কুলের বেশি, কিছু না ভাবা ভালো। তাতে পরিশ্রমের অপচয় হয়।

আমার কিন্তু তা মনে হয় না। মানুষই মানুষের কথাভাবে। এদেশের অসহায় মেয়েদের কথা ভেবে বিধবাশ্রম কিংবা অনাথ আশ্রমের মত একটা প্রতিষ্ঠান করার খুব ইচ্ছে আমার।

খবরদার, ভুলেও ও চেষ্টা কর না। ও সব করে কারো উপকার তুমি করতে পারবে না। ভালোর চেয়ে তাতে মন্দ হবে বেশি। অনর্থক কতকগুলো সমস্যাকে ডেকে আনা হবে।

সমস্যা তো সব কাজে আছে। সমস্যার কথা ভেবে হাত-পা গুটিয়ে থাকলে কল্যাণমূলক কোনো কাজই হয় না। মানবপ্রেম, মানবসেবা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যদি প্রধান উদ্দেশ্য হয় তাহলে অসহায় দুঃখী বিধবা এবং নিরাশ্রয় মেয়েদের দুঃখ-কষ্ট মোচনের সেবার ব্যাপকতায় কিছু করার মধ্যে অন্যায় কোথায়? আপনার আপত্তিই বা কেন? অথচ গিরিশ ঘোষকে আপনি বলেছিলেন, দেখ গিরিশবাবু মনে হয় এই জাতের দুঃখ দূর করতে আমায় যদি হাজার জন্ম নিতে হয় তাও নেবো। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা করব। তাহলে একি শুধু ফাঁকা বুলি। নিছকই একটা ভাবাবেগ। এই তো কিছুদিন আগেই বললেন, মার্গট, আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে। অপরের ব্যথায় আমি ব্যথিত হই। বিশ্বাস কর একটা তীব্র দুঃখবোধের আর্তি আমাকে বড় কষ্ট দেয়। তারপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে মুখ করে মীরার ভজন করতে লাগলেন—দরদ না জানে কোই — ঘায়ল কী খত ঘায়ল জানে, আওর না জানে কোই।

বিবেকানন্দ কষ্টের সঙ্গে হাসল। শান্তভাবে বলল, খৃস্টান মিশনারিরা ঐ রকম কত আশ্রম বানিয়েছে। কিন্তু তাতে ব্যক্তিমানুষের কতটুকু উপকার হয়েছে? তারা আশ্রয় পেয়েছে, খাওয়া-পরা পাচ্ছে, কিন্তু এসব দিয়ে তো তাদের দাস করে রেখেছে। তাদের মানুষ বলে ভাবা যায় না। অনেক অমানবিক কার্যকলাপে বাধ্য করা হয়। কার্যত, অসহায়তার সুযোগ নিয়ে এবং নিরাপত্তার লোভ দেখিয়ে মানুষের ধর্ম কেড়ে নেওয়া এবং তার ওপর যে অমানুষিক মানসিক নির্যাতন করা হয় তা দেখেশুনে মনে হয় এ ধরনের প্রতিষ্ঠান যত কম হয় ততই ভালো।

প্রত্যুত্তরে নিবেদিতা বলল, এ নিয়ে তর্ক করা নিরর্থক। ভালোমন্দ নিয়েই প্রত্যাশার নতুন স্বর্গ গড়ে ওঠে। অনেক ভেবেই আমি সব সময় বলে থাকি, অবহেলা অনাদরের

মূল কারণ হল পরাধীনতা। শিক্ষার চেয়েও বেশি প্রয়োজন রাজনৈতিক স্বাধীনতা। শিক্ষিত করে তোলার জন্য অনেক সময় দরকার। কিন্তু এটা শিক্ষা ছাড়াই সম্ভব। দেশপ্রেম সব মানুষের জন্মসূত্রে পাওয়া। এ হল এক বিশেষ বোধ বা ভাবাবেগ। কেউ তা ছিনিয়ে নিতে পারে না। আত্মার মধ্যে সুপ্ত তুষের আগুনের মত। একটু বাতাস পেলেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। জাতীয়তার দাবিতে তার মধ্যে এক নতুন মানুষ জন্ম নেবে। গোটা জাতির নবজন্ম হবে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারবোধ থেকে একে একে সব কিছু অর্জন করবে।

স্বামীজি মন দিয়ে কথা শুনলেন। তারপর খুব শান্তভাবে ধীরে ধীরে বললেন, মার্গট, তোমার কথাই বোধ হয় ঠিক। আগের মত কোনো কাজে উৎসাহ পাই না। আবার সে কাজগুলো একেবারে ত্যাগ করতে মন চায় না। শুধু মনে হয়, আমার মৃত্যু নিকটবর্তী হচ্ছে। তাই হয়তো এই হতাশা। বর্তমান অবস্থায় জাগতিক ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে, তুমি আশার আলো। তোমার মধ্যে এখন বেশ একটা দৃঢ়তা লক্ষ্য করি। তোমার লক্ষ্যে এগিয়ে যাও। কোনো অবস্থায় থেমে পড় না। জয় তোমার হবেই।

নিবেদিতা বলল, আপনার আশীর্বাদ আমার পাথেয়। আমার কাজের প্রেরণা। শুধু আপনি চাইলেই আমি যে তো কোনো অসাধ্য সাধন করতে পারি। আপনার আদেশ মনে করেই যতদিন বাঁচব কাজ করে যাব।

কথাগুলো বলে নিবেদিতা গুরুর চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করল।

কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেলেন বিবেকানন্দ। মুখে স্নেহমাখা হাসি ফুটিয়ে বললেন, মার্গট কথায় কথায় অনেক বেলা হল। খাবে এস। আমি নিজের হাতে তোমায় পরিবেশন করব। আহা মরি কিছু নয়। আতব চালের ভাত, আলু সেদ্ধ, কাঁঠালের বিচি সেদ্ধ। আর বরফ দেওয়া এক গ্লাস ঠাণ্ডা দুধ রেখেছি খাওয়ার পর খাবার জন্য।

মেয়েদের মত পরিপাটি করে খাবারের থালা সাজিয়ে দিলেন নিবেদিতার সামনে। বললেন, এসব তোমার জন্য করেছি। একটুও নষ্ট করা চলবে না। সবটাই খাবে। খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাশেই বসে থাকব।

বিবেকানন্দের কথাগুলো নিবেদিতার অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। কেমন একটা অপ্রতিভ লজ্জা ও সংকোচে আবিষ্ট হয়ে গেল। বলল, আপনি খাবেন না?

আমার একাদশী আছে। কিছুই খাব না। তুমি খেলেই আমার তৃপ্তি।

তারপর এটা খাও, ওটা খাও করতে থাকেন। নিবেদিতা খাবে কি? অপলক দুই চোখ বিবেকানন্দের চোখের ওপর স্থির হয়ে রইল। বিবেকানন্দের চোখে এদেশের একজন স্নেহময়ী জননীকে দেখছিল। মৃদু আবেগে তার ভেতরটা কাঁপছিল। নিজের অজান্তে তার দু'চোখ জলে ঝাপ্সা হয়ে গেল। হাতটা ভীষণ ভার বোধ হল। মুখ পর্যন্ত

গ্রাস ওঠে না। হাত ধরে বিবেকানন্দ ওর মুখে দিলেন। গরাসটি মুখে না দেওয়া পর্যন্ত হাত ছাড়েন না।

তার অভিভূত ভাবটা দূর করার জন্য বিবেকানন্দ মজার এক গল্প বলল, রামকৃষ্ণের তখন খুব পেটের অসুখ। সেই সময় সিঁদুরেপটির শম্ভু মল্লিক এসেছিল দক্ষিণেশ্বরে। মানুষটা খুব সরল। সওদাগরী অফিসে কেরানিগিরি করে অঢেল পয়সা করেছে। দান ধ্যান দুইই আছে তার। রামকৃষ্ণের পেটের অসুখ শুনে বলল, একটু আফিং খেয়ে নিও। তাহলেই সব সেরে যাবে। রাসমণি বাগান থেকে ফেরার সময় আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও।

রামকৃষ্ণ রাজি হলেন। কিন্তু কথা পাগল মানুষ। কথায় কথায় ভুলে গেলেন আফিং-এর কথা। পথে এসে মনে পড়ে গেল। নিজের মনে বললেন, ঐ যাঃ, আফিংটুকুই নিয়ে আসা হয়নি। অমনি ফিরে চললেন শম্ভুর বাগানবাড়িতে। বাগানবাড়িতে এসে দেখলেন শম্ভু নেই। সে অন্দরমহলে গেছে। ভাবলেন পাশেই যখন ডিসপেন্সারি তখন ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি করে তাকে ব্যতিব্যস্ত করার দরকার কী? কম্পাউন্ডারের কাছ থেকে একটু চেয়ে নিলেই হল। চাওয়ামাত্র কম্পাউন্ডার একদলা আফিং কাগজে মুড়ে তাঁর হাতে দিল। আফিং-এর দলা ভালো করে ট্যাকে গুঁজে রামকৃষ্ণ বাড়ির দিকে চলতেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য, রামকৃষ্ণের গা টলতে লাগল, পা দুটো মাটি থেকে টেনে তুলতে পারছেন না। মনে হচ্ছিল, কে যেন তাঁকে টেনে ধরেছে। যদিও বা চেষ্টা-চরিত্র করে বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করলেন তো রাস্তায় না গিয়ে নর্দমার দিকে যাচ্ছিলেন। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল। ঘরে ফেরার পথই খুঁজে পান না। দাঁড়িয়ে ভাবেন তাহলে পথটা গেল কোথায়? অথচ পিছন ফিরে তাকালে শম্ভুবাবুর বাড়ির পথ স্পষ্ট দেখতে পান। কিন্তু সামনে তাকালে পথ আর পথ থকে না। তাহলে এ কিসের ভ্রম? বাড়ির পথ তো মুখস্থ। চোখ বন্ধ করে যাওয়া যায়। তবে এরকম বেচালে পড়লেন কেন? ডান বাঁ ঠিক করে রামকৃষ্ণ বাড়ি যাওয়ার পথ ধরলেন। কিন্তু সেই একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হল। নিজেকেই প্রশ্ন করলেও পথ এমন ভুল হচ্ছে কেন?

ট্যাক থেকে আফিমের মোড়কটা বার করলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎই মনে পড়ে গেল — শম্ভু বলেছিল আফিং পুরিয়াটা তার কাছ থেকে চেয়ে নিতে। এই আফিং, তো কম্পাউন্ডারের দেওয়া। শম্ভু মল্লিকের আফিং নয় বলেই হয়তো এমনটা হচ্ছে। মাথাটা এধার-ওধার করে সত্যি মিথ্যে নির্ণয় করে বুঝলেন এতে তাঁর সত্যচ্যুতি হয়েছে। তাই মা যেতে দিচ্ছেন না। হুঁশ ফেরানোর জন্য ঘুরিয়ে মারছেন। পথ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটা স্বস্তিবোধ করলেন।

কম্পাউন্ডারকে তার জিনিস ফিরিয়ে রামকৃষ্ণ শম্ভুবাবুর বাড়ি যাবে বলে রওনা হলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, ডিস্‌পেনসারির কম্পাউন্ডার নেই। দরজা বন্ধ করে চলে

গেছে। রামকৃষ্ণ পড়লেন ফ্যাসাদে। আফিমের দলাটা কী করে ফেরত দেবেন। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হল, খোলা জানলা দিয়ে এটা ভেতরে ফেলে দিলে তো হয়। যেমন ভাবা তেমনি কাজ।

তারপর নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে শম্ভুবাবুর বাড়ি গেলেন। সেখান থেকে আফিং নিয়ে মন্দিরের দিকে পা বাড়ালেন। আর কোনো গোলমাল নেই। সমস্ত পথ এখন তাঁর সড়গড়। আর কেউ পা টেনে ধরছে না। ঠেলে দিচ্ছে না নর্দমার দিকে। মন্দিরে পৌঁছে মথুরাবাবুকে সব কথা বললেন। বুকের ভার হাল্কা হয়ে গেল। পুলকিত হয়ে বললেন, আমার মা আছে আর আমি আছি। আমি তো মার হাত ধরিনি, মাই আমার হাত ধরেছেন। নিজে না ধরে আমায় দিয়েই ধরিয়েছেন তাঁকে। তাই এতটুকু বেচালে পড়তে দেন না। তারপর ভবতারিণীর মন্দিরের দিকে চেয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন মা। আমি তোকে ছেড়ে থাকি কিন্তু তুই আমাকে ছেড়ে থাকিস না।

গল্প বলা শেষ হয়ে গেলে শিষ্যদের উদ্দেশ করে বিবেকানন্দ বললেন, বাঁদরের বাচ্চার মত মার বুক আঁকড়ে থাক তাহলে তিনিই তোমাকে ঠিক পথে নিয়ে যাবেন।

নিবেদিতা এঁটো পাতা নিয়ে উঠতে গেলে বিবেকানন্দ ওর হাতখানা চেপে ধরলেন। বললেন, না, তুমি আমার নারায়ণ। এটুকু আমার নিজের হাতে করতে দাও। তারপর ওর হাতে জল ঢেলে আঁচিয়ে দিতে গেলে নিবেদিতা বাধা দিল। লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল তার মুখশ্রী। তীব্র আপত্তি প্রকাশ করে বলল, না, না। একী হচ্ছে? এটা ভারি অন্যায়! বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এসব কাজ শিষ্যেরা গুরুর জন্য করে থাকে।

বিবেকানন্দের মুখে অনাবিল হাসির স্নিগ্ধ দ্যুতি। বললেন, তুমি অকারণ সংকোচ বোধ করছ। যীশুও তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।

নিবেদিতার বুকটা তোলপাড় করে উঠল। ভেতরটা তার আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু সে তো তার শেষ সময়। কথাটা মুখেও এসে গিয়েছিল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। উদ্‌গত অশ্রুসজল চোখ দুটি স্বামীজির চোখের ওপর সবিস্ময়ে ধরা রইল।

নিবেদিতার এঁটো হাত ধরা ছিল বিবেকানন্দের হাতে। নিজের হাতে আঁচিয়ে দিলেন তাকে। হাত ধরা অবস্থায় শরীরের কম্পনের মধ্যে বিবেকানন্দ টের পেলেন শিষ্যার চমকানো বিস্ময় ও উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠা। নিবেদিতার কাছে পাছে ধরা পড়ে যান তাই তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য বললেন, আমাদের কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে অতিথিদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন। আমারও সেরকম কিছু করার সাধ হয়েছিল। এতে তোমার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।

তারপর তোয়ালে দিয়ে নিবেদিতার হাতটা মুছিয়ে দিলেন।

সন্ধের আগেই বাগবাজারে ফিরল নিবেদিতা। ঘরে তার মন বসল না। সমানে ঘরবার করল। স্বামীজির জন্য নারীহৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠল। বারংবার নিজেকে প্রশ্ন

করল, আচার্য তার হাত ধুইয়ে দিলেন কেন? এর কি কোনো তাৎপর্য আছে? এটা নিছকই একটা সাধারণ ঘটনা বলে ভাবতে পারল না। এ তাঁর নিছক খেয়াল বলেও মনে হল না। তবে কি? নিজের সঙ্গে নিজের কোনো নিষ্ঠুর রসিকতা। শেষ ভোজনপর্বে শিষ্যদের সঙ্গে এক মহাকৌতুক করেছিলেন যিশু। সেরকম কোনো কৌতুক বিবেকানন্দ করলেন না তো তার সঙ্গে? তাহলে কি মৃত্যুঘণ্টা শুনতে পেয়েছেন? তাঁর শেষ সময় কি সমাগত? কথাটা মনে হতেই নিবেদিতা শিউরে উঠল। ভীষণ জোরে শক্ত করে ঠোঁট কামড়ে ধরল। মনের মধ্যে তার নানা কু গায়। এসব চিন্তা আগে হয়নি কখনও মনে। ভিতরে এক শিহরিত ভয়ে তার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল।

মনের মধ্যে নিবেদিতার ঝড়। কোথায় যেন এক মহাপ্রলয় ঘটে গেছে। একটা প্রবল কষ্টে আর দুঃখে তার বুকটা টাটাতে লাগল। মনে মনে যিশুর শেষ ভোজসভা পর্যালোচনা করতে লাগল। যিশু টের পেয়েছেন প্রিয় শিষ্যরাই হবে তাঁর মৃত্যুর কারণ। তাই তাদের সঙ্গে একত্রে বসে ভোজন করলেন। শিষ্যরা তখনও জানত না এক নিষ্ঠুর কৌতুক তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সেই চরম সংকট মুহূর্ত যখন এল তখন প্রিয় শিষ্যরা প্রাণভয়ে একে একে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে গুরুকে ত্যাগ করল। নিয়তিনির্দিষ্ট পথে যিশুর অদৃষ্টে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার দিকে চুম্বকের মত টানতে লাগল। একটার পর একটা অঘটন ঘটে তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করল। নিষ্ঠুর মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করল মৃত্যুঞ্জয়ী সাধক। বিবেকানন্দ কি সেরকম শেষ সময়ের কথা ভেবে তার হাত ধুইয়ে দিলেন! একি তাঁর মৃত্যুর পূর্বাভাস? কথাটা এভাবে মনে হওয়ার জন্য আশংকায়, উদ্বেগে তার বুকের ভেতরটা থরথরিয়ে কেঁপে গেল। হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক্ শব্দটা অকস্মাৎ শব্দহীন হয়ে গেল। মন খারাপ করা আর্তির পাষাণভার তার হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে ঝুলে রইল যেন।

অনেকক্ষণ ভূতের মত ছাদের আলসেতে বসে রইল নিবেদিতা। কেমন বিভ্রান্ত লাগছিল। কিছুই তেমন গভীর করে ভাবতে পারছিল না। মাথাটা তার এলোমেলো চিন্তায় অস্থির।

পরের দিন সকাল পর্যন্ত এমনিভাবে কাটল। সকালে একজন সাধু এল বেলুড় থেকে। হাতে তার একখানা পাঁউরুটি। স্বামীজি নিজের হাতে অর্ধেক করে সাধুকে দিয়ে পাঠিয়েছেন। হাত বাড়িয়ে রুটিটা নিল নিবেদিতা। এ হল তার গুরুর উপহার। এর যে কী দাম সে ছাড়া অন্য কেউ জানে না। রুটিটা যে অর্ধেক ছিল নেওয়ার সময় নজরে পড়েনি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার সময় নজর পড়ল। অমনি এক বিপুল আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল বুকের ভেতর। এ তার গুরুর প্রসাদ। রুটিখানা কপালে ছোঁয়াতে গিয়ে বিপুল পুলকানুভূতিতে তার দু'চোখ বুজে গেল। গুরু তাকে ঠাকুরের ভোগ দিয়েছেন। কথাটা মনে হতেই এক মহৎ, উদার ও পবিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার চেতনা।

নিজের মনে নিরুচ্চারে বলল, আমি ধন্য। গুরুর কৃপা ও করুণায় আমাব জীবন ধন্য হয়ে গেছে।

নিবেদিতার খুব আশ্চর্য লাগল। অন্তরের মধ্যে হঠাৎ এই যে একটা বিপুল শিহরন ছড়িয়ে পড়ল এ জিনিসটা কি? বুকের ভেতর তার এ কিসের কল্লোল? রোদ ঝলমল উঠোনে নিবেদিতা একবার চোখ বুলোল। ফুলের টব দিয়ে সাজানো উঠোনটাকে মনে হল নন্দন কানন। হাতে ধরা পাউরুটির ওপর চোখ রেখে বলল, আমার প্রভুর করুণার ছোঁয়ায় মর্তভূমি হল অমরাবতী, আকাশ হল আরও সুদূর বিথারী। নইলে এ বিপুল শান্তি আমি রাখব কোথায়?

পরক্ষণে মনে পড়ে গেল, যিশু মৃত্যুর পূর্বে তাঁব রুটির অর্ধেক দিয়েছিল প্রিয় শিষ্যকে। বিবেকানন্দও রুটিব অর্ধেকটা তাকে দিয়ে কি যিশুর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সেরকম কোনো শেষ সময়ের কথা ভেবেই কি তাকে একটু একটু করে প্রস্তুত করছেন? নিজের মৃত্যুর অমোঘতার কথা এভাবে মনে করতে কষ্ট হয় না? মনটা খারাপ হয়ে যায়। জায়গাটা অকস্মাৎ শব্দহীন হয়ে গেল।

সারাটা দিন মন খারাপ করা আর্তি নিয়ে একা বসে রইল। কারো সঙ্গে দেখা করল না। ক্লাস নিল না। নিজের মত থাকল। কত ঘটনা মনে পড়ল। গুরুর সান্নিধ্য স্পষ্ট অনুভব করল প্রতিক্ষণ। তারপর সন্ধ্যা হলে সে একলা ছাদে গেল। সকলের নজর এড়ানোর জন্য চিলেকোঠার পাশে বসল। মাথার ওপর অনন্ত নীল আকাশ। সাদা মেঘের টুকরো। লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র দেবতাদের চক্ষু হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। রাত্রিব অন্ধকারের মধ্যে লীন হয়ে গিয়ে নিজেব মত কবে ভাবতে বেশ লাগে। তার জীবনটা সাধারণ নয়। কত বিচিত্র ঘটনায়, অনুভূতিতে, ব্যথা-আনন্দে-সার্থকতায়-ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ তার জীবন। কত মানুষের মিছিল তাব মত একটা মানুষের জীবনে। কত কর্মের আহ্বান, কত নতুন দায়িত্ব, কত অভিনব সংগ্রাম। জীবনটা নদীর মত গতিশীল, পরিবর্তনশীল। মনটা ভ্রমণপিযাসী সাদা মেঘের মতই নিয়ত সঞ্চরমান। কী বিপুল হর্ষে, আকাশের সীমা ছাড়িয়ে কী আবেশে প্রবাহিত। কোথাও তার বাধা নেই। আবার থেমেও নেই। শুধুই চলা। চলাই তার জীবন ধর্ম। রাত্রি গভীর আলিঙ্গনে যেমন বেঁধে রেখেছে সবাইকে, সব কিছুকে, তেমনি অগণিত মানুষের সঙ্গে একত্রে বেঁধে রাখার নাম জীবন। এই বিরাট জীবনস্রোতের অংশ হযে, বহু মানুষের জীবনের শরিক হয়ে সে এসেছে ভারতভূমিতে। এখন সে আর এখানে একা নয়। তারাভরা আকাশের মত সেও আছে মানুষ পরিবৃত হয়ে। আর এই সবের মূলে আছেন তার গুরু বিবেকানন্দ।

ফুরফুরে শীতল হাওয়ায় তার দু'চোখ বুজে এল। চোখ বুজলেই সে স্বামীজিকে দেখতে পায়। মুক্তির তৃষ্ণায় অধীর হয়ে উঠেছেন তিনি। এ পৃথিবী তাঁর ভালো লাগছে না। এর প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ নেই। দেহের খোলস্টা ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্য

শুধু সময়ের অপেক্ষা। কথাটা ভাবতে তার ভেতরটা অধীর হলো। মনটা বিষণ্ণ হল। খুব বেশিক্ষণের জন্য নয়। হঠাৎ সব ভাবনা দমকা হাওয়ায় উড়ে গেল জগদ্‌গুরু শঙ্করের পায়ে। তারপর সব শূন্য। নিবেদিতা চমকাল। ঠাকুরের কথা মনে পড়ল—"ও নিজেকে জানতে পারলে আর এক মুহূর্তও দেহ রাখবে না।" স্বামীজি সত্যিই কি নশ্বর দেহ ত্যাগ করে চলে যাবেন। এই প্রশ্নে নিবেদিতার বুক হাহাকার করে উঠল।

সূর্যোদয় হয়নি তখনও। ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দে চমকে উঠল নিবেদিতা। আলোড়িত হয়ে উঠল তার ভেতরটা। একটু আগেই স্বপ্ন দেখেছিল রামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করছেন। তাঁর দিব্য আত্মা বিলীন হয়ে যেতে যেতে যেন বলছে, আর একটা বিবেকানন্দ থাকলে বুঝতে পারত বিবেকানন্দ কী করে গেল। ঘুম ভাঙতেই মনে প্রশ্ন জাগল তাহলে কি কোনো দুঃসংবাদ এনেছে কেউ? কয়েকটা মুহূর্ত পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কড়া নাড়ার শব্দই যন্ত্রচালিতের মত তাকে টেনে আনল। দ্বার খুলে যাকে দেখল সে অচেনা, তবু তাকেই ব্যাকুল হয়ে জিগ্যেস করল, আমার গুরুর কী হয়েছে? আপনি এমন চুপ করে আছেন কেন?

সংবাদদাতা নিরুত্তর। মাথা নিচু করে নিবেদিতাকে একখানা পত্র দিল। কম্পিত হস্তে নিমেষে খাম খুলল নিবেদিতা। সব শেষ। কাল রাত ন'টায় স্বামীজি ঘুমিয়ে পড়েছেন চিরতরে। ইতি—সারদানন্দ।

শোকস্তব্ধ নিবেদিতা মূর্ছিতের মত পড়ে যেতে যেতে দরজার কপাট ধরে সামলে নিল। কিছুক্ষণের জন্য সে স্থবির ও প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছিল। অপলক চোখে চেয়ে ছিল সংবাদদাতার দিকে। তারপর মৃদুস্বরে বলল, একটু দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে বেলুড়ে যাব।

যেতে যেতে সংবাদদাতা বলল, কাল সকালে তো ভালোই ছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে ধ্যান করেছেন। দুপুরে শিষ্যদের সংস্কৃত পাঠ দিয়েছেন। গ্রান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড পর্যন্ত কয়েকমাইল স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে ঘুরেছেন। বেড়াতে বেড়াতে তাঁরা মঠের ভবিষ্যৎ, বালিকা বিদ্যালয় এবং দেশের কথা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। তারপর সন্ধ্যা হল। মঠের ঠাকুরঘরে এবং ভাগীরথীর উভয় তীরের দেবমন্দিরে যখন আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজছিল তখন স্বামীজি নিজের ঘরে গেলেন। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর দিকে স্থির হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর দক্ষিণেশ্বরের দিকে তাকিয়ে দু'হাত তুলে প্রণাম করে ধ্যানে বসলেন। হাতে তাঁর জপের মালা। ধ্যান করতে করতে মেঝেয় শুয়ে পড়লেন। বেশ কিছু পরে খুব গভীর এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। তারপর আর কোনো শব্দ নেই। সমাধিস্থ হওয়া আর মহাসমাধি প্রাপ্ত হওয়া দৃশ্যত একরকম হলেও উভয়ের মধ্যে কিছু তফাত তো আছেই। আর সেটা দেখেই বোঝা যায়। ব্রজেনভাই দেখল স্বামীজির দেহ মেঝেতে লুটোচ্ছে, চোখের মণি দুই ভুরুর মধ্যিখানে স্থির। নাক থেকে শ্বাস পড়ছে না। বুকে নিশ্বাসের ওঠা নামা নেই। তৎক্ষণাৎ ককিয়ে কেঁদে উঠল।

তার মরণার্তনাদ শুনে অন্যেরা দৌড়ে গেল। সবাই কান্নাকাটি করছিল। মঠের সন্ন্যাসীরা তাঁর কানের কাছে মুখ এনে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শোনালেন।

ঘাটে পা দিয়েই নিবেদিতা পাগলিনীর মত দৌড়ে স্বামীজির ঘরে ঢুকল। তখন সেখানে লোকে লোকারণ্য। নিঃশব্দে নিবেদিতা স্বামীজির শিয়রের পাশে বসল। স্নেহময়ী জননীর মত তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগল। নির্নিমেষ নয়নে নিবেদিতা চেয়ে রইল গুরুর মুখের দিকে। কী প্রশান্ত, শ্রীময় সেই মুখ। একটুও বিকৃত হয়নি। চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল। নাকের পাশ দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়া দাগ তখনও লেগে আছে। একজনের কাছ থেকে তুলো নিয়ে জলে ভিজিয়ে সেই দাগ তুলে ফেলল।

নিবেদিতার চোখে অশ্রু নেই। থাকবে কোথা থেকে ? তার তো আর কেউ নেই। সে একেবারে একা। তার কান্না দেখার মানুষটাই চলে গেল। তিনি তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। তার কান্না বুঝবে কে ? নিদারুণ নিঃসঙ্গতার শৈত্যে তার সব কান্না জমে বরফ হয়ে গেছে। তাই বোধ হয় চোখ ফেটে এক ফোঁটা জলও বেরোল না। অথচ সবাই হাপুস নয়নে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদছিল। কেবল নিবেদিতাই ব্যতিক্রম। সময়োচিত একটা থমথমে স্তব্ধতা মুখে বিরাজ করছিল। তার চোখে জল ছিল না। কণ্ঠে শব্দ ছিল না। কেবল শোকের কাঁটাটা হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে গেঁথে রইল। শুধু ঘড়ির কাঁটার মত বিশ্রামহীন হাতের পাখাটি ধীরগতিতে সঞ্চালিত হচ্ছিল। আর কী করবে সে। এছাড়া কিছু করার ছিল না তার। এ জীবনের একটি পরম্ অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। স্বামীজি আর ফিরবেন না।

ভক্তদের কেউ কান্না কান্না গলায় গাইছিল—মা কি আমার কালো রে-/কালো রূপে দিগম্বরী করে হৃদ্‌পদ্ম আলো রে।

সঙ্গীতের সুর ছড়িয়ে পড়ল আকাশে। শয়ে শয়ে পায়রা যেন ঝাঁক বেঁধে উড়ে গেল। নিবেদিতার ভেতরটা হায় হায় করে উঠল। নিজের মনেই নিজেকে প্রশ্ন করল, পরের জন্য নিজেকে যিনি বিলিয়ে দিলেন, তাঁকে কেন ছেড়ে দিতে হয় আমাদের? হে ভগবান কেন; কেন দিতে হয়?

অন্তিম সৎকারের জন্য স্বামীজির দেহ ঘর থেকে বাইরে বের করে আনা হল। রাশি রাশি ফুলে সাজিয়ে দেওয়া হল তাঁকে। চিত্রার্পিতের মত একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল নিবেদিতা।

বিদায়পর্ব সংক্ষেপে শেষ হল। পঞ্চপ্রদীপের আরতির শিখা জ্বলে উঠল। উচ্চারিত হতে লাগল বেদমন্ত্র। বুকফাটা আর্তনাদ বেজে উঠল শঙ্খে। অনুষ্ঠান শেষে সন্ন্যাসী এবং ভক্তেরা একে এসে শেষ নমস্কার করে গেল। তারপর মঠের সাধুরা স্বামীজির দেহ কাঁধে নিয়ে চিতার দিকে এগিয়ে গেল। জনতা প্রতিধ্বনি তোলে—জয় গুরু মহারাজ কি জয়।

মঠের পূর্বদিকে বেলগাছতলায় বাহকেরা এসে থামল। সেখানেই তাঁর সৎকারের

জন্য চিতা সাজানো হয়েছিল। গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে নতুন গৈরিক বস্ত্র পরিয়ে তাঁকে চিতায় সমর্পণ করা হল। যখন মন্ত্রপাঠ হচ্ছিল। নিবেদিতা দেখল মৃতের সব কিছুই চিতার উপর রাখা হচ্ছে। তার মধ্যে একটি চাদরও ছিল। নিবেদিতা ভাবছিল স্বামীজির ঐ গেরুয়া রঙের চাদরটি যদি তাঁর চিহ্নস্বরূপ প্রিয় বান্ধবী ম্যাকলাউডকে দিতে পারত তাহলে বান্ধবী কত খুশি হত। স্বামীজির আত্মাও তৃপ্তি পেত তাতে। জো স্বামীজির শিষ্যা নয়, প্রিয় বান্ধবী। এরকম বন্ধু খুব কম ছিল স্বামীজির। জো'র প্রতি ছিল তাঁর অশেষ শ্রদ্ধা। তবু সেই মহীয়সী মহিলার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হল না। পবিত্রতার মতন পবিত্র, প্রেমের মত প্রেমময়ী সেই বান্ধবীর জন্য স্বামীজি কিছু রেখে গেলেন না। ম্যাকলাউডকে তাঁর স্মৃতিটুকু বহনের জন্য গেরুয়া রঙের ঐ বস্ত্রখণ্ডটি রেখে দেওয়ার জন্য সারদানন্দকে বলি বলি করেও বলতে পারল না। অবশেষে সব লজ্জা সংকোচ ত্যাগ করে বলল, সারদানন্দ সব তো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ঐ চাদরটা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে জোর জন্য রেখে দিলে হয় না?

সারদানন্দ ওর মুখের দিকে ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, মৃতের সব বস্ত্রই পুড়িয়ে ফেলাই নিয়ম। তবে, তুমি চাইলে ওটা নিতে পার।

কয়েক মুহূর্ত ভাবল নিবেদিতা। কেউ কিছুই রাখছে না। সেক্ষেত্রে ঐ বস্ত্র রেখে দেওয়াটা বড়ই দৃষ্টিকটু মনে হল। তবে এক প্রান্ত থেকে যদি একটা টুকরোও ম্যাকলাউডের জন্য রাখতে পারত স্বামীজির আত্মা তৃপ্তি পেত। ম্যাকলাউডও ধন্য হত। খানিকটা অসহায়ভাবে নিবেদিতা চিতার কাছ থেকে সরে এসে একটা গাছের ছায়ায় বসল। ওর চোখ দুটি ছিল চিতার ওপর। মনুষ্য শরীর দাহ করার দৃশ্য আগে দেখেনি নিবেদিতা। আজ প্রথম দেখছে।

চন্দনকাঠ এবং বেলকাঠ দিয়ে সাজানো চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হল। প্রচুর ঘি ঢালা হল চিতায়। দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল চিতা। নিবেদিতার মনটা ভীষণ্ খারাপ হয়ে গেল। হিন্দুরা এত নিষ্ঠুরভাবে প্রিয় মানুষকে কী করে অগ্নিতে সমর্পণ করে? তাদেরও নিশ্চয়ই কষ্ট হয়। নিজের মৃত্যুর অমোঘতার কথা কি একবারও তাদের মনে হয় না? তবু নির্দয় হতে হয় তাকে। চোখের ওপর প্রিয় মানুষের নশ্বর শরীর পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে আর শান্তভাবে সে দেখছে। যাকে ভক্তি করত, শ্রদ্ধা করত মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু পুড়িয়ে তার চিহ্ন মুছে ফেলার এই নিষ্ঠুর সামাজিক নিয়ম নিবেদিতার ভালো লাগল না। তবু মৃত্যু সত্য। দেহান্তের পর হয় তাকে কবর দাও, নয়তো পুড়িয়ে ফেল। যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণই তার আদর। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে অস্পৃশ্য। পবিত্র হয়ে ওঠার জন্য ওই সব করতে হয়।

নিবেদিতার মনে হঠাৎ প্রশ্ন জাগল, তাহলে প্রাণ কী? আত্মা কী? প্রাণহীনতার সঙ্গে দেহস্থিত আত্মার যোগ কতটুকু? দেহ মুক্ত আত্মার অবলম্বনই বা কি? তার

পরমগতিই বা কী?

চিতার আগুন যত লক্ লক্ করে করে চারদিক থেকে তত উন্মাদ বাতাস হু-হু করে ছুটে আসে। বহু দূর দূরান্ত থেকে তাঁরা বিবেকানন্দের বাণী বহন করে নিয়ে নিবেদিতার কানে ফিস্ ফিস করে বলল, মার্গট, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় মৃত্যুই শেষ। কিন্তু তা নয়। আসলে যে উৎস থেকে প্রাণ এসেছিল, মৃত্যুতেই সেখানেই ফিরে গেল। অনেকটা ডায়নামা থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের মতই বৃত্ত সম্পূর্ণ করে তাতে ফিরে যায়। জীবন মৃত্যুর ক্ষেত্রও তাই। জন্ম থেকে মৃত্যুতে যাওয়া যেন নাগরদোলার এক একটি দোলনা। দোলনা ঘুরছে অবিরত কিন্তু লোক বদলে যাচ্ছে। একজন একটা দোলনায় উঠল-চক্রের সঙ্গে উঠে আবার নেমে এল। চক্র ঘুরে চলেছে। এইভাবে লোক ওঠা-নামার মত আত্মাও এক দেহে প্রবেশ করল আবার কিছুকাল পরে দেহত্যাগ করে চলে গেল। এইভাবে সে ঘুরতে থাকে যতক্ষণ না মুক্তি পায়। আমরা চক্রকে গতিশীল করেছি আর নিজেরাই তার দ্বারা পিষ্ট হচ্ছি। উপনিষদ বলে আত্মা কখনো আসে না, যায় না, কখনো জন্মায় না, মরে না। প্রকৃতি আত্মার প্রভাবে গতিশীল হয়। সেই গতির ছায়া আত্মায় পড়ে। তখন ভ্রম হয়। কার্যত প্রকৃতি বদলাচ্ছে। মানুষের আত্মা নয়। আত্মা শাশ্বত।

মৃত্যু সম্পর্কিত জিজ্ঞাসায় নিবেদিতার মন এতই আর্ত ও বিহ্বল হয়েছিল যে কিছুক্ষণের জন্য তার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়েছিল। হঠাৎই মনে হল কে যেন তার জামার আস্তিন ধরে টানছে। নিবেদিতা চমকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছে এমন সময় এক দমকা হাওয়ায় চিতা থেকে কী যেন উড়ে এসে তার পায়ের কাছে পড়ল। সেই দিকে তাকাতে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। প্রার্থিত বস্ত্রখণ্ডের একটুকরো অংশ অন্য কোথাও নয়, তার পায়ের কাছে এসে পড়ল।

অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ নীল দুটি চোখ মেলে ধরল বস্ত্রখণ্ডের ওপর। ভক্তিভরে কাপড়ের টুকরোটুকু কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় ঠেকাল। বুকে চেপে ধরল অমনি কোথা থেকে একটা তীব্র আবেগে কাঁপতে লাগল তার ঠোঁটদুটো। মুক্তোর মত ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু চিক চিক করতে লাগল তার গালে। বুকের মধ্যে বস্ত্রখণ্ডটুকু চেপে ধরে স্বামীজির প্রজ্বলিত চিতার দিকে তাকিয়ে আকুল কণ্ঠে উচ্চারণ করল হে আমার পিতা, তোমার করুণার অন্ত নেই। আমার প্রতিমুহূর্তের চিন্তায় সাড়া দিয়ে অভাগিনী মার্গটকেই ধন্য করলে। তেমার এ করুণা কোনোদিন ভুলব না আমি। তোমার পথে চলার শক্তি আমাকে দিও।

পরম আবেগে চোখ দুটো বুজে এল নিবেদিতার। আর ধীরে ধীরে কেমন একটা অনাস্বাদিতপূর্ণ সুখের অনুভবে তার চেতনা আবিষ্ট হয়ে এল। মনের ভেতর পরিস্ফুট হয়ে উঠল গুরুর দিব্যমূর্তি। অগ্নিবর্ণ সেই পুরুষ যেন হস্ত উত্তোলিত করে তাকে অভয় প্রদান করল।

।। এগারো ।।

বাইরের কান্না তো চোখেই কাঁদে। পাঁচজনে তা দেখতে পায়। দেখেও। কিন্তু নিবেদিতার কান্না, সে কান্না ছিল না। বুকের গভীরে যে একা একা নীরবে নিঃশব্দে কাঁদে, তার কান্না তো চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। নিবেদিতার কান্না ছিল সেই কান্না। বুকের ভেতর তার রক্তক্ষরণ হয় সমানে। দমবন্ধ এই বোবা পাথরের ভার বুকে করে সে ছুটে গেলে বেলুড়ে। সেখানে গুরুভ্রাতা এবং সন্ন্যাসীরা সবাই শোকমগ্ন। তারা শুধু কান্নাকাটি আর হা-হুতাশ করে। প্রকৃত কাজের কথা কেউ বলে না। কারো যেন স্বামীজির জন্য করার কিছু নেই। স্বামীজির প্রতিষ্ঠিত মঠের কাজকর্ম সচল রাখার জন্য কারো আগ্রহ দেখল না। সবাই তাকে এড়িয়ে চলছে যেন। এমন কি ভালো করে তার সঙ্গে কথাও বলল না।

ভীষণ দুঃখ হলো নিবেদিতার। স্বামীজির প্রতিকৃতির সামনে চুপ করে বসে রইল। তার নীল নিশ্চল আঁখিদ্বয় বিবেকানন্দের চোখের ওপর স্থির। কত কথা মনে পড়ে। এই মানুষটি পিতার মতই কাঁদার আগে বুঝতে পারত কোথায় কত ধরনের দুঃখ ব্যথা তার। কিন্তু তিনি না থাকার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের তলা থেকে মঠের মাটি তার সরে যাচ্ছে। সে একেবারেই একা হয়ে গেছে। স্বামীজি বোধহয় টের পেয়েছিলেন তাঁর অবর্তমানে কিছু একটা হবে। তাই অনেকগুলি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে তার নিজের জায়গায় এনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই অধ্যায়গুলির আলাদা আলাদা ভাবে অনেকগুলি ভাগ আছে। শান্ত মন খারাপ করা আর্তি বুকে মুখে, চোখে, শরীরের অণুতে অণুতে ধরে রেখে সেই ছবিগুলো একে একে স্মরণ করল। প্রথমে ব্যক্তিত্বের খোলসটি ছেড়ে ফেলতে শিখিয়েছিলেন। তারপর বাধ্য করেছেন আত্মসমর্পণে। সবার শেষে দিয়েছেন পরিপূর্ণ আত্মার কর্তৃত্বের সাধনা, জিতাত্মার আদর্শ। প্রতিটি জীবন অধ্যায় কঠিন পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে হয়েছে। এই উত্তীর্ণ হতে পারাই হল আসল শিক্ষা। সেই উত্তরণের জন্য কোনো পরীক্ষা দিতে হয়নি তাকে। মনে হচ্ছে এবার তার পরীক্ষা দেওয়ার দিন এসেছে। এই দিনটার জন্য আচার্য তৈরি করেছেন তাকে। এখন কারো উপেক্ষায় বা অবজ্ঞায় দমে গেলে হবে না। দমে যাওয়া মানে সবচেয়ে বড় হেরে যাওয়া নিজের কাছে এবং গুরুর কাছে। নিজে হারলেও হারতে পারে। তা বলে গুরুর প্রত্যাশাকে, শিক্ষাকে ব্যর্থ হতে দেয় কী করে?

বোবা কান্না বুকে করে নিজেকে কর্মযোগিনী করে গড়ে তোলার শপথ নিল নিবেদিতা। স্বামীজির তিরোধানের অব্যবহিত পরেই যে এরকম এক চরম সঙ্কট উদ্ভব হতে পারে ভাবিনি। এই সমস্যা ও দ্বন্দ্ব থেকে কে তাকে সাহায্য করবে, কোন পথে গেলে তার ভালো হয় তা বলে দেওয়ার মানুষটাই নেই। স্বামী ব্রহ্মানন্দ যে তার প্রতি খুব সদয় নয় তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যায়। বেলুড়ে এলেই তার বুকের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে ক্ষোভ আর অভিমান। স্বামীজির প্রতিকৃতিকেই প্রশ্ন করে, এভাবে আমাকে ফেলে কোথায় চলে গেলেন?

এক গভীর শোকের মধ্যে ডুবে গেল সে। অপলক চোখে স্বামীজির ফটোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কত অজস্র কথায় তার বুক আলোড়িত হতে লাগল। শোকের স্তব্ধতা ছিল কিন্তু নিবেদিতার ভেতরটা আকুল করা জিজ্ঞাসায় মথিত হতে লাগল। নিজের মনে বিবেকানন্দকে বলছিল, আপনার প্রিয়দেশ ভারতবর্ষের মানুষ জাগতে শুরু করেছে। তার মধ্যে ঘুমন্ত সিংহের ঘুম ভাঙছে। এখন কত কী ঘটবে—স্বাধীনতার জন্য মানুষের লড়াই শুরু হবে। অথচ আপনি তার আরম্ভ কিংবা পরিণতি দেখার জন্য উপস্থিত থাকলেন না। এযে আমার কী দুঃখ তা কেউ বুঝবে না। অথচ আপনিই চেয়েছিলেন পরাধীন দেশের মানুষ মাথা তুলে মানুষের মত বাঁচুক, নিজের অধিকার দাবি করুক। আজ দিকে দিকে তার দাবি উঠতে আরম্ভ করেছে। আর এই সময় আপনাকে হারানোর কষ্ট যে কী দুঃসহ তা বলে বোঝাতে পারব না। আপনি যদি তাদের নেতৃত্ব নাও দিতেন তাহলেও আপনার উপস্থিতিই হত এক বিশাল প্রেরণা। তবু কি এক আশ্চর্য কারণে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে আপনার পরোক্ষ উৎসাহ, প্রচ্ছন্ন ভূমিকা এবং অবদান সম্পর্কে রামকৃষ্ণ মিশন এবং মঠ উদাসীন।

স্বামীজির ছবি স্পর্শ করে মনে মনে শপথ করল নিবেদিতা—আত্মসত্তাকে চিনে নেবার জন্য আপনার অনলস পরিশ্রম এবং সংগ্রামকে বিফল হতে দেবে না মার্গট। আপনার প্রাণের যে স্ফুলিঙ্গ নিবেদিতার মধ্যে আছে, সেই অগ্নিকণাকে নিবেদিতা ভারতের কোণে কোণে প্রজ্বলিত করবে। এ হল নিবেদিতার পণ। শক্তির যে নির্ঝর হতে অঞ্জলি পান করেছেন আপনি সেখান হতে আমিও অমৃত পান করব এ আমার সংকল্প।

প্রতিকৃতির সামনে নতজানু হয়ে বসে থাকতে থাকতে নিবেদিতার মনে হল, অনেক অনেক দূর থেকে তাকে হাত নাড়িয়ে উদ্দীপিত করছে সেই তেজদৃপ্ত অমৃতময় মহাপুরুষ। তাঁর সুডৌল মুখে ঝিকমিক করছে হাসি। গর্বের হাসি। হঠাৎই খুব আশ্চর্য লাগল, এ কোন্ মহাশক্তির অস্তিত্বকে অনুভব করল সে। তবে কি মৃত্যু জীবনের শেষ নয়? মৃত্যুর পরে আত্মা কি জীবিত থাকে? আত্মার ক্ষয়, ধ্বংস বলে কি কিছু নেই। মৃত্যু কি তবে একটা স্তব্ধতা মাত্র, যতি মাত্র। মৃত্যুতে আত্মার যদি শেষ না হয় তা-হলে সে আত্মা কোথায় থাকে? প্রশ্নটা নিবেদিতা নিজের কাছেই করল, আর নিজেই তার

জবাবে বলল, দি গ্রেট্ লাইফ অ্যাজ্ এ হোল্ পাস্ড্ ইন্ রিভিউ, দেন্ দি ডেথ্, অ্যান্ড ফাইনালি রিসারেক্সন্....। তাই যদি হয় মৃত ব্যক্তিকে মৃত্যুর পরে সত্যি কি দেখতে পায় কেউ? যিশু ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পরে সশরীরে আবির্ভূত হয়ে বলেছিলেন, আই অ্যাম্ দি রিসারেকসন্ অ্যান্ড দি লাইফ। অনুরাগী ভক্তদের কাছে এ এক বিচিত্র অনুভূতি। অনুভূতির রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করে সূক্ষ্ম ধ্যানগম্যপথে তাকে লাভ করা যায়। ঈশ্বরের পুত্র তাই বলেছিল—হি দ্যাট্ বিলিভেথ্ ইন্ সি, দো হি ওয়্যার ডেড্, ইয়েট্ শ্যাল্ হি লিভ্। তা-হলে স্বামীজি কি পুনরুত্থিত হবেন শ্মশানের মহাশয্যা থেকে? তিনিও যিশুর মত পুনরাগমনের কথা একাধিকবার বলেছেন। কী মিষ্টি আর কী মধুর সেই কণ্ঠস্বর। অনেক অনেক দূর থেকে বাতাসের সওয়ার হয়ে সেই কথাগুলো তার চেতনার ভেতর মধুর একটা আবেশ ছড়িয়ে দিল। মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে তাঁর কথাগুলো পুনরুচ্চারিত হল নিবেদিতার—সেভারল টাইমস্ ইন্ মাই লাইফ আই হ্যাভ্ সিন্ রিট্যারনিং স্পিরিট, অ্যান্ড ওয়ানস্ ইন্ দি উইক আফটার দি ডেথ্ অব্ রামকৃষ্ণ পরমহংস দি ফরম্ ওয়াজ ল্যুমিনাস। চিকাগোর বক্তৃতা দেবার সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণকে এত বেশি করে স্মরণ করেছিলেন যে গুরু দর্শন না দিয়ে থাকতে পারেননি। গুরু ছিলেন তাঁর অন্তরের প্রেরণাস্থল। তাঁর দিব্যদর্শন লাভ করে তবেই সব রকম ভয়, সংশয় থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

এই চিন্তাসূত্রে নিবেদিতার অন্তরে এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হল। স্বামীজি আছেন। অন্তরের অন্তঃস্তলে প্রদীপ্ত হয়ে বিরাজ করছেন। স্বামীজি আছেন, ভীষণভাবে আছেন তার চৈতন্য সত্তায় কালকে অতিক্রম করে, মৃত্যুকে অতিক্রম করে, একটি জীবন্ত ও জাগ্রত উপস্থিতিরূপে, শক্তি ও শান্তির শাশ্বত উৎসরূপে। স্বামীজি মরেননি, তার সঙ্গেই আছেন তিনি।

ভক্তিভরে স্বামীজির প্রতিকৃতিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল নিবেদিতা।

ক'দিন পরেই নিবেদিতা পুনরায় বেলুড় মঠে এল। তাকে নিয়ে বেলুড়ের সন্ন্যাসী সঙ্ঘ ও গুরুভাইরা যে একটা জটলা পাকাচ্ছিল এটা বুঝতে তার বাকি ছিল না। এরকম একটা সংকট যে দেখা দেবে বিবেকানন্দ জীবদ্দশাতেই তার আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু সে যে তাঁর বিয়োগের এক পক্ষকালের মধ্যেই সূচিত হবে এটা নিবেদিতার ধারণা ছিল না। নিজেদের অন্তর্কলহে জড়িয়ে পড়ে পাছে মঠের কাজ বিঘ্ন হয়, 'আত্মানো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' কর্মসূচী বিলম্বিত হয় অথবা ম্যান মেকিং মেশিনরূপে স্বামীজি যে সঙ্ঘ বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তা কোনোভাবে বিঘ্নিত হোক, নিবেদিতা প্রাণ থেকে চায়নি বলেই মঠে আসার প্রয়োজন বোধ করল। কিন্তু তার আসা-যাওয়ার প্রতি কারো কোনো নজর নেই। আগের সমাদরও নেই। মঠের সন্ন্যাসী সংঘের নিদারুণ উপেক্ষা

নিবেদিতাকে অভিমানী করল। কিন্তু তার অভিমানের কোনো মূল্য নেই জেনে বুঝেই উপেক্ষা গায়ে মাখল না। সারদানন্দের সঙ্গে তার চিরদিনের ভালো সম্পর্ক। এখনও অটুট আছে। সংকট নিয়ে তার সঙ্গে একান্তে আলোচনা করল। কোনোরকম ভূমিকা না করে বলল, সারদানন্দ, মঠের সবাই কান্নাকাটি এবং হা-হুতাশ নিয়ে ব্যস্ত। স্বামীজির প্রতিষ্ঠিত মঠ ও তাঁর কর্মসূচিকে সচল রাখার জন্য কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না বলে আমার মনে হয়েছে। স্বামীজির অসমাপ্ত কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা কিছু তো করা দরকার আমাদের। তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য এখনও পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অথচ দিনগুলো জলস্রোতের মত বয়ে যাচ্ছে। সময়ের এতবড় অপচয় চোখে দেখতে পারছি না। তাই পাগলের মত ছুটে আসি। কিছু একটা কর সারদানন্দ।

সারদানন্দ ওর ব্যাকুলতার প্রত্যুত্তরে কী বলবে ভেবে পায় না। একটু ইতস্তত করে বলল, তোমার মত আমরাও ভাবছি। ব্রহ্মানন্দজির সঙ্গে এ নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনাও হয়েছে। তুমি আমাদের সবার প্রিয়, বন্ধুবর নরেন তোমার গুরু। সুতরাং তোমার একটা আলাদা দাবি আছে এই মঠের ওপর। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে মঠের নিয়মনীতি অনেক কিছু বদলে গেছে। সে সব তোমার ভালো করে জানা দরকার। মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে একবারটি দেখা কর তুমি।

নিবেদিতার ভুরু কোঁচকাল। দুটো দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট বজ্রের মত এঁটে থেকে ভিতরকার সব রাগ এবং ক্ষোভকে আটকে রাখল। বলল, আলোচনা যা হয়েছে তা তো তুমি জানই। ব্রহ্মানন্দকে তাহলে দেখাচ্ছ কেন? কী কথা হয়েছে তুমিই তো বলতে পার।

ব্রহ্মানন্দ মঠের অধ্যক্ষ। মঠ সম্পর্কীয় সব কথা বলার একমাত্র মুখপাত্র তিনি। এটা শৃঙ্খলারক্ষার ব্যাপার।

ব্রহ্মানন্দের মনের কথা জানি। স্বামীজি জীবিত থাকতেই তিনি আমায় পছন্দ করতেন না। আজ আচার্য নেই, তিনি তো তার সুযোগ নেবেন। আমার পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই। আমি আজ একেবারে একা।

মার্গট, এভাবে দুষছ কেন তাঁকে?

দুষতাম একজনকেই, তিনি আর নেই।

ব্রহ্মানন্দের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ থাকার কথা নয়।

সারদানন্দ, স্বামীজি যে রাতে মারা গেলেন সে রাতেই বেলুড় থেকে বাগবাজারে লোক পাঠানো হলো তাঁর কাছে। ওঁর বাড়ি থেকে তো আমার বাসা খুব দূরে নয়। তবু আমাকে একটা খবর দেবার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করলেন না। ইচ্ছে করলে আমাকে সঙ্গে আনতে পারতেন, কিন্তু তাও করলেন না। মঠের অধ্যক্ষের কাছে এটুকু প্রত্যাশা করা কি খুব অন্যায়। পরের দিন সকালে তুমি যদি লোক না পাঠাতে তা হলে ওঁর সঙ্গে শেষ দেখা হতো কি না সন্দেহ। এইসব ঘটনার পরেও কী অভিযোগ করতে নিষেধ করবে। কথাগুলো বলার সময় একটা লম্বা শ্বাস পড়ল নিবেদিতার। তারপর একটু

থেমে বলল, এসব কথা বলার মানে হয় না। যাই হোক আমি আচার্যের ঘরে আছি, তুমি ওঁকে সংবাদ দাও। ওঁর প্রতিকৃতির সামনেই আমি কথা বলব। বোধহয় একমাত্র ওখানেই আমার গুরু আছেন। তাঁর এক নীরব অদৃশ্য সান্নিধ্য আমার স্বপ্নের মধ্যে টের পাই। আমার দুঃখ-যন্ত্রণা লাঘব হয়। আমি শান্তি পাই। নতুন করে প্রাণ পাই। মনে হয় তিনি আছেন আমার খুব কাছে আছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এলেন সেখানে। কোনো ভূমিকা না করে একটা চেয়ার নিয়ে নিবেদিতার মুখোমুখি বসলেন। আপাদমস্তক তার নিরীক্ষণ করে থমথমে গম্ভীর গলায় বললেন, তোমাকে কিছু বলার আছে। কয়েকদিন আগে যখন এসেছিলে তখনই বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু ওকাকুরা ছিলেন বলেই বলতে পারিনি। ওকাকুরা লোকটা ভালো নয়। নরেনও শেষের দিকে ওই ভণ্ড লোকটিকে মোটে সহ্য করতে পারত না। তোমার সঙ্গে ওঁর মেলামেশাটা নরেনও পছন্দ করত না। তোমাকে সে কথা বলেছেও। মহিলাদের মন কেড়ে নেওয়ার এক অসাধারণ ক্ষমতা আছে ওঁর। তাঁর কুরুচিকর আচরণের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। তুমিও তা জানো। তবু ওর সংস্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নাওনি। কেন করনি তুমি জান?

স্বামী ব্রহ্মানন্দের কটাক্ষ নিবেদিতাকে তীরের মত বিঁধল। তার ভিতরের সব স্পন্দন যেন কয়েক নিমেষের জন্য স্তব্ধ করে দিল। যেন বা থেমে গেল রক্তের প্রবহমানতা, বন্ধ হয়ে গেল হৃৎপিণ্ড।

ঘটনাটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক এবং কুরুচিকর। তবু মানুষ মাত্রে কিছু কিছু দুর্বোধ্য দুর্বলতা তো থাকে যা মানুষ হিসেবে তাকে অন্যের কাছে হাস্যস্পদ করে। ওকাকুরাও সেরকম একটা অপ্রত্যাশিত আচরণ করে নিজেকে শুধু ছোট করল না, তাকেও অসম্মান করল।

ওকাকুরা তখন চৌরঙ্গিতে একজনের গৃহে অতিথি হয়ে থাকতেন। তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ রচনার কাজে সহায়তা করার জন্য ওকাকুরার কাছে তাকে প্রায়ই যেতে হত। গ্রন্থের বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হত। একদিন ওকাকুরার কী হল কে জানে? চুরুট ধরাতে ধরাতে নিবেদিতার গা ঘেঁসে বসল একখানা হাত দিয়ে তাকে কাছে টানারও চেষ্টা করল। অমনি ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত নিবেদিতা ছিটকে সরে গেল তার কাছ থেকে। রাগে থর থর করে কাঁপছিল তখন নিবেদিতা। চোখ দুটি দপ্ করে জ্বলে উঠল। বলল, ছিঃ। এটা কী বন্ধুর আচরণ হল? এতখানি অশালীন আচরণ করতে পারেন জানা থাকলে কোনোদিন আসতাম না এখানে। আপনাকে ধিক্কার দেবার ভাষাও আমার নেই। ছিঃ!

ওকাকুরা এতই অপ্রস্তুত হল যে মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেরোল। কী যে বলল, বোঝা গেল না। তবে একটা অসহায় অপরাধবোধে যে নিজেকে ছিন্নভিন্ন করছিল তার চাহনিতে, মুখের অভিব্যক্তিতে ফুটে বেরোল। তবু নিবেদিতার রাগ পড়ল

না। ঘৃণায় কণ্ঠস্বর নির্দয় হয়ে উঠল। বলল, আপনাকে ভালো মানুষ ভেবেছিলাম। কিন্তু আপনার মনটা যে এত নোংরা মনে হলে গা বমি করে।

ওকাকুরা অসহায়ভাবে ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলতে লাগল, না, না, আমি তা নই। আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আমাকে ক্ষমা করে দিন। বিশ্বাস করুন, আপনার পাশে বসলে আমি একটু শান্তি পাই। প্রাণটা খুশিতে ভরে যায়। এ এক গভীর ভালোলাগা, ভালোবাসা।

নিবেদিতা দুচোখে আগুন জ্বেলে বলল, এ অন্যায়, এ পাপ। আপনার ভালোলাগার মধ্যে শ্রদ্ধার ছিটেফোঁটা নেই। থাকলে, এভাবে অসম্মান করতেন না। আমার যে কত ক্ষতি হল সেটা বুঝলে আমাকে স্পর্শ করতেন না।

ওকাকুরা আত্মরক্ষার্থে মরিয়া হয়ে বলল, ম্যাডাম যদি তেমন কিছু ক্ষতি করে থাকি তা-হলে আপনাকে বিয়ে করে সে দোষ খণ্ডন করব। আপনার কোনো অমর্যাদা করব না।

নিবেদিতা ওঁর নির্লজ্জ প্রস্তাব শুনে চমকে উঠল। মুখচোখ রাঙা হয়ে গেল। লোকটার সাহসে নিবেদিতা অবাক হল। বিবেকানন্দের মত জিতেন্দ্রিয় পুরুষোত্তমের সান্নিধ্য যে পেয়েছে তার কোনো কামনা বাসনা থাকে না। বুকের মধ্যে কামনার যেটুকু আগুন ছিল, তাতে পুড়ে পুড়ে পঞ্চতপা হয়েছে। পৃথিবীর কোনো কামনার কানাকড়ি মূল্য নেই তার কাছে। ওকাকুরা কী করে ভাবল, তার সামান্য একটু করুণা পেলে গলে যাবে সে? রাগের আগুনে ভেতরটা তার পুড়তে লাগল। রূঢ় ভাষায় কিছু বলতে ইচ্ছে করল। কিন্তু ওকাকুরা প্রকৃতিস্থ কি না সন্দেহ হল নিবেদিতার। অতিরিক্ত মদ্যপান হেতু তাঁর দু'চোখের চাহনিতে ঘুম ঘুম ভাব। বিকারের ঘোরে যে আছে গালমন্দ করা তাকে অর্থহীন। তাই, কথা না বাড়িয়ে নিঃশব্দে প্রত্যাবর্তন করল। নোংরা গায়ে লাগলে যেমন গা ঘিন ঘিন করে, বমি বমি লাগে তেমনি এক ভয়ংকর ঘৃণায় তার শরীর খারাপ করতে লাগল।

অনুরূপ একটা বিব্রতভাব ভিতরে ভিতরে তাকে অস্থির করে তুলল। দুরন্ত অপমানে কান জ্বালা করছিল। মুখখানা আগুনের মত গন গন করছিল। বিপন্ন মুখে অপ্রস্তুত একটা উদ্বেগ ও ভয় নিয়ে ব্রহ্মানন্দের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। ব্রহ্মানন্দের সন্দেহের জবাব দেওয়ার মত কোনো ভাষা ছিল না তার। তবু দুরন্ত প্রতিবাদে ভেতরটা তার আকাশ জোড়া বিদ্যুৎ চমকের মত চমকিত হতে লাগল। মাথার ভেতর স্বামীজির কথাগুলো রেকর্ডের মত বাজছিল। মার্গট, কে কী বলল বা ভাবল সেটা কোনো কথা নয়। নিজের কাছে সৎ থাকলেই হলো। বাধাকে বন্ধন ভেবে থেমে যেও না। বন্ধন মনে করলেই বন্ধন। মনের বন্ধনই বড় শত্রু। বন্ধন যেমন সত্য, মুক্তিও তেমনি সত্য। মুক্তির আনন্দ বন্ধন ছাড়া পেতে কোথায়? বন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসিনী তুমি। তোমার বন্ধনে ভয় থাকবে কেন? নিজের শক্তিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। যে

কোনো অবস্থায় মনে রাখবে তুমি স্বাধীন। তোমায় সব রকম স্বাধীনতা আমি দিয়েছি। এখন থেকে তোমার একলা চলা শুরু হোক। তোমার সব কাজে আমার আশীর্বাদ রইল। অমনি নিবেদিতার ভয় ভেঙে গেল। বলল, হঠাৎ আপনার ওকাকুরার কথা মনে হল কেন? স্বামীজির আরব্ধ কাজ কীভাবে করব আমরা তার কথা বলতে এসেছিলাম। আপনি কি কিছু বলবেন?

বলতে তো হবেই। এই মঠ এবং সংঘ প্রতিষ্ঠার জন্য নরেন কত ত্যাগ ও পরিশ্রম করেছিল সে তো তুমি জান। বলতে কি, তোমার বন্ধুদের টাকায় এই মঠ হয়েছিল। তুমিও মঠের জন্য অর্থসংগ্রহ করেছ। মঠের সঙ্গে যুক্তও আছ। মঠের প্রতি তোমার ভালোবাসা কত গভীর তা আমি জানি। আমাদের মত তুমিও মঠের ভালো চাও। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের লক্ষ্য ও আদর্শের সঙ্গে তোমার সেবামূলক আদর্শ ও নীতির কিছু বিরোধ দেখা দিয়েছে। তুমি হয়তো সেগুলো তর্ক করে উড়িয়ে দিতে পার কিন্তু আমরা অবিবেচকের মত তা উড়িয়ে দিতে পারছি না।

নিবেদিতা প্রশ্ন করল, আমাকে কী করতে হবে?

ইদানীং, তুমি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছ। তার ফলে, মঠ ও মিশনের ওপর পুলিশি সন্দেহ বাড়ছে। আমরা সন্ন্যাসী। মানবসেবা আমাদের ধর্ম। রাজনীতির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু তুমি ওকাকুরার পাল্লায় পড়ে উগ্র রাজনীতির পক্ষে বক্তৃতা করছ, দেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করছ। এতে বিদেশী শাসকের মনে সন্দেহ জাগছে, রামকৃষ্ণ মিশন সেবা ধর্মের নাম করে একটা রাজনীতির আখড়া তৈরি করছে। তাই সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠানকে রাখতে হলে তোমাকে রাজনীতির সংস্রব ত্যাগ করতে হবে। নইলে মঠের সমূহ ক্ষতি হবে।

নিবেদিতা বলল, মঠের সঙ্গে রাজনৈতিক কার্যকলাপের কোনো সম্পর্ক নেই। পুলিশ সন্দেহ করলেও বিভিন্ন সূত্রে খোঁজখবর করে যখন জানতে পারবে রাজনীতির কোনো নাম গন্ধ নেই মিশনের সঙ্গে তখন তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে।

পুলিশকে আমরা সেই সুযোগটুকুই বা দেব কেন? মঠের কথা ভেবে রাজনীতি থেকে তুমি দূরে থাকলে সব গোল মিটে যায়।

নিবেদিতা বলল, সে প্রশ্নই ওঠে না। রাজনীতি আমার রক্তে। তাছাড়া এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার আচার্য কখনও নিষেধ করেননি।

নরেনের মত দুর্জয় সাহস ও শক্তি আমাদের নেই। নরেন অনেক কঠিন সংকট একা সামাল দিতে পারত। আমার সে শক্তি নেই। মঠের মধ্যে থেকে তুমি রাজনীতি করতে পার না। এটা আমাদের সংবিধানের অন্যতম শর্ত। নরেন জানত, রাজনীতির ঝড় মঠকে ভেঙে তছনছ করে দেবে। তাই রামকৃষ্ণ সংঘের কাউকে রাজনীতি করার অধিকার সে দেয়নি। তোমাকেও বলেছে, রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লে তার ধাক্কা এসে লাগবে রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর। তোমাকে হয়তো শীঘ্রই স্থির করতে হবে কোন পথ

বেছে নেবে।

নিবেদিতা শান্তভাবে বলল, কিন্তু আমি যা করছি তা তো দেশসেবার বাইরে কিছু নয়। দেশের অধিকাংশ মানুষ অভাবে, অনাহারে, রোগে-ভোগে, অশিক্ষায়, অচিকিৎসায় দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছে। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করা তো আমার এই প্রথম নয়। আচার্য নিজেও আমার কাজের অনুমোদন করতেন। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাকাটাকাটি হয়েছে কিন্তু নিষেধ করেননি। আমি তাঁকে বোঝাতে পেরেছিলাম এইসব মানুষেরা যতদিন নিজের দুর্ভোগের প্রতিকার নিজেরা করতে না শিখবে, নিজেরা যদি নিজেকে বাঁচাতে না পারে তাহলে বাইরের কোনো শক্তি তাদের বাঁচাতে পারবে না। আমি তাদের অন্তর্নিহিত নিদ্রিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করছি মাত্র। গুরু-প্রদর্শিত পথেই আমি চলেছি। তাহলে, আমার কার্যকলাপকে মঠবিরোধী বলে আপনারা মনে করছেন কেন? মঠের নীতি ও আদর্শ মেনেই আমি কাজ করছি। স্বামীজিও আমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেছেন, যদি ওরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে তাহলে একদিন তারাই নিজেদের ভাগ্য নিজেরা নির্ধারণ করে নেবে।

ব্রহ্মানন্দ গম্ভীরভাবে বললেন, মঠের নারায়ণ সেবা এবং তোমার দেশসেবা জনসেবার মধ্যে আকাশ-জমিন ফারাক। সেবাকার্যের মধ্যে নেমে এসে তুমি মানুষকে বিদ্রোহের উস্কানি দিচ্ছ। স্বদেশপ্রেমের মন্ত্র প্রচার করছ। স্বদেশীদের সঙ্গে মেলামেশা করছ। এসব কারণে মঠের স্বার্থের সঙ্গে তোমার উদ্দেশ্যের বিরোধ বেধেছে।

নিবেদিতা কিছু বলার চেষ্টা করলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমি জানি নরেন তোমাকে কাজের স্বাধীনতা দিয়েছে। স্বনির্বাচিত পথে স্বাধীনভাবে চলার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু কখনো বলেনি রামকৃষ্ণ মঠের মধ্যে থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে একটা পরোক্ষ যোগসূত্র গড়ে তুলবে। সে ভালো করেই জানত ভারতের রাজনীতির সঙ্গে তুমি জড়িয়ে পড়বে, তাই নিজের পথে চলার অনুমতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। ব্রিটিশ-বিরোধী আইরিশ রক্ত তোমার ধমনীতে টগবগ করে ফুটছে। তোমার অসীম ব্যক্তিত্ব এবং একরোখা মনোভাব সম্পর্কে নরেন এতই সজাগ ছিল যে তোমার নিজের পথে নিজের মত করে চলার কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। আমরাও তোমার কার্যকলাপে কোনো বাধা দেব না। কিন্তু মঠের মধ্যে থাকতে হলে মঠের নিয়ম মেনেই থাকতে হবে। নরেনও মঠের স্বার্থে নিজের রাজনৈতিক মত ও আদর্শ ত্যাগ করেছিল।

থমথমে গম্ভীর গলায় নিবেদিতা বলল, আপনারা চান, আমি আচার্য প্রতিষ্ঠিত মঠ থেকে দূরে সরে থাকি?

তুমি কী চাও সেটা তোমাকে স্থির করতে হবে। রামকৃষ্ণ মিশন কোনো একজন ব্যক্তির জন্য আলাদা নিয়ম করবে না। মঠের নিয়ম মেনে চলাই মঠের সন্ন্যাসীদের কর্তব্য। তোমাকে নতুন করে বলার কিছু নেই।

বিদ্রোহী নিবেদিতার সমস্ত অন্তরাত্মা চিৎকার করে বলতে চাইল—এ ষড়যন্ত্র। আমাকে গুরুর প্রদর্শিত পথে চলতে না দেওয়ার চক্রান্ত। মেয়ে বলেই নিয়ম-কানুনের শিকলে বাঁধতে চাইছেন। আমি মানি না আপনাদের এসব নিয়ম। এই মঠ আমার গুরুর হাতে গড়া। এর ওপর আমার পূর্ণ অধিকার আছে। আমি সে অধিকার ছাড়ব কেন? আপনারা আমাকে তাড়ানোর কে? মনের বিদ্রোহ মনেই রয়ে গেল। বেদনাতে দুটি চোখ গঙ্গার তরঙ্গমালার ওপর ছড়িয়ে দিয়ে সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। এই সামান্য সময়ের ভেতরে মনে হতে লাগল, কোথায় যেন তার একটা বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে। চেতনার ভেতর, আত্মার ভেতর বিবেকানন্দের জীবন্ত অস্তিত্ব অনুভব করল। মনে হল তীব্র সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে যেন চেয়ে আছে তাঁর দিকে। সুদূর লোক থেকে যেন বাতাসের সওয়ার হয়ে ভেসে এল ভারত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আহ্বান। যারা নির্ভীক, যারা বরেণ্য, বহুজনের সুখের জন্য, বহুজনের হিতের জন্য, সর্বব্যাপী মঙ্গলের জন্য তাঁদেরই আত্মবিসর্জন করতে হবে, আত্মত্যাগ করতে হবে। আমরা চাই জ্বালাময়ী বাণী, আর জ্বলন্ত, জীবন্ত কর্মসাধনা। এস আমরা ডাকি, অবিশ্রাম ডাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হয়ে ওঠেন, যতক্ষণ না অন্তরের অধিদেবতা সাড়া দেন।

নিবেদিতা চমকাল। সারা শরীরের মধ্যে শিহরন খেলে গেল। এই আহ্বানে সাড়া দিতেই তো তার এদেশে আসা। বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গুরু একটু একটু করে গড়েছেন তাকে। তাঁর দেশের জন্য উৎসর্গ করেছেন। মনের মধ্যে একটা জোর পেল নিবেদিতা। আস্তে আস্তে বলল, ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, আপনি একদিন কবুল করেছিলেন নরেন আপনার বন্ধু, সহপাঠী হলেও সে আপনার চৈতন্যদাতা। আপনার দেখার চোখ খুলে দিয়েছে সে। তাকে আপনি একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখেন না, দেখেন দেশপ্রেমের একটা জ্বলন্ত অতিকায় অগ্নিশিখারূপে, যে অগ্নিশিখা থেকে একটা ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ আপনার বুকের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। দুঃখের কথা, সেই স্ফুলিঙ্গের অগ্নিকণা নিভে গেছে। তাই বোধ হয় তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য উপায়ে ভিন্নতর আদর্শের পথে মঠকে চালিত করছেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মিত হেসে বললেন, নরেনের কাছে দেশ শুধু দেশ নয়, দেশ হল মা। আর জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সারা দেশের মানুষ হল পরস্পরের ভাই। কারণ তারা সবাই মায়ের সন্তান। নরেনের কাছে দেশপ্রেম হল দেশাত্মবোধ। দেশপ্রেমের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে কিন্তু দেশাত্মবোধ রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে ছাড়িয়ে অনেক গভীর পর্যন্ত প্রসারিত। যা প্রদেশের সীমারেখা, ভাষা ও ধর্মের চৌহদ্দি মুছে দিয়ে ভারতীয় পরিচয়কে প্রধান করে তোলে।

নিবেদিতা উৎফুল্ল হয়ে বলল, সেই ভারতবর্ষের জন্য গুরু আমাকে নিবেদন করেছেন স্বদেশমাতৃকার পদতলে। তাঁর দেশপ্রেমের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা থেকে একটি ক্ষুদ্র

স্ফুলিঙ্গ ছিটকে আমার বুকে এসে পড়েছে। তাঁর কথার কী তেজ! স্বাধীনতা এমনি কেউ দেয় রে? তা অর্জন করতে হয়। সেজন্য সকলের আগে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠতে হবে।

ব্রহ্মানন্দ তাকে বাধা দিয়ে বলল, দেশ নামে কোনো ভাবমূর্তির কাছে নরেন তোমাকে নিবেদন করেনি। মায়ের কাছে নিবেদন করেছিল। কিন্তু ভিন্নতর আদর্শের পথে নরেনের দেশপ্রেমের যে ব্যাখ্যা তুমি করছ তার সঙ্গে মঠের সাধুরা একমত নয়। দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য তুমি যা করছ তাকে রাজনীতি করাই বলে। রাজনীতির সঙ্গে তুমি নিজেকে এত বেশি জড়িয়ে ফেলেছ বলেই মঠ বিপদের আশঙ্কা করছে। মঠে থাকতে হলে তোমাকে রাজনীতি ছাড়তে হবে।

গুরুদেবই বলেছেন, তোরা ওঠ, তোরা জাগ্। হাতে কৃপাণ ধর, ধর বন্দুক। চলুক গুলি গোলা। ভীম রণরঙ্গিণী মহাকালীর সন্তান আমরা। ভয় কাকে? কিসের ভয়? খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেছেন। তা-হলে আমাকে রাজনীতি ছাড়তে বলছেন কেন? স্বামীজির কাজের জন্য আমি রাজনীতি ছাড়তে পারব না। এজন্য যদি মঠ ছাড়তে হয় তাতেও আমি রাজি।

ব্রহ্মানন্দ তৎক্ষণাৎ তার কথাটা লুফে নিয়ে বললেন, তা হলে মঠকে লিখিতভাবে সেকথা জানাতে হবে। মঠ থেকে সরে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মঠের যাবতীয় টাকা-পয়সা মঠাধ্যক্ষকে হস্তান্তর করতে হবে। এ ছাড়া সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বলতে হবে—মঠের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই এবং তুমি যা করছ তার জন্য মঠ কোনোভাবে দায়ী নয়। তোমার সব কাজের দায় তোমার নিজের। মার্গট, মঠাধ্যক্ষ হিসেবে তোমাকে এই নিষ্ঠুর কথাগুলো বলতে আমার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু কর্তব্য বড় নিষ্ঠুর। মঠের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছিন্ন হলেও আমাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক যেমন আছে থাকবে।

নিবেদিতা স্তব্ধ হয়ে ফাঁসির আসামীর মত বিচারকের রায় শুনল। প্রতিবাদে ভেতরটা ফেটে যাচ্ছিল। কিন্তু কার কাছে তার ক্ষোভপ্রকাশ করবে? তাই কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে উপর থেকে নিচে নেমে এল।

বেলুড় মঠের সঙ্গে জোর করে সম্পর্ক ধরে রাখার কোনো চেষ্টাই করল না নিবেদিতা। জোর করেই বা কী করবে একা? তার চেয়ে বরং সময় থাকতে থাকতে সসম্মানে সরে যাওয়া অনেক ভালো। তাতে মর্যাদা ও গৌরব দুই বৃদ্ধি পাবে। জেদাজেদি করলে গৌরব খোয়াতে হবে তাকে। সংঘাতে যাওয়ার পথ পরিহারের কথা ভাবল। তাতে এক নতুন ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

বেলুড় হল বিবেকানন্দের কর্মক্ষেত্র। এখানে যা কিছু আছে তা সবই তার গুরুর।

আচার্য কখনও চাননি তাঁর জ্যোতির পাশে নিবেদিতা দূরের নক্ষত্র হয়ে মিট মিট করে জ্বলুক। নিবেদিতার যোগ্যতা, ক্ষমতা, প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্ব এত বেশি যে তার নিজস্ব স্বীকৃতির জন্য এবং তার গৌরব ও সম্মান আলাদা করে প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন তাকে। বেলুড় মঠের চৌহদ্দির বাইরেই একমাত্র স্বামীজির প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব। মঠ কর্তৃপক্ষ মঠের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার যে সুযোগ দিল তার কাছে তা জগজ্জননীর আশীর্বাদ মনে হল। মঠের সীমাবদ্ধ গণ্ডির পরিবর্তে এক বিশাল ভারতবর্ষকে তার কর্মক্ষেত্র রূপে দিয়ে দিল ভীম রণরঙ্গিণী মহাকালী।

নিবেদিতার ক্ষোভ প্রশমিত হল। আস্তে আস্তে মনটা প্রশান্ত হয়ে গেল। বেলুড়ের সঙ্গে মতবিরোধকে মঠের বাইরে টেনে এনে লোক হাসাহাসি করার চেয়ে নিঃশব্দে সরে দাঁড়ানো শ্রেয় মনে করল নিবেদিতা। ব্রহ্মানন্দকে সশ্রদ্ধভাবে তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েও দিল। লিখল, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হল। হয়তো ভালোই হল। এ আমার ভবিতব্য মনে করেই নিজেকে শান্ত করেছি। আপনাকে শুধু একটাই অনুরোধ, প্রতিদিন ঠাকুর ও আমার গুরুর ভস্মাবশেষের বেদিমূলে আমার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ভুলবেন না।

ঘটনার শেষ এখানে নয়, খবর কাগজে বিবৃতি দিয়ে নিবেদিতা জানিয়ে দিল, রামকৃষ্ণ সংঘের সে আর কেউ নয়। এমন কি তার কাজকর্মও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, এর সঙ্গে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী এবং সংঘের কোনো সম্পর্ক নেই।

কটা দিন মনটা খুব খারাপ গেল। আস্তে আস্তে মনের ভারটা লাঘব হল। গুরুর মতবাদ ও আদর্শ বুকে নিয়ে বিশাল কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিল।

ভারতবর্ষে তখন আত্মসত্তাকে চিনে নেবার কঠিন সংগ্রাম চলেছে। নিবেদিতা অসংকোচে তাতে অংশগ্রহণের কথা ভাবল। তার একমাত্র বন্ধন ছিল বেলুড় মঠ। সে বন্ধন ছিন্ন হওয়ায় তাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হল না। নিজের কথাও ভাববার কিছু ছিল না। যেটুকু তার একান্ত নিজের তা ভারতমাতার পদতলে নিঃশেষে সমর্পণ করল। মনে মনে শপথ করল এখন থেকে তার একমাত্র কাজ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা। গুরুর ম্যান মেকিং কাজকে সম্পূর্ণ করা।

স্বামীজির অভাবজনিত শূন্যতায় এমনিতে মনটা আর্ত ছিল নিবেদিতার। সেই বেদনা অবসান হওয়ার আগে রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাটা নিবেদিতাকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। তার জীবনের থিত ভিত ভীষণভাবে নাড়া খেল। রাতে ঘুম আসে না চোখে। অর্ধরাত্রে বিছানা থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। গুরুর কথা মনে হয়। সেই সব কথা থেকে নিজের সান্ত্বনা খোঁজে। গুরু তো তাকে আত্মশক্তির শিক্ষা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর শক্তিও দিয়ে গেছেন। তাঁর মত সবরকম প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে তাকেও লড়াই করতে হবে। তিনি যেমন করে নিঃশেষ হয়ে গেছেন, তেমনি করে

সেও সব দিয়ে থুয়ে শেষ হয়ে যেতে চায়।

স্বামীজি নেই, একথাটা নিবেদিতার একবারও মনে হয় না। বরং মনে হয় তিনি আগের থেকে অনেক বেশি করে আছেন মানুষের বিশ্বাসে তার ভাবনায় এবং কল্পনায়। একটা আদর্শের স্বপ্ন নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে। সেই বেঁচে থাকাটা নিজের গণ্ডি থেকে বিশ্বের দিকে প্রসারিত করার সংকল্প নিয়ে 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করল। স্বামীজি যে পথে ভারতকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন সেই পথে তার পূর্ণতা দেওয়া হল সোসাইটির একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। পরম পুরুষার্থকে চরম মর্যাদা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কলকাতার নানাস্থানে এরা বিভিন্ন সমিতিতে স্বামীজির সম্বন্ধে জ্বলন্ত ভাষণ বক্তৃতা করল। নিবেদিতা বোঝাতে সক্ষম হল স্বামীজির আদর্শ ও স্বপ্ন প্রতিষ্ঠার জন্য সে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। বিদেশিনীর এই প্রয়াস এদেশে সাদর অভ্যর্থনা পেল। এনিয়ে খুব আলোচনাও হতে লাগল। উদাসী শিবের স্তব্ধ পৌরুষ হতে উছলে পড়তে লাগল ভৈরবী শক্তির উল্লাস। বিষাদের বদলে এক অসীম আনন্দে প্রাণ ভরে গেল নিবেদিতার। কাজ করার ক্ষেত্র পেলে দীর্ঘশ্বাস ফেলার কি সময় মেলে? গুরুর ভাবনা আর সে এক হয়ে গেল। নিবেদিতার জীবনে আর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। সে হল বিদ্রোহ এবং বিপ্লবের।